ELEMENTS

OF

PHYSICAL GEOGRAPHY

IN BENGALI

For the use of Vernacular and Normal Schools.

BY

NRISINHA CHANDRA MUKHERJI M. A.

CALCUTTA:

Printed and Published by B. L. Chakravarti.

AT

The New School-Book Press.

1879.

প্রাকৃতিক ভূগোল।

(জ্যোতির্বিজ্ঞানসমেত)

[illegible] বিদ্যালয়সমূহের ব্যবহারার্থ

শ্রী [illegible] মুখোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল,

প্রণীত।

কলিকাতা।

[illegible] প্রেস।

[illegible] সেন।

[illegible] ১২৮৫ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

এই ক্ষুদ্র

পুস্তকখানি

মহনীয় চরিতা

শ্রীমতী মহারাণী

শরৎসুন্দরী দেবীর

প্রাতঃস্মরণীয় নামে

তাঁহার অনুমত্যনুসারে

বহুমানপূর্ব্বক

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিনয়াবনত

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

প্রাকৃতিক ভূগোল প্রকাশিত হইল। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। ইংরাজী ভাষায় এই বিষয়ে যে সকল প্রধান গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয় অবলম্বনপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি যেসকল শাস্ত্রের নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ও নূতন নূতন জ্ঞাতব্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমি সমুদয় অভিনব গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাবতীয় নূতন বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই পুস্তকের সঙ্কলনবিষয়ে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সাধারণের বিবেচ্য। ইহার ভাষাও যাহাতে সুকুমারমতি পাঠার্থীর পক্ষে সুখবোধ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে ইহাদ্বারা সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শিলে আমার সমুদয় শ্রম সফল হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকের সংশোধনবিষয়ে আমার জ্যেষ্ঠসহোদরপ্রতিম প্রিয়তম বন্ধু মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

কলিকাতা।
১ লা আশ্বিন ১৮৭৮।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।

প্রাকৃতিক ভূগোল।

উপক্রমণিকা।

পরিষ্কার রজনীতে গৃহের ছাদ বা অন্য কোন উন্নত স্থান অথবা প্রশস্ত প্রান্তরে উপবেশনপূর্ব্বক আকাশমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি মনোহর চিত্র আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। নভোমণ্ডল নির্ম্মল, কোথাও মেঘের রেখামাত্র নাই; এরূপ সময়ে চতুর্দ্দিকে নয়ননিক্ষেপ করিলে কাহার মন না ভক্তি ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হয়? কে না অনন্ত অসীম বিশ্বরাজ্যের অদ্ভুত নির্ম্মাণপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করে? বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ আমাদের সম্মুখে জ্বলিতেছে, আমরা প্রথমতঃ উহাদের উজ্জ্বল ও কোমল কিরণ দেখিয়া মোহিত হই, উহাদিগের সৌন্দর্য্যরাশি আমাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে। কিন্তু ক্ষণকাল নিরীক্ষণের পরই আমরা উহাদের পার্শ্বে পশ্চাতে নিকটে দূরে চতুর্দ্দিকেই আরও বহুসংখ্যক তারা বা নক্ষত্র দেখিতে পাই। দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে উহাদের কিরণজাল

পূর্ব্বদৃষ্ট নক্ষত্রসমূহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প উজ্জ্বল। আবার আরও অধিকক্ষণ মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে আরও কত শত ক্রমসূক্ষ্ম তারকারাশি দৃষ্টিগোচর হয়। আবার যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, আরও কত শত অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র নয়নপথে উদ্ভূত হইতে থাকে। দূরবীক্ষণের সাহায্যভিন্ন এ গুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা অশেষবিধ পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ঐ সকল ক্ষুদ্র নক্ষত্র বাস্তবিক ক্ষুদ্র নহে। উহারা প্রত্যেকে এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলস্বরূপ, অথবা তদপেক্ষাও বৃহৎ, কেবল অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে অত ক্ষুদ্র দেখায়। যে সকল নক্ষত্র আমরা শুদ্ধ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই ও যে গুলিকে দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণের প্রয়োজন হয় এই সকল ব্যতীত আরও কত শত নক্ষত্র অসীম আকাশমার্গে বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোন প্রকার মানুষিক কৌশলেই উহাদিগকে দৃষ্টিপথে আনিতে পারা যায় না। গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে অনেক দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের দূরত্ব সংখ্যায় পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে সত্য বটে, কিন্তু ঐ সকল সংখ্যা এত অধিক দূরত্বের প্রকাশক যে উহা মনেও ধারণা ও অনুভব করিতে পারা যায় না। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। ফলতঃ বিশ্বরাজ্য অসীম অনন্ত অবাঙ্মনসগোচর! ইহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের সামান্য পৃথিবী ক্ষুদ্রতম বালুকাকণার ন্যায় ও বোধ হয় না।

আবার সমগ্র বিশ্বরাজ্যের বিষয় ভুলিয়া গিয়া আমাদের আবাসভূমি এই সামান্য পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে আর সামান্য বলিয়া বোধ হয় না। দিবাভাগে কোন উন্নত স্থানে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পৃথিবীকে প্রকাণ্ড

অসীম ও পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। আবার সম্মুখে সুদূর-বিস্তীর্ণ ভূভাগে মনে মনে অতিক্রম করিয়া আমরা ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে থাকি, ততই অসংখ্য দেশ বিদেশ, মহাদেশ, অপার সাগর, গগনভেদী পর্ব্বত আমাদের মানসচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকে। যদি এই সকল অশেষবিধ পদার্থ একত্র চক্ষুর উপর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রীর অনন্ত বিস্তার ও অসীম শোভাসন্দর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হই!

কেবল ইহাই নহে। এই বিশাল পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতীয় অসংখ্য জীব নিয়ত বিচরণ করিতেছে, কত শত উদ্ভিজ্জ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া আমাদের আনন্দ বিধান করিতেছে, আমরা দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক উপভোগ করিতেছি, আবার দিবসের পর রাত্রি উপস্থিত হইতেছে, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুসমূহ নিয়মিত ভৃত্যের ন্যায় যথাসময়ে উপস্থিত হইতেছে, বায়ু বহিতেছে, কখন সুখসেব্য মন্দানিল প্রবাহিত হইতেছে, কখন বা ভীষণ ঝটিকা প্রবলবেগে উড্ডীয়মান হইতেছে, নদী ও সমুদ্রের জল দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার উচ্ছ্বসিত হইয়া জোয়ার ভাটা উৎপাদন করিতেছে, নদীসমূহ নিয়তই নিম্নাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। নিয়ত মেঘ ও বৃষ্টি হওয়াতে নদী হ্রদ প্রভৃতির জল কখনই শুষ্ক হইতে পারিতেছে না এবং ঐ জলদ্বারা আমাদের ক্ষেত্রসমূহ শস্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইতেছে। পৃথিবীর বিশালতার সহিত এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকেই এক অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। নিশ্চয়ই এই সকল নিয়ত পরিবর্ত্তনাদি অবলোকন করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীর জীবন ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিতেন।

পার্থিব পদার্থসমূহের যে সকল নিয়মিত গতি ও পরিবর্ত্তের বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত নিয়ম ও রচনাকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হই। কিন্তু পৃথিবীতে অনুক্ষণ আরও কত পরিবর্ত্ত হইতেছে তৎসমুদয় আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে নিয়ত পরিবর্ত্তই সৃষ্টির নিয়ম। পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থই অনুক্ষণ আকার পরিবর্ত্ত করিতেছে, কিন্তু অল্পে অল্পে সংঘটিত হয় বলিয়া ঐ সকল পরিবর্ত্তের প্রতি আমরা তাদৃশ লক্ষ্য করি না। আমরা আপাততঃ মনে করিয়া থাকি যে ইতস্ততঃ যে সকল মনোহর পদার্থের শোভাসন্দর্শনে আমরা বিমোহিত হই, উহারা বুঝি চিরকালই একরূপ রহিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন ইতিবৃত্তাদির প্রতি মনোযোগ করিলে সহজেই আমাদিগের ভ্রম নিরাকৃত হয়। আমরা বুঝিতে পারি যে পৃথিবীর যে স্থান এক্ষণে যে ভাবে আছে কিছুদিন পূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। এক্ষণে যে স্থানে অকূল সমুদ্রের অসীম জলরাশি নিরন্তর ধূধূ করিতেছে, হয়ত বহুকাল পূর্ব্বে ঐ স্থানে অসংখ্য জীবসমাকীর্ণ লোকালয় বা অভ্রভেদী পর্ব্বতরাশি বিরাজিত ছিল। আবার যে স্থানে এক্ষণে জনতাপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড নগর দেখা যাইতেছে, হয় ত কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ স্থানে সাগরের জলরাশি উত্তুঙ্গতরঙ্গমালা নিক্ষেপ করিয়া বায়ু ও আকাশের সহিত ক্রীড়া করিত। অধিক কি, মনুষ্যজাতি আপনাদিগকে সৃষ্টির রাজা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবীপৃষ্ঠে মনুষ্যের নামগন্ধও ছিল না, এবং পৃথিবী অধুনা বিলুপ্ত নানাজাতীয় অদ্ভুত জীবজন্তুর আবাসভূমি ছিল।

উল্লিখিত ব্যাপার সকল উপন্যাস নহে। প্রকৃত সত্য ঘটনা

এই সমুদয় সপ্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। আমাদের এই বাঙ্গালাদেশেই অল্পসময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক নদী প্রভৃতির গতি পর্য্যালোচনা করিতে থাকিলে আমরাও উক্ত প্রকার অনেক পরিবর্ত্ত স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বিগত বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থ নদিয়া যশোহর প্রভৃতি জেলার কত স্থানে ভূভাগের কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, পদ্মা, ভৈরব, খড়িয়া প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদীসমূহের গতিপথ অনেক স্থলে সবিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নদীর স্রোত সরিয়া যাওয়াতে কোথাও জনসমাকীর্ণ গণ্ডগ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কোথাও বা পূর্ব্বে যে স্থান দিয়া নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত ছিল, তথায় চর পড়িয়া ক্রমশঃ নূতন গ্রাম ও লোকালয় সংস্থাপিত হইতেছে। আরও কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ সকল নদী হয়ত অন্য কোন দিক্ দিয়া প্রবাহিত ছিল। সকলেই জানেন নবদ্বীপ নদিয়া জেলার অন্তর্গত, কিন্তু উহা অধুনা ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এরূপ হইবার কারণ কি? কিছুকাল পূর্ব্বে নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত ছিল, কালক্রমে নদী এতদূর সরিয়া গিয়াছে যে সমগ্র নবদ্বীপ একবারে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে পড়িয়াছে। আবার "নবদ্বীপ" এই নামটীর তাৎপর্য্য এই যে উহা পূর্ব্বকালে নদীর গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। পদ্মানদীর ভাঙ্গনে কত গ্রাম একবারে বিলুপ্ত হইতেছে ও উহাদের পরিবর্ত্তে পদ্মার চরে আবার নূতন নূতন গ্রাম সংস্থাপিত হইতেছে। কীর্ত্তিনাশা নদীর স্রোতে প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের কত কীর্ত্তি জলসাৎ হইয়াছে তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীই জানিতে পারেন। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ঢাকা জেলার

বহুদূর পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল, কিন্তু উহা এক্ষণে ঢাকার অনেক পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উহার প্রাচীন স্রোত অধুনা ক্রমশই মজিয়া যাইতেছে। ক্রমাগত চর পড়াতে গঙ্গা পদ্মা প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান নদীই ক্রমশঃ অনাব্য হইয়া উঠিতেছে। ফলতঃ বহুকাল নদীসমূহের এইরূপ দুরবস্থা চলিতে থাকিলে কালক্রমে উহারা শুষ্কপ্রায় হইয়া যাইবে ও হিমালয়ের প্রকাণ্ড তুষাররাশির পরীবাহের জন্য হয় ত কোন নূতন প্রবাহিকার উদ্ভব হইবে। পদ্মাতীরে যাঁহারা বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা উহার দৌরাত্ম্য স্বচক্ষে অনুভব করিয়া থাকেন। পদ্মার প্রবলস্রোতে উহার এক কূল নিয়তই ভাঙ্গিতেছে ও অপর কূল গড়িতেছে নদীর এইরূপ অত্যাচারে কত লোককে নিরন্তর বাসস্থান পরিবর্ত্ত করিতে হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। সম্প্রতি পদ্মানদীর ভাঙ্গনে গোয়ালন্দের প্রকাণ্ড রেলওয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত জলসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আমরা বাহুল্যভয়ে কেবল আমাদের দেশ হইতেই এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তের উদাহরণ প্রদান করিলাম। জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে পাঠার্থীরা বুঝিতে পারিবেন যে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি যাবতীয় ভূভাগেই নিয়ত এইরূপ পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইতেছে।

আবার আমাদের দেশে আগ্নেয় পর্ব্বত নাই। সুতরাং ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের ও তাদৃশ উৎপাত নাই। কিন্তু যে ভূভাগ কোন আগ্নেয় গিরির নিকটে অবস্থিত তথায় ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে কত শত প্রসিদ্ধ নগর বা সুখের সংসারপরিপূর্ণ গ্রাম সমূহ সাগরগর্ভে বা ভূগর্ভে নিহিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থানে সচরাচর এইরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে

ইউরোপের দক্ষিণে নেপল্‌স নগরে বিসুবিয়স নামক একটী প্রসিদ্ধ আগ্নেয় গিরি আছে। খৃষ্টীয় শাকের প্রারম্ভে এই পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পী নামে একটী প্রসিদ্ধ নগরী একবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। অল্প দিন হইল উক্ত স্থান খনন করিতে করিতে পম্পীনগরীর ভস্মাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকাল হইযা গিয়াছে তথাপি পম্পীনগরীর মধ্যে অগ্ন্যুপাতের সময় কি জীবজন্তু কি নির্জীব পদার্থ যাহা যে ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহার অবশেষ অবিকল সেইভাবেই রহিয়াছে! সমুদ্রজলের তরঙ্গ ও নদীবেগ এই দুই কারণে যেরূপ ভূভাগ বিনষ্ট হইয়া যায়, অগ্ন্যুৎপাতদ্বারাও সেইরূপ সৃষ্টিলোপ পাইয়া থাকে। কিন্তু সাগরতরঙ্গ ও নদীবেগ দ্বারা মৃত্তিকা গলিয়া যে ভূভাগ নষ্ট হইয়া যায় তাহাই আবার স্থানান্তরে অন্য আকারে পুনরুদ্গত হয়। ভূমিকম্পাদিদ্বারা কেবল সৃষ্টি লোপ পায় আপাততঃ ইহাই বোধ হয়, কিন্তু এরূপ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। ভূমিকম্পাদি উৎপাতের ও বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। ইহাদ্বারা সাগরগর্ভস্থ অনেক ভূভাগ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অবশেষে জল ছাড়াইয়া উঠে ও দ্বীপাকারে পরিণত হয়। অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভে সমগ্র পৃথিবীই সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, কালক্রমে ভূমিকম্পের উত্তেজনায় উহা ক্রমশঃ জলরাশিভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ফলতঃ এই বিশ্বরাজ্যে একটী ক্ষুদ্র পরমাণুর ও বিলোপ নাই, কেবল নিরন্তর পরিবর্ত্ত হইতেছে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে যে কোন কারণে হউক না কেন, এক স্থানের ভূভাগ বিলুপ্ত হইলে উহা অন্য স্থানে অন্য আকারে নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হইবে।

উল্লিখিত নৈসর্গিক ঘটনাসমূহের প্রতি মনোযোগ করিলে

বিস্মিত হইতে হয় ও ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নির্ম্মাণকৌশলের বিষয় বুঝিতে না পারিয়া কেবল ভক্তিরসে বিহ্বল হইতে হয়। কিন্তু এ সকলের কি কারণ নাই? এই সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপার কি যদৃচ্ছাসম্ভূত, না কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা নিয়ম সমূহের ফলস্বরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। যে সকল ঘটনা ও পরিবর্ত্তের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সমুদয়ই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, সমুদয়েরই নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে একটী সামান্য পরমাণু ও নিয়মের বহির্ভূত নহে। সর্ব্ব নিয়ন্তা ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমূহের অধীন করিয়াছেন। সুতরাং কার্য্য দেখিলেই কারণের অনুমান করিতে হয়। মনুষ্য বুদ্ধিবলে ঐশ্বরিক নিয়ম সকল আবিষ্কৃত করিতে পারেন বলিয়াই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৃথিবী সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্ত্তের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের কারণ অনুসন্ধান ও নির্ণয় করাই প্রাকৃতিক ভূগোল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পৃথিবী ও জীবজন্তু কেন সৃষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু পৃথিবীকে আমরা যেরূপ অবস্থায় দেখিতেছি উহা কেন ওরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কি কারণে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, কি কারণে সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হইতেছে, কি কারণে রাত্রি দিন হইতেছে, কি কারণে বরফ পড়িতেছে, কি কারণে ভূমিকম্প ঝড় বাত্যা সাইক্লোন প্রভৃতি সংঘটিত হইতেছে, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে আমরা নির্ণয় করিতে পারি। ফলতঃ পৃথিবীর প্রকৃতি, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ ও ইহাতে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের কারণাদি নির্ণয় করাই প্রাকৃতিক ভূগোলের কার্য্য।

প্রাকৃতিক ভূগোল শাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেক গুলির সহিত আমরা চিরপরিচিত। বায়ুর সহিত আমাদিগের যেরূপ নিকটসম্বন্ধ অন্য কোন পদার্থেরই সহিত বোধ হয় তাদৃশ নহে। বায়ুর সাহায্যে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবী বায়ুশূন্য হয়, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই সমুদয় জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলতঃ বায়ুর এতদূর প্রয়োজন দেখিয়াই পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা মন্দ মন্দ মলয় পবন হইতে প্রচণ্ড ঝটিকা পর্য্যন্ত বায়ুর নানাবিধ মূর্ত্তি অণুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বায়ুর ন্যায় জল ও আমাদের চিরপরিচিত। আমরা দেখিতেছি, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলবেগে বারিবর্ষণ করিতেছে ও ঐ বৃষ্টির সাহায্যে আমাদের শস্যক্ষেত্রসমূহ তৃণশস্যাদিতে বিভূষিত হইয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। আপাততঃ এই সকল প্রাত্যহিক ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধ্যান করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে এ সকল সামান্য ব্যাপার নহে। বায়ু কখন মন্দ মন্দ সঞ্চারে মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে, কখন বা ভীষণ ঝঞ্জাবাতরূপে সৃষ্টিলোপ করিতে উদ্যত হয়। কখন বৃষ্টির অভাবে তৃণশস্যাদি শুষ্ক হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, কখন বা অতিবৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ঘটনা কি কারণে উপস্থিত হয় আমরা সহজে স্থির করিতে পারি না। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ করিলে এই সকল বিষয়ের তথ্য জানিতে পারা যায়। সমগ্র বায়ুরাশিকে একটী অখণ্ড পদার্থ মনে করিয়া উহার প্রকৃতি গুণ ও কার্য্য প্রভৃতি নির্ণয় করা প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্যতম কার্য্য।

বায়ুর ন্যায় মেঘ বৃষ্টি সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি যাবতীয় নৈস র্গিক ব্যাপারই এই শাস্ত্রের বিবেচ্য ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে রাজ্য দেশ নগর গ্রাম লোক বাণিজ্য প্রভৃতি ভূগোলের যে অংশে বর্ণিত হয় তাহার নাম রাজনীতিক ভূগোল, উহার সহিত প্রাকৃতিক ভূগোলের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই।

প্রাকৃতিক ভূগোলে সচরাচর যে সকল বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে সমুদয় কণ্ঠস্থ করিলেই প্রাকৃতিক ভূগোল শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি জন্মিবে পাঠার্থীরা যেন এরূপ কখনই মনে না করেন পুস্তক পাঠ করিয়া স্বয়ং সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে শিখাই পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য গ্রন্থে কেবল পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইবে নিম্নে সংক্ষেপে তৎসমুদয়ের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে পাঠার্থীরা পুস্তকের আদ্যন্ত কাণ্ডগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রথমতঃ। পৃথিবীর আকার ও প্রকৃতি কিরূপ? ইহা যে একটী গ্রহ তাহা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, সুতরাং গ্রহ বলিয়া পৃথিবীর কি কি গুণ তাহা জানা আবশ্যক। অন্যান্য গ্রহের সহিত পৃথিবীর কিরূপ সম্বন্ধ। সূর্য্য সমুদয় গ্রহের কেন্দ্রস্বরূপ ও আলোক ও উত্তাপের আদি কারণ। এই সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর কিরূপ সম্বন্ধ বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই সকল বিষয় সবিস্তরে বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহাদির বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের ঐ আবাসভূমি পৃথিবীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভূমণ্ডল একটী বায়বীয় আবরণে সমন্তাৎ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই বায়বীয় আবরণের স্বরূপ

কি প্রকার? উহা কি কি উপকরণে নির্ম্মিত, উহাদ্বারা ভূপৃষ্ঠে কিরূপ কার্য্য উৎপাদিত হইয়া থাকে? পরে এই সকল বিষয় বিবেচিত হইবে।

তৃতীয়তঃ। বায়ুগোলক পৃথিবীর সর্ব্বোপরিস্থ আবরণ, কিন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার অবয়বের সহিত অব্যবহিত আর একটী আবরণ আছে। আমাদের মধ্যে সকলেই জানেন জল কি পদার্থ। যে জলরাশি পৃথিবীকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে উহাকে মহাসাগর কহে। পৃথিবীর ভূভাগ জলমধ্যস্থ বলিয়া আমাদের শাস্ত্রকারেরা উহাকে সাগরাম্বরা এই বিশেষণ দিয়া থাকেন। এই জলের বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই জন্য বায়ুনির্ণয়ের পর জলের প্রকৃতি, উপকরণ, সমুদ্রের প্রবাহ, জোয়ার ভাটা, বৃষ্টি প্রভৃতির বিষয় সবিস্তরে বিবেচিত হইবে।

চতুর্থতঃ। বায়ু ও জলের বিষয় নিঃশেষ করিয়া পৃথিবীর ভূভাগের বিষয় বর্ণিত হইবে। এই স্থলে দেশ মহাদেশ দ্বীপ পর্ব্বত আগ্নেয় গিরি প্রভৃতি কাহাকে বলে, কি প্রকারে উহাদের উৎপত্তি হয়, উহাদের দ্বারা ভূপৃষ্ঠে কিরূপ কার্য্য উৎপাদিত হইয়া থাকে, এই সমুদয় বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেচিত হইবে।

পঞ্চমতঃ। পরিশেষে ভূপৃষ্ঠের কোন্ অংশের কিরূপ উষ্ণতা, কিরূপ আবহাওয়া, কিরূপ জলবায়ু, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রকার জলবায়ু হইবার কারণই বা কি? এই সকল বিষয় বিবেচিত হইবে। উপসংহারে পৃথিবীর কোন্ অংশে কিরূপ জীব ও উদ্ভিজ্জের বাস ও কি কারণেই বা ওরূপ হইয়া থাকে, এই সমুদয় নিরূপণপূর্ব্বক পুস্তক শেষ করা যাইবে।

প্রাকৃতিক ভূগোল।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর আকার।

বহুকাল পূর্ব্বে মানুষের এই সংস্কার ছিল যে পৃথিবী দর্পণের ন্যায় চতুষ্কোণ ও বহুদূরবিস্তৃত এবং সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রসমূহ ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক রাত্রি দি প্রভৃতি উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধি চর্চ্চা হওয়াতে উল্লিখিত সংস্কার ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপ হইয়াছে। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন পৃথিবী একটী গ্রহ, পৃথিবীর আকার কমলালেবুর ন্যায় গোল এবং ইহা প্রতিনিয়ত সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে শূন্যমার্গে পরি ভ্রমণ (করতঃ) প্রতিবৎসর একবার করিয়া সূর্য্যমণ্ড প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি আরও অনেক গুলি গ্রহ শূন্যমার্গে পরিভ্রমণপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল এই গ্রহমণ্ডলী

পরিভ্রমণপথের কেন্দ্রস্বরূপ। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে সেইরূপ ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলির চতুর্দ্দিকে ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র গ্রহদিগকে উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক কহে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ ও চন্দ্রাদি উপগ্রহ কি প্রকারে শূন্যমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে ও নিজ নিজ পথ হইতে যে স্খলিত হয় না, তাহার কারণ কি? প্রকৃতির নিয়ম এই জগতে যাবতীয় পরমাণু আছে সমুদায়ই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবী সূর্য্য বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ ও চন্দ্রাদি উপগ্রহ পরস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া একটী পরিবারের ন্যায় একত্র বিচরণ করিতেছে, কোন প্রকারে স্থানভ্রষ্ট হইতে পারে না। এই আকর্ষণের বলেই আবার মনুষ্যাদি জীবজন্তু স্থানভ্রষ্ট না হইয়া ভূপৃষ্ঠে সুখে কালযাপন করিতেছে। সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহসমূহের কেন্দ্র, এই কেন্দ্র ও গ্রহ উপগ্রহাদি সমষ্টির সাধারণ নাম সৌর জগৎ। আমরা নির্ম্মল আকাশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহারাও প্রত্যেকে সূর্য্যের ন্যায় এক একটী স্বতন্ত্র সৌরজগতের কেন্দ্র, সুতরাং বিশ্বসংসারে কত সৌরজগৎ বিদ্যমান আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঈশ্বরের সৃষ্টি কি অসীম কি অনন্ত!

পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণকরিতেছে ও চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠার্থিগণ সামান্যতঃ বুঝিয়া রাখিবেন যে উক্ত পার্থিব-গতির প্রভাবেই দিন রাত্রি শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যাইবে।

পৃথিবীর আকার কিরূপ তাহা সামান্যাকারে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে পৃথিবীর আকার গতি প্রভৃতির বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে।

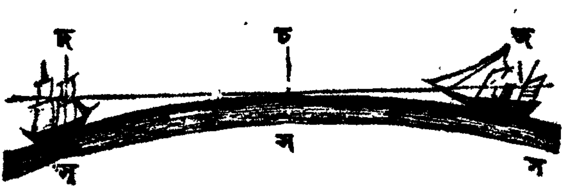
পৃথিবী গোলাকার কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে। কমলালেবুর ন্যায় ইহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা। বোধ হয় সৃষ্টির প্রারম্ভে ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল, পরে নিয়ত ঘূর্ণনদ্বারা ইহার উভয় প্রান্ত কিঞ্চিৎ বসিয়া গিয়াছে ও উহার পার্শ্বদ্বয় কিঞ্চিৎ ঠেলিয়া উঠিয়াছে। একটী কাঁচা মাটীর ভাঁটা ঠিক গোল করিয়া নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া একটী শলাকা বা সরু কাটী প্রবিষ্ট করিয়া যদি ঐ কাটী ধরিয়া ভাঁটা-টীকে ঘুরান যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ উহার দুই প্রান্ত বসিয়া যাইবে ও দুই পার্শ্ব কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া ঠেলিয়া উঠিবে। আদি-কালে পৃথিবীও যে ভাঁটার ন্যায় কাঁচা ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রমাণদ্বারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) যদি ইংলণ্ড বা ভারতমহাসাগর হইতে জাহাজ খুলিয়া অনবরত পশ্চিমাভিমুখে যাওয়া যায়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে আমরা ইংলণ্ড বা ভারতমহাসাগরের যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম অবিকল সেই স্থানে উপনীত হইব; কুত্রাপি দিক্ বিবর্ত্ত করিতে হইবে না। পৃথিবী গোল না হইয়া অন্য কোন আকারের হইলে কখনই এরূপ ঘটনা হইতে পারে না।

(২) সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া যদি সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে কখন কখন বহুদূরে ভাসমান জাহাজের ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মাস্তুল পাইল প্রভৃতি প্রথমতঃ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে থাকে, পরে জাহাজ

খানি ক্রমশঃ যতই তীরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উহার অন্যান্য অংশ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং এইরূপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে পরিশেষে আমরা সমগ্র জাহাজখানি দেখিতে পাই। দূর হইতে জাহাজের মাস্তুল যখন আমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পতিত হয়, তখন ঠিক যেন বোধ হয় যে জাহাজ খানি সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে। এইরূপ যদি কোন জাহাজ আমাদের নিকট হইতে দূরে যাইতে থাকে, তখন প্রথমতঃ উহার অধোভাগ অর্থাৎ হালি প্রভৃতি অদৃশ্য হইতে থাকে, পরে যতই জাহাজ অগ্রসর হয় ততই উহার অন্যান্য অংশ ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে হইতে সমগ্র জাহাজ খানি অদৃশ্য হইয়া যায়, বোধ হয় যেন জাহাজ খানি সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। যদি সমুদ্রের উপরিভাগ সমতল হইত, তাহা হইলে জাহাজ খানি কখনই ক্রমশঃ দৃশ্য বা অদৃশ্য হইতে পারিত না। ফলতঃ দর্শক ও জাহাজ এই উভয়ের মধ্যভাগ উচ্চ অর্থাৎ গোলাকার বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে।

পৃথিবী গোল।



এইরূপ আবার শরৎকালে আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও পরিচ্ছন্ন হইলে যদি আমরা কোন দিন প্রাতঃকালে মালদহ, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া বা মুঙ্গের প্রভৃতি যে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া উত্তরদিকে দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমরা হিমালয় পর্ব্বতের তুষারধবল শৃঙ্গরাজি বালসূর্য্যকিরণে বিরাজিত রহিয়াছে

দেখিতে পাই। এই সকল শৃঙ্গ বহুদূর উন্নত ও আকাশভেদী, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে উহাদিগকে তাদৃশ উচ্চ বলিয়া বোধ হয় না, আর পরিদৃশ্যমান পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নভাগ একবারে অদৃশ্য থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? যদি পৃথিবী সমতল হইত, তাহা হইলে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের আপাদমস্তক একবারেই দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে পতিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া শৃঙ্গসমূহের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকে। ইহাদ্বারা নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে দর্শক ও দৃষ্ট পদার্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ গোলাকার পৃথিবীর কিয়দংশ বলিয়া কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত এবং এই উন্নতিই দর্শকের গতিরোধ করে বলিয়া সমগ্র পদার্থ একবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরে দর্শক ও দূরবর্ত্তী অর্ণবযানঘটিত যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে সেস্থলেও অবিকল এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পৃথিবী গোলাকার বটে কিন্তু এত বৃহৎ যে আমরা অল্প স্থানের মধ্যে উহার গোলত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

(৩) যদি পৃথিবী গোলাকার না হইয়া সমভূমি হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক সময়ে সূর্য্যোদয় হইত, কিন্তু এরূপ না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, কোন স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। আবার যদি পৃথিবী গোলাকার না হইয়া সমতল হইত, তাহা হইলে অবশ্যই পর্ব্বতাদি উন্নত স্থানে উঠিলে সমগ্র পৃথিবী একবারে দৃষ্টিক্ষেত্রে পতিত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া পর্ব্বতাদির উন্নতি অনুসারে দৃষ্টিক্ষেত্রের তারতম্য হইয়া থাকে।

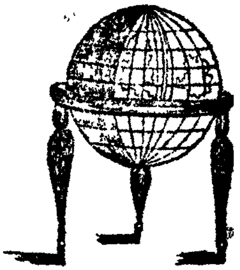
(৪) পরে সপ্রমাণ হইবে যে পৃথিবী ও চন্দ্র শূন্যমার্গে

নিরত বিচরণ করিতেছে। এইরূপ বিচরণ করিতে করিতে যখন পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে উপনীত হয় সেই সময় পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা আকারে অনেক বৃহৎ বলিয়া সূর্য্যের আলোক প্রতিরোধ করে ও চন্দ্র অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাকে চন্দ্রের গ্রহণ কহে। চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে উহা সর্ব্বদাই গোলাকার দেখায়। পৃথিবী গোলাকার না হইলে কখনই এরূপ হইতে পারে না।

(৫) যদি ইহা সম্ভব হইত, যদি আমরা কোন উপায়ে আমাদিগকে চন্দ্রের উপর লইয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হওয়াতে পৃথিবীকে অবিকল চন্দ্রের ন্যায় গোলাকার বোধ হইত। যদি সূর্য্যমণ্ডল হইতে কোন ব্যক্তি আমাদের পৃথিবীতে আসিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার মুখে নিশ্চয়ই শুনিতাম যে পৃথিবী তথা হইতে একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

পৃথিবী গোলাকার বটে কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা; সুতরাং ইহার আকার কমলা লেবুর ন্যায়। কি প্রকারে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে এবং কি উপায়েই বা ইহা মাপিয়া স্থির করা যায় তাহা পরে বর্ণিত হইবে। যদি এই চাপা অংশের একটীর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া এরূপ একটী রেখা কল্পনা করা যায় যে উহা পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া অপর চাপা প্রান্তের ঠিক মধ্যস্থলে উপনীত হয়, তাহা হইলে ঐ কল্পিত রেখাকে পৃথিবীর অক্ষ বা অক্ষদণ্ড কহে। অক্ষরেখা যে দুই প্রান্তে পৃথিবী স্পর্শ করে উহাদিগের নাম মেরু। উত্তর প্রান্তকে উত্তর মেরু বা সুমেরু ও দক্ষিণ প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু কুমেরু কহে। মেরুদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পৃথিবীর

অপেক্ষাকৃত উন্নত অংশ পরিবেষ্টন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে যে রেখা কল্পনা করা যায়, তাহার নাম নিরক্ষ বা বিষুবরেখা। এই রেখাদ্বারা পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণে দুই সমান অংশে বিভক্ত হয়।



পৃথিবীর আকার গোল ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে, পৃথিবীর পরিমাণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পৃথিবীর গরিষ্ঠ ব্যাস অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীকে ভেদ করিয়া উভয়প্রান্তে বিষুব-রেখা স্পর্শ করে তাহার দৈর্ঘ্য ৭৯২৫ মাইল আর উহার লঘিষ্ঠ অর্থাৎ মেরুস্পর্শী ব্যাসের দৈর্ঘ্য ৭৮৯৯ মাইল, অতএব মোটের উপর পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ৭৯২৫ মাইল হইতে ৭৮৯৯ মাইল বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের নিম্নতার পরিমাণ অর্থাৎ গড়ে ২৬ মাইল। পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১৯৭০০০,০০০ বর্গ মাইল। ইহার ঘনফল ২৬০,০০০,০০০,০০০ ঘন মাইল ও ইহার গুরুত্ব প্রায় ৫,৪২৫,০৯২,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর গতি।

আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে পৃথিবী নিশ্চল, এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ও সূর্য্যচন্দ্রাদি উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু বহুদিবস হইল জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতি হওয়াতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে উল্লিখিত সংস্কার ভ্রান্তি-মূলক। সকল জ্যোতিষ্কই আকাশমার্গে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য অন্য কোন জ্যোতিষ্কের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে কি না তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু সূর্য্যের যে এক প্রকার গতি আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে ও চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

পৃথিবীর গতি সর্ব্বসমেত তিন প্রকার। প্রথম ইহার সাধারণ গতি, দ্বিতীয় ইহার আহ্নিক গতি ও তৃতীয় ইহার বার্ষিক গতি। প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি স্ব স্ব গতিতে পরিভ্রমণ করাতে সমগ্র সৌরজগৎ শূন্যমার্গে অগ্রসর হইতেছে। মনে কর সমগ্র সৌরজগৎ এক খানি গাড়ির চাকার ন্যায়, এই চক্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র নিহিত রহিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গতি আছে এবং সমগ্র চক্রখানির ও স্বতন্ত্র গতি আছে। অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রগুলি গ্রহ উপগ্রহাদির ন্যায় ও সমগ্র চক্রখানি সমগ্র

সৌরজগতের প্রতিরূপ। এক্ষণে বিবেচনা কর সমগ্র চক্রখানির গতিবশতঃ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রগুলিও অগ্রসর হইতেছে, তদ্রূপ সমগ্র সৌরজগতের গতিবশতঃ পৃথিবীও শূন্যমার্গে অগ্রসর হইতেছে, আর ইহার নিজেরও স্বতন্ত্র গতি আছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে পৃথিবীর সাধারণ গতির বিষয় তাদৃশ প্রয়োজনীয় না হওয়াতে বিশেষরূপে বিবৃত হইল না।

পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রকার গতি ইহার আহ্নিক গতি। পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিজ অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে একবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং এইরূপ নিয়ত আবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। যেরূপ গাড়ির চাকা আপন অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হয়, পৃথিবীও প্রায় সেইরূপ করিয়া থাকে। ইহাকেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি কহে; কারণ এইরূপ আবর্ত্তন করিতে যত সময় অতিবাহিত হয়, উহাকেই আমরা এক অহোরাত্রি কহিয়া থাকি। মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিবার সময় যখন পৃথিবীর যে ভাগ সূর্য্যমণ্ডলের সম্মুখীন হয়, তখন সেই ভাগে সূর্য্যের আলোক নিপতিত হওয়াতে দিন হইয়া থাকে, এবং অন্যভাগে সূর্য্যালোক না লাগাতে রাত্রি হইয়া থাকে। একটী ক্ষুদ্র মৃণ্ময় গোলক লইয়া প্রদীপের সম্মুখে ধরিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে উহার অর্দ্ধাংশে প্রদীপের আলোক পড়িল ও অর্দ্ধাংশ অন্ধকার হইল, পৃথিবীবিষয়েও অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা গেল যে এক সময়ে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে রাত্রি ও অর্দ্ধাংশে দিনমান হইয়া থাকে। এই ব্যাপারটীও পৃথিবীর গোলত্বের অপর একটী প্রমাণ। এরূপ যে হইয়া থাকে তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

আমরা পৃথিবীর যে অংশে অবস্থিতি করিতেছি, আমেরিকা তাহার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। এক্ষণে আটলাণ্টিক মহাসাগরের ভিতর দিয়া ইউরোপ ও আমাদের দেশ হইতে টেলিগ্রাফের তার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোন স্থানে আটক না হইলে কলিকাতা হইতে তারে খবর দিলে দুই তিন মিনিট সময়ের মধ্যেই উহা আমেরিকায় পৌঁছিতে পারে। যদি আমরা ঠিক বেলা দুই প্রহরের সময় তারযোগে আমেরিকায় সংবাদ প্রেরণ করি, তাহা হইলে উহা ২।৩ মিনিটের মধ্যেই আমেরিকায় পৌঁছে, কিন্তু যখন পৌঁছে তখন আমেরিকায় ঠিক দুই প্রহর রাত্রি। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা গেল যে যখন আমাদের দেশে বেলা দুই প্রহর, তখন আমেরিকার যে অংশ আমাদের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত তথায় রাত্রি দুই প্রহর। আমাদের বোধ হয় পৃথিবী স্থির রহিয়াছে ও সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু ফলে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিতেছে অর্থাৎ পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ অতি ভয়ানক; ইহা বিষুবরেখার নিকট প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ১৫০০ ফুট পথ অতিক্রম করিয়া থাকে, বিষুবরেখার নিকট ইহার বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এখান হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠের দূরত্ব অনুসারে বেগেরও হ্রাস হইয়া থাকে। মেরুদ্বয়ের নিকট ইহার বেগ প্রায় কিছুই নহে বলিলেও বলা যায়।

এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে যদি পৃথিবী এত ভয়ানক বেগের সহিত আপন কক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং এই বেগের উপর আবার সবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন আমরা উহার পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়াও

উহার গতি অনুভব করিতে পারি না কেন? আর কি রূপেই বা আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পতিত হই না, কি প্রকারে আমরা পৃথিবীর এত বেগ সত্ত্বেও ইহার পৃষ্ঠে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছি?

এই দুই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা কঠিন কহে। এক্ষণে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি হওয়াতে এসকল বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যখন আমরা নৌকারোহণে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাই, তখন যদি আমাদের নৌকা বেগে চলিতে থাকে এবং আমাদের পার্শ্বে যদি কোন নৌকা বাঁধা থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ আমাদের নৌকা চলিতে থাকে এবং আমরা উক্ত স্থির নৌকা দেখিতে পাই, আমাদের অবিকল বোধ হয় যেন আমাদের নৌকা স্থিরভাবে রহিয়াছে ও অপর নৌকা বেগে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ আবার যদি আমাদের নৌকা বাঁধা থাকে ও অপর এক খান নৌকা উহার পার্শ্ব দিয়া বেগে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের অবিকল বোধ হয় যেন আমাদের নৌকা বেগে চলিতেছে ও অপর নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। নৌকায় যাইবার সময় যেমন আমরা আমাদের নৌকা বা অপর কোন নৌকার গতি অনুভব করিতে পারি না, সেইরূপ আমরা পৃথিবীরও গতি অনুভব করিতে পারি না, আমাদের বোধ হয় পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে তাহাও আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। যদি পর্ব্বতাদি উন্নত স্থানে আরোহণপূর্ব্বক তথা হইতে আস্তে আস্তে একটী ঢিল নিম্নে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইবে ঢিলটী যেস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক নিম্নে না পড়িয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া পড়ে।

ইহার কারণ এই, ঢিলটী ভূমিসংলগ্ন হইতে যতটুকু সময় লাগে, পৃথিবী ততটুকু সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব দিকে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, এবং এই কারণেই ঢিলটী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ভূমিসংলগ্ন হয়, পৃথিবী নিশ্চল হইলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না। যে পরীক্ষাটীর বিষয় উল্লিখিত হইল, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাপ্রকারেও সপ্রমাণ হইতে পারে যে পৃথিবী নিশ্চল নহে, নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে।

পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে ইহা যেন স্থির হইল, কিন্তু তবে আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া যাই না কেন? পৃথিবী ত গোলাকার, অতএব যাহারা আমাদের বিপরীত দিকে রহিয়াছে, তাহাদের মস্তক নিশ্চয়ই আমাদের পদতলের দিকে রহিয়াছে, তবে তাহারা পড়িয়া যায় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর আকর্ষণই আমাদের না পড়িয়া যাইবার একমাত্র কারণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জগৎ সংসারের নিয়মই এই যে প্রত্যেক পরমাণুই অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যাহার পরমাণুসমষ্টি অধিক হওয়াতে আকর্ষণের বেগ অধিক হয়, তাহাই তদপেক্ষা ক্ষুদ্র পদার্থকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজের দিকে লইয়া যায়। এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবী আপন কেন্দ্রের দিকে সমুদায় পদার্থকেই আকর্ষণ করিতেছে, কারণ পৃথিবীর আকর্ষণের বেগ সমুদয় পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা গুরুতর। এবং এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সমুদায় পার্থিব পদার্থ পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত রহিয়াছে, স্থানভ্রষ্ট হইতেছে না। এই জন্যই পৃথিবী নিরন্তর প্রবলবেগে চলিতে থাকিলেও পতিত হইতেছে না। এই জন্যই আমাদের পদতলের দিকে অবস্থিত লোকেরাও স্থানভ্রষ্ট হইতেছে না। ফলতঃ উচ্চ আর নীচ এই দুই শব্দের অর্থ আর

কিছুই নহে, যে দিকে আমাদের মস্তক সেই দিককে আমরা উ বলিয়া থাকি ও যে দিকে পদ সেইদিককে নীচ শব্দ নির্দ্দেশ কর্ স্তরাং আমরা আমেরিকার অধিবাসীদিগকে যেরূপ আমাদে নীচে অবস্থিত মনে করিতেছি, তাহারাও আমাদিগকে ঠিক সে রূপ আপনাদের নীচে অবস্থিত মনে করিতেছে, অথচ কেহ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইতেছে না। যে আকর্ষণের বিষ উল্লিখিত হইল উহাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। মাধ্যাকর্ষণে প্রভাবে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত পদার্থ ভূমিতে পতিত হয় ও এই আকর্ষণে প্রভাবে আমরাও স্থানচ্যুত না হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থান করি পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্ব্বত্রই যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ঠিক সমান এরূ নহে। নিরক্ষবৃত্তের উপরিস্থ স্থানসমূহ কেন্দ্রের অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই সকল স্থানে পদার্থের ভার অধিক আ এখান হইতে উত্তর বা দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ ভারে তারতম্য হয়। এইরূপ আবার উচ্চস্থানে উঠিলেও পদার্থের ভা কমিয়া যায়।

পৃথিবীর তৃতীয় প্রকার গতিকে ইহার বার্ষিক গতি কহে পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষি করে। সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে যে সময় লাগে উহাকেই বৎ সর কহে। সচরাচর ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করা যায়। ১৫ দণ্ড কাল অবশিষ্ট থাকে ইংরাজী হিসাবে উহার সমষ্টি করি চারি বৎসর অন্তর প্রতি বৎসরে একটী অধিক দিন পরিগণি হইয়া থাকে। পৃথিবী যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা নাম পৃথিবীর কক্ষ। এই কক্ষ সম্পূর্ণরূপে গোলাকার নহে ফেলী কুগড়ার ন্যায়, ফল লম্বাভাগে কাটিলে ছেদমুখের যেরূ আকার হয়, পৃথিবীর ভ্রমণমার্গের আকার অনেকাংশে সেইরূপ

উহাকে ইলিপ্স বা ক্ষেপণী কহে। ইলিপ্সের লম্বাদিকে ও চওড়াদিকে দুইটী ব্যাস ধরা যায়। লম্বাদিকের ব্যাসের উপর দুইটী বিন্দু কল্পিত হইয়া থাকে, উহাদিগকে ইলিপ্সের কেন্দ্র কহে। এই উভয়ের অন্তর কেন্দ্রে সূর্য্যের অবস্থান। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে আপন কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী এক সময় সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত হয় এবং আর এক সময় সূর্য্য হইতে অত্যন্ত দূরে যায়। ফলে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের গড় ৯১, ৩২৮,৬০০০ মাইল। পৃথিবীর বেগও ভয়ানক, ইহা প্রতি ঘণ্টায় ৬৮০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে করিতে এক বৎসরে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

পৃথিবীর আহ্নিকগতিবশতঃ দিবারাত্রি হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, কি প্রকারে দেশ ও কালভেদে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয় ও কি প্রকারেই বা শীত গ্রীষ্মাদি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। পৃথিবীর বার্ষিক গতিই দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুর কারণ। মনে কর যদি পৃথিবী এরূপ ভাবে অবস্থিত হইয়া উহার কক্ষে ঘুরিতে থাকিত, যে পৃথিবীর অক্ষদণ্ড উহার কক্ষক্ষেত্রের সহিত মিলনে সমকোণ উৎপন্ন করিত অর্থাৎ পৃথিবী ঠিক লম্বভাবে অবস্থিত হইয়া ঘুরিতে থাকিত, তাহা হইলে কুত্রাপি কোন সময়েই দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারিত না, পৃথিবীর সকল অংশে সকল সময়েই দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হইত।

কিন্তু পৃথিবীর ধ্রুব ব্যাস বা অক্ষদণ্ড ঠিক লম্বভাবে অবস্থিত নহে, কিঞ্চিৎ তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত, এবং উহা সর্ব্বদাই ঐ তির্য্যগ্‌ভাব রক্ষা করে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই আপনার পূর্ব্ব অবস্থান-

বাড়িতে থাকে, কারণ এই সময় হইতে দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের অভিমুখীন হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে ক্রমশঃ ২২ শে ডিসেম্বর তারিখে উত্তরার্দ্ধে রাত্রিবৃদ্ধির চরমসীমা হয় ও উত্তর মেরুতে অনবরত ছয় মাস কাল রাত্রি হইয়া থাকে, সূর্য্যোদয় হয় না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে নিরক্ষরেখা হইতে যে স্থান যত উত্তরে অবস্থিত, শীতকালে তথায় রাত্রি তত বড় হইতে থাকে, এই কারণে শীতকালে ইংলণ্ডের রাত্রি আমাদের রাত্রি অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া থাকে। উত্তরার্দ্ধে দিবারাত্রির যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় দক্ষিণার্দ্ধে তাহার ঠিক বিপরীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উত্তর মেরুতে যখন ছয় মাস দিন, তখন দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস রাত্রি এবং যখন পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে দিন বাড়িতে থাকে, তখন দক্ষিণার্দ্ধে দিন ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এবং যখন উত্তরার্দ্ধে রাত্রি বাড়িতে থাকে তখন দক্ষিণার্দ্ধে দিন বাড়িতে থাকে। কেবল ২২ শে মার্চ ও ২২ শে সেপ্টেম্বর সমগ্র পৃথিবীর উপর সমান দিন রাত্রি হইয়া থাকে। ২২ শে জুন উত্তরার্দ্ধে দিবামানের চরমসীমা, কিন্তু দক্ষিণার্দ্ধে ঐ দিবস রাত্রিমানের চরমসীমা, এবং ২২ শে ডিসেম্বর উত্তরার্দ্ধে রাত্রিমানের চরমসীমা, কিন্তু দক্ষিণার্দ্ধে দিবামানের চরমসীমা হইয়া থাকে।

শারদ বিষুব পদ।



বাসন্ত বিষুব পদ।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও ইহার অক্ষদণ্ডের বক্রভাবে অবস্থিতি এই উভয় কারণে যেমন ভূপৃষ্ঠে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অবিকল এই দুই কারণেই আবার শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময় আমরা দেখিতে পাই, যে সূর্য্য যেন আকাশের অপেক্ষাকৃত নিম্ন-অংশে অবস্থিতি করে, আমাদের মস্তকের উপর উঠিতে পারে না। যখন এইরূপ ঘটনা হয় তৎকালেই শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয় ও সূর্য্যকিরণ তাদৃশ প্রখর বোধ হয় না। এইরূপ আবার কখন কখন সূর্য্যকে আকাশমার্গে বিলক্ষণ উচ্চস্থানে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, এবং এই সময় সূর্য্যের কিরণ লম্বভাবে আমাদের উপর পতিত হওয়াতে অত্যন্ত উষ্ণ ও প্রখর বোধ হয় সুতরাং গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সূর্য্যের গতিবশতঃ এরূপ হয় না, পৃথিবীর কক্ষে উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান অনুসারে এইরূপ শীত গ্রীষ্মাদি অনুভূত হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্ত ও উত্তর মেরুর অন্তর্গত স্থানসমূহে দিবামান রাত্রির অপেক্ষা বর্দ্ধিত হয়, কারণ ঐ সময় উত্তর মেরু সূর্য্যের অভিমুখে অবস্থিত থাকে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, দিবস অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ব্যাপী হয় বলিয়া উক্ত সময়ে উক্ত প্রদেশসমূহ অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। এই সময় পৃথিবীর ঐ অংশে সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয় এবং পৃথিবী অতিশয় উত্তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার দিবস দীর্ঘ বলিয়া যেমন অধিক উত্তাপ পৃথিবীর অন্তর্গত হয়, রাত্রি অল্প বলিয়া সেইরূপ অতি অল্পমাত্র উত্তাপ নষ্ট হইতে পারে, সুতরাং সমষ্টি অপেক্ষা ব্যয় অল্প হওয়াতে ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ হইয়া উঠে ও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম আসিয়া

উপস্থিত হয়। আবার যখন শীতকালে উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে বিমুখভাবে অবস্থিত হয়, তৎকালে রাত্রি দীর্ঘতর হওয়াতে অধিক উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দিন ক্ষুদ্র হওয়াতে পৃথিবী অল্পই উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাংই এই সময় পৃথিবী উত্তরার্দ্ধে শীত উপস্থিত হয়। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু যে যে সময়ে সংঘটিত হইয়া থাকে দক্ষিণার্দ্ধে ঠিক তাহার বিপরীত হয়। অর্থাৎ যখন আমাদের দেশে শীত তখন দক্ষিণার্দ্ধে গ্রীষ্ম, ও যখন আমাদের দেশে গ্রীষ্ম তখন দক্ষিণার্দ্ধে শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। শীত ও গ্রীষ্ম পৃথিবীর প্রধান ঋতু, বসন্ত, শরৎ প্রভৃতি শীত ও গ্রীষ্মের অবান্তর ভেদ মাত্র সুতরাং এই সকল ঋতু ও পৃথিবীর গতি, সূর্য্যকিরণের পাত ও নিরক্ষরেখা হইতে দূরতা অনুসারে সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শীত গ্রীষ্মের প্রাবল্য অনুসারে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অর্দ্ধকে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ইহাদের মধ্যে সকলের শেষে অর্থাৎ অন্যতর মেরুর সন্নিহিত ভাগ দুইটাতে শীতের অধিকতর প্রসর। মধ্যের ভাগটী সমশীতোষ্ণ ও শেষেরটী নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী বলিয়া অধিকতর উষ্ণ

সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর কিরূপ সম্পর্ক তাহা এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তদ্বিষয়ে অবশিষ্ট দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহের সহিত তাদৃশ নহে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, এত দূরে অবস্থিত, যে যদি অত্যন্ত দ্রুতগামী রেলওয়ে শকটে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে করিতে পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলে যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলেও

তথায় পৌঁছিতে আমাদের প্রায় ৩৪০ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইত। আবার সূর্য্যের আয়তন এত বৃহৎ যে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিলেও সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে ৯ বৎসর সময় লাগিবে। কিন্তু এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে এক মাসের অধিক সময় লাগে না। এক্ষণে অনুমান করিয়া দেখ সূর্য্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা কত বড় ও কত দূরে অবস্থিত। ফলতঃ এই সকল কারণে আমরা বহুদিবস পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রকৃতির বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না। সূর্য্যদেবকে স্বভাবতই আমাদের পরমোপকারী দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও সূর্য্য ও চন্দ্রকে পরমেশ্বরের চক্ষুর্দ্বয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক অধুনা বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হওয়াতে সূর্য্যের বিষয় অনেক অবগত হওয়া গিয়াছে। সূর্য্যের কিরণপরীক্ষাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে উহাতে বহুবিধ পার্থিব পদার্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সূর্য্যের এত ভয়ানক উত্তাপ যে উহার প্রভাবে তথায় লৌহাদি ধাতু গলিয়া গিয়া একবারে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। লৌহ ভিন্ন অন্যান্য নানাবিধ ধাতু ও অপরাপর পার্থিব পদার্থ সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্যমান আছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্যমণ্ডলের যেরূপ উত্তাপ, অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে পূর্ব্বকালে চন্দ্র ও পৃথিবীরও তাদৃশ উত্তাপ ছিল। ক্রমশঃ উত্তাপ নির্গত হইয়া পৃথিবী ও চন্দ্র শীতল হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উষ্ণ, সুগভীর কূপাদি খনন করিবার সময় ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহার অভ্যন্তর ভাগের উষ্ণতাবশতঃ পদার্থসমূহ তরল হইয়া আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বর দ্বারা বাহিরে আসিয়া পড়ে। আর চন্দ্রের মধ্যেও যে

পূর্ব্বকালে অনেকগুলি আগ্নেয় গিরি ছিল, তাহাও দূরবীক্ষণের সাহায্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদির পরস্পর এইরূপ সাদৃশ্য থাকাতে অধুনাতন পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবী প্রভৃতি পূর্ব্বকালে সূর্য্যের অবয়ব ছিল, কালক্রমে খসিয়া খসিয়া স্বতন্ত্র পদার্থাকারে পরিণত হইয়াছে। উষ্ণ পদার্থ হইতে কোন তরল পদার্থ খসিয়া পড়িলে উহা সর্ব্বদাই গোলাকার ধারণ করে। প্রদীপের উষ্ণ তৈল গোলাকারে পতিত হয় ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, সুতরাং এরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে পৃথিবীও সূর্য্য হইতে গোলাকারে পতিত হইয়া ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

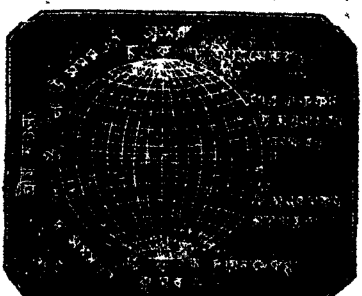
সূর্য্যের সহিত যখন আমাদের এত নিকট সম্পর্ক, তখন সূর্য্য যে আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ সূর্য্য না থাকিলে আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ধারণ করিতে পারি না। সূর্য্য আলোক ও উত্তাপের অদ্বিতীয় কারণ। সূর্য্যের আলোকে দিন ও সূর্য্যের উত্তাপে গ্রীষ্মাদি ঋতু প্রবর্ত্তিত হইতেছে। উত্তাপ ও আলোক, কি জন্তু কি উদ্ভিজ্জ সকল পদার্থের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এই উভয়ের অভাবে কিছুই প্রাণধারণ করিতে পারে না। সূর্য্য হইতে আমরা যেরূপ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হই, সেইরূপ সূর্য্য বৃষ্টিরও কারণ। সূর্য্যের আকর্ষণে জল আকৃষ্ট হইয়া বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হয় এবং মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টি হইতে থাকে। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের সহিত ও পৃথিবীর বিলক্ষণ সম্বন্ধ। চন্দ্র যাবতীয় জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইহা কিঞ্চিদধিক ২৭ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া

থাকে। ইহার আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফাঁপিয়া উঠে ও সমুদ্রে দুইবার করিয়া জোয়ার ভাঁটা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূপৃষ্ঠের গণিত রেখা।

এক স্থান হইতে স্থানান্তরের দূরত্ব, সময়ের তারতম্য ও শীত গ্রীষ্মাদির প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি গণনার সৌকর্য্যার্থ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে কতকগুলি রেখা কল্পিত হইয়া থাকে। নিম্নে আবশ্যক রেখাগুলির নাম ও তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইতেছে।



পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুদণ্ড কাহাকে কহে, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে কল্পিত ঋজুরেখা পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া উত্তর দক্ষিণে উহার পরিধি স্পর্শ করে, তাহার নাম অক্ষ বা মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তকে যথাক্রমে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু কহে।

উভয় মেরু হইতে সমান দূরে অবস্থিত যে বৃহৎ গোলাকার রেখা পৃথিবীর ঠিক মধ্যভাগ বেষ্টনপূর্ব্বক পৃথিবীকে উত্তর ও

দক্ষিণ দুই সম গোলার্দ্ধে বিভাগ করিতেছে, তাহার নাম বিষুব-রেখা।

যে সকল বৃহৎ বৃত্ত বিষুবরেখা স্পর্শে সমকোণ উৎপন্ন করিয়া উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে মেরুস্পর্শ করিতেছে ও পরস্পর ব্যবচ্ছিন্ন হইতেছে, তাহাদের নাম মধ্যন্দিন রেখা। এক মধ্যন্দিনরেখার উপর অবস্থিত সমুদয় স্থানেই এক সময়ে মধ্যাহ্ন হইয়া থাকে।

প্রত্যেক বৃত্তকে ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত করা যায়। উহাদিগকে অংশ বা ডিগ্রী কহে। গণনার সুবিধার্থ প্রত্যেক অংশকে আবার ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টা সময়ে আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে একবার আবর্ত্তন করে। সুতরাং ১ ঘণ্টা সময়ে ইহা ১৫ ডিগ্রী অতিক্রম করিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে কোন স্থান অপর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ১৫ অংশ পূর্ব্বে অবস্থিত হইলে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তথায় মধ্যাহ্ন হইবে এবং ১৫ অংশ পশ্চিমে অবস্থিত হইলে ১ঘণ্টা পরে তথায় মধ্যাহ্ন হইবে।এই প্রকারে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থানের প্রভেদ অনুসারে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য হইয়া থাকে। মধ্যন্দিনরেখা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে গণনা করাই প্রথা। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে গ্রীণিচ নগর হইতে গণনা করা হয়। আমাদের দেশে সিংহল বা উজ্জয়িনী নগর হইতে গণনা করাই রীতি। কলিকাতা অপেক্ষা লণ্ডন নগরে সময়ের প্রায় ৬ ঘণ্টা প্রভেদ, অর্থাৎ আমাদের দেশে বিলাত অপেক্ষা প্রায় ৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যৎকালে আমাদের এখানে প্রাতঃকালে ৬টা বাজিয়াছে, তখন লণ্ডন নগরে রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। পাঠার্থিগণ মৃণ্ময় গোলক দেখিয়া স্থানভেদে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করিতে যেন অবশ্য শিক্ষা করেন।

বিষুবরেখা দ্বারা পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণ দুই সমান গোলার্দ্ধে বিভক্ত হয়, আর মধ্যন্দিন রেখাদ্বারা পূর্ব্ব পশ্চিম দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়।

বিষুবরেখা হইতে কোন স্থানের দূরত্বকে অক্ষদূরত্ব কহে। কোন নির্দ্দিষ্ট মধ্যন্দিনরেখা হইতে পূর্ব্ব-পশ্চিমের দূরত্বকে দ্রাঘিমা কহে।

বিষুববৃত্তের সমান্তর যে সকল বৃত্ত কল্পিত হয় তৎসমুদয়ের নাম অক্ষবৃত্ত।

বিষুবরেখা হইতে ২৩½ অংশ উত্তরে যে বৃত্ত কল্পিত হয় তাহাকে কর্কটক্রান্তি কহে।

বিষুবরেখার ২৩½ অংশ দক্ষিণে এইরূপ যে রেখা কল্পিত হয় তাহার নাম মকরক্রান্তি। মকরক্রান্তি সূর্য্যের দক্ষিণায়নের ও কর্কটক্রান্তি উত্তরায়ণের সীমা।

উত্তর মেরু হইতে ২৩½ অংশ দক্ষিণে যে বৃত্ত কল্পিত হয়, তাহার নাম সুমেরুবৃত্ত, এবং এইরূপ দক্ষিণ মেরুর বৃত্তকে কুমেরুবৃত্ত কহে।

নিরক্ষবৃত্ত, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি ও দুইটী মেরুবৃত্তদ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ সর্ব্বসমেত পাঁচটী স্বতন্ত্র মণ্ডলে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে নিরক্ষবৃত্তের উভয় পার্শ্ব ব্যাপিয়া উষ্ণ মণ্ডল। দুইটী নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ও দুইটী হিমমণ্ডল। কর্কটক্রান্তি ও উত্তর মেরুবৃত্তের অন্তর্গত ভূভাগ উত্তর সমশীতোষ্ণ মণ্ডল, আর মকরক্রান্তি ও দক্ষিণ মেরুবৃত্তের অন্তর্গত ভূভাগ দক্ষিণ সমশীতোষ্ণ মণ্ডল। উভয় মেরু হইতে ক্রান্তিমণ্ডলদ্বয় পর্য্যন্ত ভূভাগকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল কহে। সমশীতোষ্ণ মণ্ডল দুইটীতে সূর্য্যরশ্মি তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয় বলিয়া তথায় শীত গ্রীষ্মের

সমভাব। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয় বলিয়া তথায় গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। আর, দুইটী হিমমণ্ডলে অত্যল্পমাত্র সূর্য্যকিরণ পতিত হয় বলিয়া তথায় শীত অতিশয় প্রবল।

আপাততঃ যেটীকে সূর্য্যের পথ বলিয়া বোধ হয় বস্তুতঃ উহা পৃথিবীরই গতিমার্গ। উহাকে রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্ত কহে। ক্রান্তিবৃত্ত বিষুবরেখার সহিত লম্বভাবে মিলিত না হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে মিলিত হইয়া ২৩½ অংশ পরিমিত কোণ উৎপন্ন করিতেছে। এই উভয় বৃত্তের দুই স্থানে পরস্পর সম্পাত। সম্পাতস্থল দুইটীর নাম ক্রান্তিপাত, এই দুই স্থানে পৃথিবীর অবস্থানের দিবস দিন রাত্রির পরিমাণ সমান হয় ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

পৃথিবীর সমকেন্দ্রিক যে বৃহৎ বৃত্ত পৃথিবীর দৃশ্যমান অর্দ্ধেক হইতে অদৃশ্যমান অর্দ্ধেককে পৃথক করে তাহার নাম চক্রবাল। যে চক্রবাল পৃথিবীপরিধির সহিত সংলগ্ন তাহার নাম ভূচক্রবাল, আর যাহা কেবল আমাদের দৃষ্টিপথের সীমা তাহাকে দৃশ্যমান চক্রবাল কহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর সাধারণ বিবরণ।

পৃথিবী একটা গ্রহ, ইহার আকার গোল, ও ইহা সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই সকল বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হইতেছে তাহাও পূর্ব্বে

নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতপ্রস্তাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ, অভ্যন্তর ও উর্দ্ধভাগের বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যে পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে বায়ুর নিয়ত সঞ্চার হইতেছে। পৃথিবীস্থ জীবজন্তু বায়ুসেবনপূর্ব্বক জীবনধারণ করিতেছে। বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু স্পর্শদ্বারা আমরা বায়ুর উষ্ণতা বা শীতলতা, উগ্রবেগ বা মন্দ গতি, সুন্দররূপে অনুভব করিয়া থাকি। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, কি সুগভীর কূপ, কি অত্যুচ্চ পর্ব্বত, পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্ব্বাংশেই বায়ু বহন করিতেছে। ফলতঃ বায়ু পৃথিবীর সহিত নিত্যসংলগ্ন ইহার আবরণস্বরূপ। এই বায়বীয় আবরণ ভূপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং উহার সহিত উহার আহ্নিকগতি অনুসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এই আবহমান বায়ুরাশি হইতে মেঘ, বৃষ্টি, নীহার, শিশির, ঝটিকা প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং বায়ুর বিষয় সূক্ষ্মরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী পরিচ্ছেদে বায়ুর বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইবে।

বায়ুর পর জল পৃথিবীর অপর একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ইহাও পৃথিবীপৃষ্ঠকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে। গণনা ও পরিমাণদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে পৃথিবীকে চারি সমান ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যাইবে, যে উহার প্রায় তিন ভাগ জল, ও এক ভাগ মাত্র স্থল। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা পৃথিবীকে সাগরাম্বরা অর্থাৎ সাগরবসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সমুদ্রই জলের একমাত্র আকর। নদী খাল বিল পুষ্করিণী মেঘ শিশির প্রভৃতি সকল প্রকার জলই সমুদ্রজলের অংশমাত্র, নানাকারণে ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে নীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম ধারণ করে। জলের অদ্বিতীয় আকর বলিয়া সমুদ্রের নাম জলনিধি। সমুদ্র পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, কেবল এক ভাগ মাত্র স্থলের অধিকার। ভূপৃষ্ঠের পরিমাণফল প্রায় ১৯৭০০০০০০ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে প্রায় ১৪৫০০০০০০ বর্গ মাইল জল, ও ৫২০০০০০০ মাইল স্থল।

পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের অবস্থানবিষয়ে পরস্পর প্রভেদ এই যে স্থলভাগের অধিকাংশই পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তরাংশে অবস্থিত, ও জলভাগের অধিকাংশ উহার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। আবার স্থলভাগের আর একটী বিশেষ প্রকৃতি এই যে পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধেই উহার অধিকতর বিস্তার ও সম্পূর্ণতা। উত্তর হইতে যতই দক্ষিণদিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই স্থলভাগের ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা স্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে সমুদয় স্থলভাগই বিষুবরেখাপর্য্যন্ত ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে উহার কিঞ্চিৎ উত্তরে বা দক্ষিণে একবারে সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম হইয়া যায়। আমেরিকার ক্রমসঙ্কীর্ণতা ও পরিশেষে হরন্ নামক অন্তরীপে পরিণাম, আফ্রিকার আকার, ও আসিয়াখণ্ডের অন্তর্গত ভারতবর্ষ প্রভৃতির অবস্থার প্রতি মনোযোগ করিলে উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় উপদ্বীপ ও অন্তরীপ দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্থলের আকার ও অবস্থানবিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইল, জলের বিষয়ে প্রায় তাহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ মহাদেশসমূহের অধিকাংশ উত্তরে অবস্থিত, সেইরূপ মহাসাগরসমূহ প্রায়ই পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধের উপরি বিস্তৃত। কি কারণে স্থল ও

জলের এরূপ পরস্পর প্রভেদ হইল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে স্থল ও জলের ভাগ সমান, তবে পৃথিবীর দক্ষিণাংশে যে অধিক পরিমাণে স্থল দেখা যায় না, ইহার কারণ উক্ত স্থলভাগ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহঁাদের মতে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে কোন স্থানে ইউরোপ আসিয়া প্রভৃতির ন্যায় একটী সুবৃহৎ মহাদেশ অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে উইল্‌কস্ নামক জনৈক আমেরিকার অধিবাসী জাহাজে ভ্রমণ করিবার সময় অষ্ট্রেলিয়ার বহুদূর দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু উহা তৎকালে বরফে আবৃত ছিল বলিয়া তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, সুতরাং উক্ত দ্বীপের বিশেষ বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই।

পৃথিবীর মানচিত্র অথবা ভূগোলক লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুই দিকে দুইটী বিশাল ভূমিখণ্ড বা মহাদ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে, আর উভয়ের মধ্যে সুদূরবিস্তৃত মহাসাগর ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছাদন করিতেছে। এই উভয়ের মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে অবস্থিত, তাহাকে প্রাচীন মহাদ্বীপ কহে, কারণ উহা বহুকাল অবধি আবিষ্কৃত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে। আর যেটী অপেক্ষাকৃত পশ্চিমে অবস্থিত, তাহার নাম নূতন মহাদ্বীপ, কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প দিন হইল অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগকে অবস্থান অনুসারে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মহাদ্বীপ ও কহিয়া থাকে। আসিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রাচীন মহাদ্বীপের অন্তর্গত, আর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা নূতন মহাদ্বীপের অন্তর্গত। প্রাচীন মহাদ্বীপে আসিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা ব্যতীত আরও কতক

গুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপ বিদ্যমান আছে। অষ্ট্রেলিয়া এই সকল দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই সকল দ্বীপের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীতি হয়, যে কোন না কোন কালে তৎসমুদয় একটী অখণ্ড মহাদ্বীপের অবয়বস্বরূপ ছিল, পরে ভূমিকম্পাদি কোনপ্রকার পার্থিব উৎপাতে উক্ত মহাদ্বীপ ভগ্ন ও বিনষ্ট হওয়াতে উহার ভগ্নাবশেষ গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন মহাদ্বীপের ন্যায় নূতন মহাদ্বীপেও ঐরূপ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হয়। এই গুলিও বোধ হয় কোন অখণ্ড মহাদ্বীপের অবয়বস্বরূপ ছিল। আবার আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার আকারদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে উহারা পূর্ব্বকালে প্রত্যেকে এক এক স্বতন্ত্র দ্বীপ ছিল। কালক্রমে নিকটবর্ত্তী ভূভাগের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকা ও আসিয়ার অন্তর্বর্ত্তী সুয়েজ যোজক ও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পানামা যোজক এই উভয়ের প্রকৃতিদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে উহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপ আবার বেরিংপ্রণালীর তলভাগ পরীক্ষা করিলে ইহাও বোধ হয়, যে পূর্ব্বকালে আমেরিকার সহিত আসিয়া খণ্ডের যোগ ছিল, কালক্রমে সাগরতরঙ্গে স্থলভাগ বিলুপ্ত হওয়াতে উভয় মহাদেশ পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ নিয়ত পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির নিয়ম। আমরা অদ্য পৃথিবীর আকার জল-স্থল সংস্থান প্রভৃতি যেরূপ দেখিতেছি, বোধ হয় ভবিষ্যতে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য হইবে।

মহাসাগর পৃথিবীকে সর্ব্বাবয়বে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, কেবল যে যে স্থানে মহাদ্বীপাদি স্থলভাগ, তত্তৎস্থানে উহা সমুদ্রের উপর ভাসিতেছে এরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। বাস্তবিক

একমাত্র মহাসাগর সর্ব্বব্যাপী ও একাকার বটে, কিন্তু সুবিধার জন্য আমরা উহাকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ফলতঃ স্থলভাগের অবস্থান অনুসারে মহাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। আসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বসীমা ও আমেরিকার পশ্চিম সীমা এই উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী জলভাগের নাম প্যাসিফিক বা প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর। আমেরিকা ও ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী সাগরের নাম আটলাণ্টিক মহাসাগর, ইহাও প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এই উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদ্রের নাম ভারত মহাসাগর। আর ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতির উত্তর দিকে অবস্থিত উত্তরমেরুসন্নিহিত সাগরের নাম সুমেরু সাগর, এবং দক্ষিণ মেরুসন্নিহিত সাগরকে কুমেরু সাগর কহে। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর ও সাগরশাখা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে, চতুঃসীমা ও নিকটবর্ত্তী দেশ প্রভৃতির নাম অনুসারে ইহাদিগের ও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। আবার জলভাগ প্রায় সর্ব্বত্রই অবিচ্ছিন্ন ও একাকার, কিন্তু স্থলভাগ তাদৃশ নহে। ইহা নানাস্থানে বিস্তৃত ও সঙ্কীর্ণ সাগরশাখা উপসাগর প্রভৃতিদ্বারা বিচ্ছিন্ন। কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি এই প্রকার জলরাশির প্রধান উদাহরণ। আবার মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই প্রায় সমতল, কেবল বায়ুর বেগ ও চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সময়ে সময়ে স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু স্থলভাগ প্রায় সর্ব্বত্রই বন্ধুর। ইহার উপরিভাগে পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি নানাপ্রকার অত্যুচ্চ পদার্থ রহিয়াছে, আবার নদী খাল উপত্যকা প্রভৃতি নানাপ্রকার নিম্নভূমি দেখিতে পাওয়া

যায়। ফলতঃ সমতল স্থলভাগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। এই রূপ [উচ্চনীচ] বলিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। যথাস্থানে তৎসমুদয়ের ব্যাখ্যা করা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ প্রায় তিন গুণ অধিক। নিম্নে মহাসাগর মহাদেশ প্রভৃতির বিভাগ অনুসারে কোন্ স্থানের পরিমাণফল কত তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

স্থলভাগ।

		বর্গ মাইল	আপেক্ষিক আকার ;
ইউরোপ	দ্বীপ সহিত	৩,৮০০,০০০	১
আসিয়া	দ্বীপ সহিত	১৭০০০০০০	৪½
উত্তর আমেরিকা	দ্বীপ সহিত	৮৫০০০০০	২¼
দক্ষিণ আমেরিকা	দ্বীপ সহিত	৭০০০০০০	২
সামুদ্রিকা		৪৫০০০০০	১¼
অষ্ট্রেলিয়া		৩০০০০০০	৫/৬

সাগর ;

প্রশান্ত মহাসাগর	৫০০০০০০০
আটলাণ্টিক ,,	২৫০০০০০০
ভারত মহাসাগর	২ কোটি বর্গমাইল।
মেরু সাগরদ্বয়	অজ্ঞাত।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের আকারাদি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এক্ষণে উহার অভ্যন্তরভাগের বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ উহার উপরিভাগের ন্যায় নহে, উহা

অত্যন্ত উষ্ণ, এমন কি বোধ হয় উহার অধিক দূর নীচে অদ্যাপি তরল পদার্থ বিদ্যমান আছে। ঐ সকল তরল পদার্থ উত্তাপবশতঃ অধিকতর তরল হইয়া কখন কখন বেগে ভূপৃষ্ঠভেদ করিয়া বহির্গত হয়। যে স্থানে এই রূপ ব্যাপার ঘটে, তথায় প্রথমতঃ একটী গহ্বর উৎপন্ন হয়, পরে ক্রমশঃ উহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ গলিত পদার্থ জমা হইয়া পর্ব্বত জন্মিয়া থাকে। এইরূপ পর্ব্বতের নাম আগ্নেয় গিরি। বোধ হয় সকল পর্ব্বতই প্রথমতঃ এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পদার্থের শক্তিবশতঃ প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ফলতঃ পৃথিবীর উপরিভাগের ন্যায় অভ্যন্তরভাগের বিষয়ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে অবগত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহার পর ক্রমশঃ পৃথিবীর বায়ু জল স্থল প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গের বিষয় পৃথক করিয়া সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বায়ু।

[বায়ুর উন্নতি গুরুত্ব, ও উপকরণ।]

সাগরের জলরাশি ভূপৃষ্ঠের আবরণ বটে, কিন্তু উহা আংশিক, সর্ব্বব্যাপী নহে। আমরা এই অধ্যায়ে যে পদার্থের বিষয় উল্লেখ

করিতেছি, উহা ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বব্যাপী আবরণস্বরূপ। কি অত্যু ভূধর, কি সুগভীর গিরিগুহা, কি গভীরতর সারগর্ভ, সর্ব্বত্র বায়ুরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ বায়ুসমুদ্র সমগ্র পৃথিবীকে সর্ব্বাবয়বে আবরণ করিয়া রহিয়াছে এবং উহার সহিত চিরস বেত হইয়া মণ্ডলাকার পথে নিরন্তর উহার ন্যায় পরিভ্রম করিতেছে। এই প্রকাণ্ড বায়ুরাশিকে বায়ুগোলক বা অ্যাট স্ফিয়র কহে।

বায়ু কিরূপ পদার্থ আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই না বটে কিন্তু স্পর্শদ্বারা উহার প্রকৃতি সুচারুরূপে অনুভব করিয়া থাকি মন্দানিল হইতে ভীষণ ঝটিকা পর্য্যন্ত সমুদয়ই বায়ুর রূপান্ত মাত্র। আমরা সকলেই বায়ুর এই সকল রূপান্তর সময়ে সময়ে অ ভব করিয়া থাকি। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে নির্ম্মল বায়ুসেবন করিলে আমাদের শরীর ও মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে, আবার শরৎকালে মধ্যে মধ্যে যেরূপ প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা মনে করিলেও হৃৎকম্প হয়। আমাদের দেশে ৫।৭ বৎসর অন্তর প্রায় ভয়ানক ঝড় হইয়া থাকে, উক্ত ঝড়ে মনুষ্যের যেরূপ সর্ব্বনা উপস্থিত হয়, তাহার বিষয় বিবেচনা করিলে তৎকালীন বায়ুকে যমদূত বলিয়া ভয় করিতে হয়। বিগত সন ১২৭১ সালে আশ্বিন মাসে ও তাহার কয়েক বৎসর পরে কার্ত্তিক মাসে আমাদের দেশে যে প্রবল ঝটিকা ও বন্যা হইয়াছিল, তাহা বোধ হ অদ্যাপি অনেকের মনে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উক্ত দুই বৎসর কলিকাতা ও তাহার সান্নিধ্যে যে কত লোকের প্রাণ হানি হই য়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন বঙ্গসাগরে প্রবল বাত্যা হওয়াতে উহার তরঙ্গসমূহ ভীষণ বেগে অগ্রসর হইয়া অনেক গ্রাম ও নগরকে একবারে জলসাৎ করিয়া ফেলে, ও বহু

সংখ্যক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। বঙ্গদেশে এইরূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই হইয়া থাকে। অতএব বায়ু যে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু আমাদের প্রাণধারণের পক্ষে যেরূপ অত্যাবশ্যক, প্রাণসংহারের পক্ষেও তদ্রূপ অনুকূল ইহা ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। শীতল বা উষ্ণ স্পর্শ অথবা ঝটিকা প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যদ্বারাই যে আমরা বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি এরূপ নহে, উহার গুরুত্ব ও ভার ও আমরা স্পষ্টই অনুভব করি।

[বায়ুগোলকের উন্নতি]

এই বায়বীয় আবরণ পৃথিবীর পৃষ্ঠে নিয়তসংলগ্ন থাকিয়া উহার আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অনুসারে মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী অন্যান্য যাবতীয় পদার্থকে যেরূপ নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, বায়ুরাশিকেও ঠিক সেইরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এই জন্যই বায়ুরাশি স্থানভ্রষ্ট হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া বা পার্শ্বে উড়িয়া যাইতে পারে না, নিয়তই ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে। বায়ুগোলক পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে কতদূর উর্দ্ধে বায়ুর সঞ্চার আছে, তাহা পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ছাড়িয়া কতদূর উর্দ্ধে বায়ুর সঞ্চার শেষ হইয়াছে, তাহা যদিও সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ নির্ণীত হইয়াছে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ন্যূনাধিক ১০০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুর সঞ্চার আছে, ইহা অপেক্ষা আরও উর্দ্ধে বায়ুর সঞ্চার থাকা অসম্ভব নহে বটে, কিন্তু কতদূর উর্দ্ধে আকাশমার্গ একবারে বায়ুশূন্য তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। ফলতঃ সমুদয় আকাশই অতি তরল বায়ু অথবা বায়ুর ন্যায় অন্য কোন

পদার্থদ্বারা যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় এই দ্রব্যকে ইংরাজী ভাষায় ঈথর শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্রের আলোক এই পদার্থের মধ্য দিয় পৃথিবী পর্য্যন্ত আগমন করিয়া থাকে। এই পদার্থ বিদ্যমা না থাকিলে আমরা বোধ হয় আলোকের মুখ দেখিতে পা তাম না।

যে বায়ুগোলক পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে তাহা ভূপৃ হইতে ৪০।৫০ মাইল ঊর্দ্ধ পর্যান্ত বিস্তৃত। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে চতুর্দ্দিকে এই ৫০ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বা রাশি পৃথিবীর সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহার ঊর্দ্ধে অ পার্থিব বায়ুর সঞ্চার নাই। পৃথিবী হইতে প্রায় ৭০।৮০ অথ ১০০ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে বায়ুর কিছু না কিছু সঞ্চার আছে অন্ধকার নির্ম্মল রাত্রিতে মেঘশূন্য আকাশের প্রতি দৃষ্টিপা করিলেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐরূপ রাত্রিকে কখন কখন আমরা আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রপাত দেখিতে পাই। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহসমূহ যেরূপ নিয়মে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ঠিক সেইরূপ নিয়মে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র পদার্থ ও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহারা ভা এক সের অপেক্ষা অধিক হইবে না। এই ক্ষুদ্র পদার্থ গুলি কখন কখন পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। ইহাকেই আমরা উল্কাপাত বা নক্ষত্রপাত বলিয়া থাকি। এই সকল ক্ষুদ্র নক্ষত্র আকাশমার্গে অতি বেগে পতিত হইবার সময় ইহাদের অঙ্গ ও বায়ু এই উভয়ের পরস্পর অভি ঘাত ও প্রতিঘাতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং পদার্থ গুলি অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া পতিত হয়। গগনাঙ্গনা

নির্ণীত হইয়াছে যে আকাশের যে স্থান হইতে ঐ পদার্থ পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ মনুষ্যের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭০।৮০ অথবা ১০০ মাইলের ন্যূন হইবে না। সুতরাং স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ১০০মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্তই বায়ুসঞ্চারের শেষ সীমা।

বায়ুর গুরুত্ব ও ভার। ভূপৃষ্ঠ হইতে চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুর সঞ্চার আছে বটে, কিন্তু এই সমগ্র অবকাশের মধ্যে উহার অবস্থা সর্ব্বত্রই একরূপ নহে। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ও উহার অব্যাহিত নিকটে বায়ু যেরূপ ঘন, সর্ব্বত্র সেরূপ ঘন নহে। যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ু ততই অধিকতর তরল ও বিরল অর্থাৎ পাতলা হইতে থাকে। বায়ু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপকগুণযুক্ত পদার্থ। ভূপৃষ্ঠ হইতে যে স্থান যত উচ্চ, সে স্থানের বায়ু ততই পাতলা; ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিলে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। অত্যন্ত ঘন ও গুরু বায়ু সেবন করাই মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রকৃতি, এই নিম্নস্থ বায়ুই আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের পক্ষে একমাত্র উপযোগী। এই জন্য অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এই জন্যই উচ্চ পর্ব্বতে উঠিবার সময় পরিব্রাজকগণ কখন কখন অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন। কথিত আছে অত্যন্ত উচ্চে উঠাতে অনেক পরিব্রাজকের মুখ নাসিকা চক্ষু প্রভৃতি অবয়ব ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল, ও নিশ্বাস প্রশ্বাস অভাবে কেহ কেহ মূর্চ্ছিত ও মৃতপ্রায় পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ছয় মাইল অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, এবং আরও উপরে কোন জীবজন্তুই গমন করিতে পারে না। ভূপৃষ্ঠে বা সাগরসমতলে বায়ুর যেরূপ ভার,

হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উঠিলে তাহার অর্দ্ধেক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সম্পূর্ণ উপরে উঠি বায়ুর আরও অধিকতর লঘুতা অনুভূত হইতে পারে।

বায়ুর গুরুত্ব ও ভার।—বায়ু অতিশয় তরল ও লঘু পদা বিশুদ্ধ মন্দ বায়ু সেবন করিলে আমরা সুখী হই। অতঃ আপাততঃ এরূপ বোধ হইতে পারে যে বায়ুর কিছুমাত্র ভ নাই। কিন্তু তাহা নহে। যে প্রকাণ্ড বায়ুরাশি পৃথিবীকে দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, পৃথিবী অন্যান্য পদার্থের ন উহাকেও আকর্ষণ করিতেছে, এবং এই আকর্ষণবশতঃ উহা শূ মার্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া ভূপৃষ্ঠের সহিত সংলগ্ন র যাচ্ছে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বায়ু যতই লঘু হ না কেন, উহার কিছু না কিছু গুরুত্ব অবশ্যই আছে। আ যদি বায়ুর কিছুমাত্র ভার না থাকিত, তাহা হইলে সাগরপৃ হউক আর পর্ব্বতশৃঙ্গেই হউক, উহার অবস্থা সর্ব্বত্রই সঃ হইত। উহা ভূপৃষ্ঠে অধিকতর ঘন ও উর্দ্ধে ক্রমশঃ পাতল শিথিলসংযোগ হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ভূ হইতে যতই উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই বায়ুর ঘনতা কমিতে থাক আরও দেখা যাইতেছে যে বায়ু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক পদ সুতরাং ইহার উপর কোন ভার চাপাইলে উহার আয়তন হইয়া যায়, এবং ঘনতা বাড়িয়া উঠে। অতএব স্পষ্টই সপ্রঃ হইল যে ভূপৃষ্ঠে বায়ুর প্রতি পৃথিবীর অতিশয় আকর্ষণ ও উ উপরিস্থ বায়ুর ভার, এই দুই কারণে ভূপৃষ্ঠস্থিত বা ঘনতা ও উহার গুরুত্ব ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ক্রমে যত উর্দ্ধে উঠা যায় ততই পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশঃ হইয়া যায় বলিয়া পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানে বায়ুর ভার অপেক্ষা

লঘু হইয়া পড়ে। বায়ু বিমিশ্র পদার্থ, সুতরাং পৃথিবীর আকর্ষণ ও উপরিস্থ বায়ুরাশির ভার যেরূপ নিম্নস্থ বায়ুর অধিকতর ভারের প্রতি কারণ, সেইরূপ উহার সহিত মিশ্রিত নানাবিধ পদার্থের ভারদ্বারা ও উহার ভারবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বায়ুর ভার নিতান্ত অল্প নহে। পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে সমুদ্রসমতলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান যে বায়ুদ্বারা আচ্ছাদিত, তাহার গুরুত্ব প্রায় ১৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭॥॰ সের, আর সমুদ্রসমতল হইতে যে স্থান যত উচ্চ তত্রত্য বায়ুর গুরুত্ব ও তদনুসারে ক্রমশঃ অল্প হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দেশ ও কালভেদেও বায়ুর ভারের তারতম্য হইতে দেখা যায়। পৃথিবীর কোন্ স্থানে বায়ুর ভার কিয়ৎপরিমাণ, তাহা কার্য্যতঃ নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। পারদ এক প্রকার তরল ধাতু। পারদের সাহায্যে এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উহাদ্বারা কোন্ স্থানে বায়ুর কত ভার তাহা অতি সুন্দররূপে নির্ণয় করিতে পারা যায়। পারদকে গলাইয়া একটী ৩৩ ইঞ্চি লম্বা কাচের নল বা চোঙার ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হয়। কাচের নলটীর একটী মুখ খোলা ও একটী মুখ বন্ধ। খোলা মুখ দিয়া পারদ ঢালিয়া দিয়া পারদপূর্ণ একটী ছোট বাটীতে ঐ নলটী উপুড় করিয়া বসান হয়। এইরূপ করিলে দেখা যায় যে নল হইতে কিয়দংশ পারদ বাটীতে পড়িয়া যায় কিন্তু সমুদয় পড়ে না। যদি সাগরতলের উপর নৌকারোহণে বা সাগরতীরে বসিয়া এইরূপ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে নলের পারদ কিয়দংশ পড়িয়াও ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চে রহিল, পারদস্তম্ভ আর নিম্নে নামিল না। যে কারণে এইরূপ হইয়া থাকে তাহা এই:—উপরিস্থ বায়ুরাশির ভার, বাটীতে যে পারা রহিয়াছে তাহার উপর অবশ্যই পড়ি-

তেছে, একণে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত বায়ুর ভার এরূপে বাটী পারার উপর পড়িতেছে, যে নলের পারা আর নামিতে পারে না অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বায়ুরাশির ভার যদি কথ ইহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে বাটীর পারার ঊর্দ্ধগ বে অবশ্য কিয়ৎপরিমাণে বাড়িয়া উঠে, সুতরাং নলের পারা উঠিয়া পড়ে। আবার যদি বায়ুরাশির ভার কোন কারণে কমি যায়, তাহা হইলে নলের পারা ৩০ ইঞ্চি অপেক্ষা নামিয়া পড়ে এইরূপ নির্ম্মিত যন্ত্রের নাম ভারমান বা ব্যারোমিটর। ব্যারোমি টর সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থানে উঠিলে দেখা যায় যে নলের পারা ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতেছে, আবার নামিয়া আসিলে দেখা যায় যে ঐ পারা পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। পারদে এইরূপ উন্নতি বা অবনতি যেরূপ নিয়মে হইয়া থাকে তাঃ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে থাকিে পারদস্তম্ভ প্রতি ৮০০ ফুটে এক ইঞ্চি করিয়া নামিয়া পড়ে।

ব্যারোমিটর যন্ত্রদ্বারা আমাদের একটী মহোপকার সাধি হইয়া থাকে। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে বায়ুরাশির ভার কমিে পারদস্তম্ভ নামিয়া পড়ে, আর বাড়িয়া উঠিলে পারদস্তম্ভ উে উঠিতে থাকে। সুতরাং দৈবাৎ কোন সময়ে হঠাৎ পারদস্তম্ভে পড়িতে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে আমাদের উপরি বায়ুর ভার হঠাৎ কমিয়া গিয়াছে। বায়ু অতিশয় তরল পদা ইহা আমরা জানি, সুতরাং বায়ুর ভার কমিয়াছে বুঝিতে পারিে আমরা তাহার কারণ অনুমান করিতে পারি। সেই কার এই:—কোন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বায়ুর গুরুত্বের প্রতি উহার উ স্থিত বায়ুরাশির ভার প্রধান কারণ, সুতরাং কোন স্থানে বায়ু ভার হঠাৎ কমিয়া যাইলে এই অনুমান হয় যে, ঐ স্থানের উপরি

বায়ু স্থানচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে নিম্নস্থ বায়ুর ভার হঠাৎ কমিয়া গিয়াছে। আর উপরিস্থ বায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে উহার অধিকৃত স্থান অবশ্যই শূন্য হইয়াছে, সুতরাং স্থানান্তরের বায়ু অবশ্যই অতিবেগে আসিয়া উক্ত শূন্য অধিকার করিবে। এই অনুমানদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে স্থানে হঠাৎ এইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, তথায় শীঘ্রই অতিবেগে প্রবল বাত্যা ও ঝড় প্রবাহিত হইবে। এইরূপ বুঝিতে পারিলে আমরা পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইতে পারি ও আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ ব্যারোমিটর যন্ত্র আমাদের পক্ষে কত দূর প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সাগরসমতলে বায়ুর ভার ১ বর্গ ইঞ্চি স্থানের প্রতি প্রায় ১৫ পাউণ্ড। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে এটী ভারের গড় হিসাব। ফলতঃ ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্রই যে এইরূপ ভারের সমতা আছে তাহা নহে। স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অংশে বায়ুর ভার নির্দ্দিষ্ট গড় অপেক্ষা অধিক, সুতরাং তথায় পারদস্তম্ভ প্রায় ৩০.৩০ ইঞ্চি উঠিয়া থাকে। আবার উত্তর মহাসাগরে উহার ভার গড় অপেক্ষা কমিয়া যায়, সুতরাং পারদস্তম্ভ ২৯.৬০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। কি কারণে বায়ুভারের এরূপ তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি সম্যক্ নির্ণীত হয় নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে বায়ুর উত্তাপ ও উহার সহিত মিশ্রিত জলীয় বাষ্প এইরূপ তারতম্য হইবার দুইটী প্রধান কারণ। প্রথমতঃ বায়ু যখন উত্তপ্ত হয় ঐ উত্তাপের প্রভাবে উহা স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর তরল হইয়া উঠে, অধিকতর তরল হইলেই উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সুতরাং

স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বায়ু উত্তপ্ত হইলে উহার নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বস্থান বায়ুশূন্য হওয়াতে উহার ভার কমিয়া যায় ও বেরোমিটর যন্ত্রের পারদস্তম্ভ নামিয়া পড়ে। এইরূপ আবার বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা অধিকতর শীতল হইলে উহা স্বস্থান হইতে নিম্নে নামিয়া পড়ে এবং পারদ স্তম্ভও নামিয়া যায়।

আবার জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া যখন উহার সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়, তখনই উহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর করিয়া ফেলে, সুতরাং পারদস্তম্ভ পূর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে নামিতে থাকে, আবার জল শিশির প্রভৃতি রূপে উক্ত জলী বাষ্প ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে বায়ু পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়া স্বাভাবিক ভার পুনঃপ্রাপ্ত হয় ও পারদস্তম্ভ পুনর্ব্বার উঠিয়া পড়ে। এই জন্য আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ুর ভা কমিয়া যায় ও ঝড় হইয়া থাকে। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল যে উত্তাপ ও জলীয় বাষ্প এই উভয় কারণে বায়ুর ভার কমিয়া যা এবং এই জন্যই বায়ুর ইতস্ততঃ গতি হইয়া থাকে।

বায়ুর ভার ও কার্য্যাদিদ্বারা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে বায়ুরাশি একটী প্রকাণ্ড গোলকস্বরূপ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু বায়ু পদার্থটী কি? উহা কি উপকরণে নির্ম্মিত? উহাদ্বারা কিরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে? এই সকল বিষয় সূক্ষ্মরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে যখন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি হয় নাই, সকলেই বায়ুকে একটী স্বতন্ত্র ভূত অর্থাৎ অমিশ্র মূল পদার্থ বলিয়া গণনা করিতেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই কয়েকটাকে এক একটী

বায়ুর উপকরণ।

মূল পদার্থ ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঁচটী মূল পদার্থ স্বীকার করিতেন। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা হওয়াতে এই ভ্রম নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চভূতের পরিবর্ত্তে ৬০।৬৫ টী ভূত অর্থাৎ মূলপদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বায়ু মূল-পদার্থ নহে, উহা কয়েকটী মূল ও বিমিশ্র পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন বিমিশ্র পদার্থ। বিশুদ্ধ বায়ু নাইট্রোজেন অর্থাৎ যবক্ষারজন ও অক্সিজেন অর্থাৎ অম্লজন এই উভয় মূলপদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন। বায়ু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১০০ অংশ বায়ুতে ৭৯ অংশ নাইট্রোজেন ও ২১ অংশ অক্সিজেন আছে। একটী নির্দ্দিষ্ট আকারের রিসীবর বা কাচস্থালী বায়ুপূর্ণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে উহা ১০০ সমান ভাগের ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ মাত্র অক্সিজেন দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু ঐ বায়ু ওজন করিলে ঠিক উক্তরূপ ফল না হইয়া সমগ্র ওজনের ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২৩ ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়, কারণ বায়ু ও বায়ুর উপকরণদ্বয় তরল পদার্থ বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনের বায়ু অধিক স্থান অবরোধ করিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ু উল্লিখিত দুই উপকরণে উৎপন্ন বটে, কিন্তু সচরাচর বায়ুর সহিত অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে দেখা যায়। সচরাচর ১০০ অংশ পরিমিত বায়ুতে যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদয়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

নাইট্রোজেন	৭৯·১২
অক্সিজেন	২০·৮০
কার্ব্বণিক এসিড বা অঙ্গারাম্ল	·০৪
কারবনমিশ্রিত উদজন	·০৪
এমোনিয়া	কিঞ্চিৎ

যে কয়েকটী পদার্থের নাম উল্লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার কঠিন পদার্থ ধূলির আকারে বায়ুর সহিত অল্প বা অধিক পরিমাণে সর্ব্বদাই মিশ্রিত থাকে। আর জলীয় বাষ্পও প্রায় সর্ব্বদাই বায়ুমিশ্র দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমাদের গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ থাকে তখন আমরা ঐ দ্বারের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূর্য্যকিরণের সূক্ষ্মরেখা দেখিতে পাই। ঐ রেখাতে ঈষৎ লোহিতবর্ণ ধূলির আকার অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা উক্ত পদার্থসমূহকে সূর্য্যকিরণের পরমাণু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উহার নাম ত্রসরেণু। বাস্তবিক ত্রসরেণু সকল সূর্য্যকিরণের পরমাণু নহে। উহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত নানাবিধ সূক্ষ্ম পদার্থমাত্র সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অন্য সময় আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই না। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল যে যদি কোন প্রকারে উক্ত পদার্থসমূহ পরীক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বায়ুর সহিত উল্লিখিত পদার্থ ব্যতীত নানাবিধ ক্ষুদ্র জীবদেহ অর্থাৎ কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন যে বায়ুর সহিত বসন্ত ওলাউঠা প্রভৃতি নানাবিধ রোগের বীজ সর্ব্বদাই সঞ্চারিত হয়। বায়ুমিশ্রিত পদার্থগুলি আমরা কোন প্রকারে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে পারি না, কিন্তু বৃষ্টি হইলে আমাদের অভিপ্রায় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। বৃষ্টির জলের সহিত স্বভাবতঃ কোন পদার্থই মিশ্রিত নাই। কিন্তু বৃষ্টির জল কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে ক্ষণকাল পরেই ঐ পাত্রের তলে অনেকানেক ক্ষুদ্র পদার্থ জমিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে বৃষ্টি হইবার সময় চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশি ধৌত হইয়া যায়, ও উহার সহিত

অনেক ক্ষুদ্র পদার্থ ভূপতিত হয়। এই সকল পদার্থের মধ্যে লবণ সোডা অজোন প্রভৃতি পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অজোন-দ্বারা বায়ু পরিষ্কৃত হয় ও দুর্গন্ধ পদার্থসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

যে সমস্ত পদার্থের নাম উল্লিখিত হইল তৎসমুদয়ই প্রকৃত-প্রস্তাবে বায়ুর উপকরণ নহে, উহারা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, ফলতঃ বায়ুর প্রকৃত উপকরণ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ন্যায় অপরাপর পদার্থ উহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ নহে। সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ের জল সূর্য্যের কিরণে আকৃষ্ট ও বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, এই জন্য বায়ুতে জলীয় বাষ্প দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়ু, জল প্রভৃতি সমুদয় তরল পদার্থ অপেক্ষা অনেক অধিক তরল, এই জন্য উহা ভূপৃষ্ঠে না থাকিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়। সকল বাষ্পীয় পদার্থের প্রকৃতিই এইরূপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বায়ুর তাপমান, (Temperature), আর্দ্রতা ও গতি।

বায়ুর গুরুত্বনির্ণয়স্থলে কথিত হইয়াছে যে উত্তাপের তারতম্য অনুসারে বায়ুর ভারের লাঘব বা গৌরব হইয়া থাকে। কিন্তু এই উত্তাপের কারণ কি? কোথা হইতে এই উত্তাপের উৎপত্তি হয়? সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবী অগ্নিময় তরল পদার্থ ছিল, কালক্রমে উহার উপরিভাগ শীতল ও কঠিন হইয়াছে, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অদ্যাপি অগ্নিময় ও তরল রহিয়াছে। সুতরাং

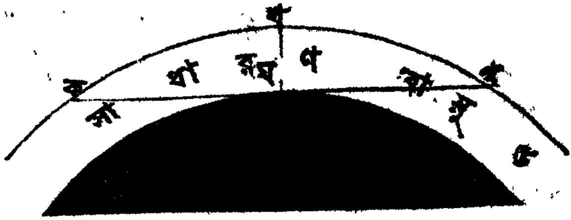
এরূপ মনে হইতে পারে যে, পৃথিবীর আন্তরিক উত্তাপেই উহার পৃষ্ঠদেশ ও উপরিস্থ বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর আন্তরিক উত্তাপ ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতিদ্বারা অনুমিত হয়, নতুবা ভূপৃষ্ঠে উহা অন্য কোন প্রকারে বাহির হয় না। তবে ভূপৃষ্ঠ ও উহার উপরিস্থ বায়ুরাশির উত্তাপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? সূর্য্যই আলোক ও উত্তাপের একমাত্র কারণ। সূর্য্যের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়াতেই পৃথিবীর জল ও বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠে। যদি সূর্য্যের উত্তাপ লোপ পাইয়া যায়, তাহা হইলে অচিরাৎ পৃথিবী এতদূর শীতল হইয়া উঠে, যে সমুদয় জীবজন্তু তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপ পতিত হওয়াতে পৃথিবী ও বায়ু উষ্ণ হইয়া উঠে, আবার রাত্রিকালে সূর্য্যের অভাবে দিবসের গৃহীত উত্তাপ নষ্ট হইতে থাকে, ও সমুদয় পদার্থ শীতলভাব ধারণ করে। ফলতঃ সমুদয় পৃথিবীর তাপমান সর্ব্বদাই গড়ে সমপরিমাণ থাকে, দিবসে উত্তাপ যেরূপ গৃহীত হয়, রাত্রিতে সেইরূপ পরিত্যক্ত হয়।

সূর্য্যের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার সময় মধ্যবর্ত্তী বায়ুরাশি অতিক্রম করিয়া আইসে, এবং এই জন্যই বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। উত্তাপের ন্যায় আলোক ও বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আগমন করে। ফলতঃ ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুগোলক সূর্য্যকিরণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালক। যখন সূর্য্য পৃথিবীর উপর ঠিক লম্বভাবে অবস্থিত হয়, সেই সময় ৮০০০ বা ১০০০০ কিরণরেখা ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, অবশিষ্ট অংশ পরিভোবর্ত্তী বায়ুরাশিদ্বারা গ্রস্ত হইয়া থাকে। এইরূপে যখন প্রাতঃকাল বা সায়ংকালে সূর্য্য ভূচক্রবালের সহিত সমান্তরভাবে অবস্থিত হয়, তখন ১০০০০ কিরণরেখার মধ্যে কেবল ৫ টী মাত্র দর্শকের নয়নপথে পতিত

য়, অবশিষ্ট অংশ বায়ুদ্বারা গ্রস্ত হইয়া যায়। এই জন্য আমরা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময়ে সূর্য্যমূর্ত্তির প্রতি অনায়াসে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হই। বায়ুরাশির সহিত মিশ্রিত জলীয় বাষ্প ও সাগরের জল অধিকাংশ রঞ্জিত কিরণরেখা গ্রাস করিয়া ফেলে, কেবল নীলবর্ণ রেখাগুলিকে গ্রাস করিতে পারে না, এই জন্য আকাশমণ্ডল নীলবর্ণ বোধ হয়। আবার সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি ও উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ প্রভৃতি স্থানে সমুদয় কিরণ বায়ুদ্বারা গ্রস্ত হয় বলিয়া তত্তৎস্থানে আকাশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। কিন্তু আলোক যে কেবল বায়ুরাশিদ্বারা গ্রস্ত হয় এরূপ নহে, উহা সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই উপত্যকা প্রভৃতি যে সকল স্থানে সূর্য্যকিরণ পতিত হয় না, সেথায় ও একরূপ আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ না হইলে ছায়ামাত্রই রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইত। সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশিদ্বারা প্রতিফলিত হয় বলিয়া সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পরেও আমরা এক প্রকার মৃদু আলোক দেখিতে পাই। বায়ুর এই গুণ না থাকিলে আমরা কখনই এরূপ সুবিধা ভোগ করিতে পারিতাম না, কারণ উল্লিখিত উভয় সময়েই সূর্য্য ভূচক্রবালের নীচে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং বায়ু না থাকিলে দিবসের আলোকের পর একবারে রাত্রির অন্ধকার ও রাত্রির অন্ধকারের পর একবারে দিবসের আলোক উদ্ভূত হইত। উল্লিখিত মৃদু আলোকের নাম অর্দ্ধালোক। প্রত্যূষের অর্দ্ধালোককে ঊষা, ও সায়ংকালের অর্দ্ধালোককে গোধূলি কহে। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূর্য্য লম্বভাবে অস্ত যায়, এই জন্য এই সকল স্থানে অর্দ্ধালোক নাই বলিলেও চলে। আর উক্ত বৃত্তদ্বয়ের বাহিরে

সূর্য্য বক্রভাবে অস্তমিত হয় বলিয়া তত্তৎপ্রদেশে যথেষ্ট সময় অর্দ্ধালোক দৃষ্ট হয়। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে বায়ুর উল্লিখিত শক্তিবশতই আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রধনু ও মরীচিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপরে কথিত হইয়াছে যে সূর্য্যের উত্তাপ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আগমন করে বলিয়া বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা বায়ুরাশির উত্তাপের প্রতি প্রধান কারণ নহে। পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে আমরা বায়ুর যেরূপ উত্তাপ অনুভব করি, উহার সমুদয়ই বায়ুর মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ পতিত হয় বলিয়া উৎপন্ন হয় না, সূর্য্যকিরণদ্বারা বায়ু যৎকিঞ্চিৎ উষ্ণ হয় এইমাত্র, সিমলা প্রভৃতি উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তথায় প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণেও বায়ুরাশি নিম্ন ভূভাগস্থ বায়ুর ন্যায় উত্তপ্ত হয় না। ইহাদ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্যকিরণদ্বারা প্রথমতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট ভূভাগ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, পরে ঐ উত্তপ্ত ভূভাগের সহিত সংস্পর্শে উহার উপরিস্থ বায়ুরাশি ক্রমশঃ অতিশয় উষ্ণ হইতে থাকে, ফলতঃ নিম্নস্থ ভূভাগের উত্তাপ বায়ুরাশিতে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলে। বালুকাময় মরুভূমিতে কিছুমাত্র জল নাই, সুতরাং উহার উপরিস্থ বায়ুরাশিতে জলীয় বাষ্পও প্রায় থাকে না, এই জন্য ঐরূপ মরুভূমিতে যে বায়ু বহন করে উহা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, আর সরস ভূভাগের উপরিস্থ বায়ু তাদৃশ উত্তপ্ত হয় না।



ভূপৃষ্ঠ ও তদুপরিস্থ বায়ুগোলক।

পৃথিবীর যে অংশে সূর্য্যকিরণ ঠিক লম্বভাবে পতিত হয় তথায় সূর্য্যকিরণের উত্তাপকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই হেতু পৃথিবীর সেই অংশেই বায়ুর তাপমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। তাহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে সূর্য্যের কিরণরেখা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া যদি উহার সহিত সমকোণ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সূর্য্যের উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, আর যদি কিরণরেখা ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তর হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। এইরূপ আবার সমকোণের লম্ব ও ভূমি এই উভয়ের মধ্যে কিরণরেখা যখন যেরূপ কোণ উৎপন্ন করে, তখন সেইরূপ ক্রমশঃ উত্তাপের হ্রাস হইতে থাকে, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে কিরণরেখার সম্পাতে যে কোণ উৎপন্ন হয়, উহা সমকোণ অপেক্ষা যতই কমিতে থাকে উত্তাপও ততই হ্রস্ব হইয়া যায়। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়, সুতরাং ঐ সময় উত্তাপের প্রখরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে এবং বায়ুর তাপমান উচ্চতম হয়, প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় সূর্য্যকিরণ ভূচক্রবালের সহিত সমান্তর থাকে, সুতরাং এই দুই সময় বায়ুর তাপমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, এবং প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্ন

আর মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই উভয়ের অন্তর্গত সময়ে কিরণ-রেখার বক্রতা অনুসারে তাপমানের তারতম্য হইয়া থাকে।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর যে অংশে সূর্য্যকিরণ ঠিক লম্বভাবে পতিত হয়, তথায় তাপমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, এবং সূর্য্যকিরণের লম্বভাব যতই কমিতে থাকে ততই তাপমান ও কমিয়া আইসে। আর পৃথিবীর যে অংশে সূর্য্যকিরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বক্রভাবে পতিত হয়, সেই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া থাকে।* গোলকে বিষুবরেখার ২৩ অংশ উত্তরে অঙ্কিত বৃত্তের নাম কর্কটক্রান্তি, ও ২৩ অংশ দক্ষিণে অঙ্কিত বৃত্তের নাম মকরক্রান্তি। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি এই উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে সূর্য্যকিরণ বৎসরের মধ্যে দুইবার ঠিক লম্বভাবে পতিত হয়, সুতরাং এই ভূভাগের তাপমান পৃথিবীর অন্যান্য সকল অংশ অপেক্ষা অধিক। বিষুব-রেখার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ, এবং বিষুবরেখা হইতে ক্রমশঃ উত্তরে বা দক্ষিণে যাইয়া ক্রান্তিদ্বয় পর্য্যন্ত সূর্য্যকিরণ ঠিক লম্বভাবে বা প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়, কাজে কাজেই এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তপ্ত। ক্রান্তিদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক যত মেরুদ্বয়ের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায় ততই ক্রমশঃ সূর্য্যকিরণের লম্ব-ভাগের ব্যাঘাত হইতে থাকে। সুতরাং বায়ুর তাপমান ও ক্রমশঃ কমিয়া যায়। অবশেষে মেরু সন্নিধানে উপস্থিত হইলে দেখা যায় যে সূর্য্যকিরণ প্রায় লম্বভাবে পতিত হয় না। সুতরাং সুমেরু বা কুমেরুর উপর এবং মেরুদ্বয়ের সন্নিহিত প্রদেশ সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মিপাতের অল্প বা অধিক বক্রতা অনুসারে ক্রান্তি ও মেরু এই উভয়ের মধ্য-বর্ত্তী ভূভাগ আবার দুই অংশে বিভক্ত। সমশীতোষ্ণমণ্ডল ও

হিমমণ্ডল। মেরু হইতে ২৩ অংশ পর্য্যন্ত শীতমণ্ডল, এবং তাহার পর ক্রান্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমশীতোষ্ণমণ্ডল। অতএব ভূপৃষ্ঠে উত্তর ও দক্ষিণ দুইটী সমশীতোষ্ণমণ্ডল ও উত্তর ও দক্ষিণ দুইটী হিমমণ্ডল আছে। উপরে যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বিষুবরেখা হইতে দূরতা অনুসারে তাপমানের তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে স্থান বিষুবরেখা হইতে যতদূরে অবস্থিত হয়, তথায় উত্তাপ ও ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে এবং শীতের অধিকতর প্রাদুর্ভাব হয়।

বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব অনুসারে তাপমানের তারতম্য হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে কোন স্থানের তাপমান নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। যদি এই নিয়মের ব্যতীপাত না হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান বিষুবরেখা হইতে সমান দূরে অবস্থিত, তৎসমুদয়ের তাপমান অবিকল একরূপ হইতে পারিত, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। আমরা দেখিতে পাই এক অক্ষরেখায় অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাপমানের প্রভেদ হইয়া থাকে। অতএব উল্লিখিত নিয়মের ব্যভিচার হইল। এরূপ হইবার কারণ কি বুঝিয়া লওয়া বিশেষ দুরূহ নহে। স্থলভাগ ও জল উভয় স্থানেই সূর্য্যকিরণ সমভাবে পতিত হইতেছে বটে, কিন্তু স্থলভাগের প্রকৃতি এই যে উহা জল অপেক্ষা অল্প সময়ে উষ্ণ হইয়া উঠে এবং অল্প সময়েই আবার উষ্ণতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শীতল হইয়া যায়। সাগর কখনই স্থলভাগের ন্যায় উষ্ণ হয় না, উহা উষ্ণ হইয়া উঠিতে স্থল অপেক্ষা অধিক সময়ও লাগে, কিন্তু উহা একবার উষ্ণ হইয়া উঠিলে স্থলভাগ অপেক্ষা অধিকক্ষণ উষ্ণই থাকে, স্থলভাগের ন্যায় অল্প সময়ে জলের উত্তাপ

বিনষ্ট হয় না, বরং নিজ উত্তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে। স্থল ও জলভাগের উল্লিখিত গুণ থাকাতে মধ্যাহ্নকালে স্থলভাগ যেরূপ উষ্ণ হইয়া উঠে, সমুদ্র সেরূপ হয় না, মধ্যাহ্নকালেও উহার উত্তাপ স্থল অপেক্ষা অল্প থাকে। এই জন্য সমুদ্র ও সমুদ্রের সন্নিহিত প্রদেশসকল সর্ব্বদাই, সমুদ্র হইতে অধিক দূরে অবস্থিত প্রদেশসমূহ অপেক্ষা শীতল থাকে। বাঙ্গালাদেশের অভ্যন্তরভাগে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যেরূপ উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে, উল্লিখিত কারণে বঙ্গসাগরে উক্ত সময়েও তাদৃশ উত্তাপ ও গ্রীষ্ম অনুভূত হয় না। ফলতঃ সমুদ্র হইতে যে দেশ যত অধিক দূরে অবস্থিত হইবে, তাহার তাপমান ও তদনুসারে অধিক হইবে সন্দেহ নাই। এই জন্যই গ্রীষ্মকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব আমাদের দেশ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। আবার ইংলণ্ড সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বীপ বলিয়া উহার কোন স্থানই সমুদ্র হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে, সুতরাং ইংলণ্ডের তাপমান অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা অনেক মৃদু। আবার রাত্রিকালে যখন সূর্য্যের অভাবে কি জল কি স্থল সকল পদার্থই ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, সেই সময় সমুদ্র স্থলভাগ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ বোধ হয়, কারণ সমুদ্র যেরূপ শীঘ্র উষ্ণ হয় না, সেইরূপ একবার উষ্ণ হইলে আর শীঘ্র শীতল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে স্থলভাগ যেমন শীঘ্র উষ্ণ হইয়া উঠে, তেমনি শীঘ্রই আবার শীতল হইয়া যায়। এই জন্যই শীতকালে সমুদ্রের উপরিভাগ স্থলভাগ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ থাকে। শীতকালে যদিও সমগ্র পৃথিবী যে পরিমাণে উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা উহার অধিক উত্তাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি সমুদ্রের উল্লিখিত গুণ থাকাতে উহা শীঘ্র

স্থলভাগের ন্যায় শীতল হয় না। এই জন্যই শীতকালে সমুদ্র ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসকল সমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক দূরবর্ত্তী প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ থাকে। এই জন্যই শীতকালে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে শীতের অধিকতর প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়।

সাগরজলের উল্লিখিত গুণ থাকাতে আমাদের একটী মহৎ উপকার হইয়া থাকে। উহা দ্বারা স্থলভাগে কি হিম কি উত্তাপ উভয়েরই আতিশয্য নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিম্নস্থ ভূমি বা জল উত্তপ্ত হইলে ঐ উত্তাপে উপরিস্থ বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠে,এই নিয়মে সমুদ্রের উষ্ণ প্রবাহ সকল ঊর্দ্ধস্থ বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া দেয়, এবং উহা স্থলের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া স্থলভাগকে উষ্ণ করিয়া তুলে, আবার সমুদ্রের শীতল প্রবাহসমূহ ও এই প্রকারে শীতল বায়ু প্রবাহিত করিয়া স্থলভাগকে শীতল করিয়া থাকে। উত্তর আটলাণ্টিকের অন্তর্গত মেক্সিকো উপসাগর হইতে উপসাগরীয় প্রবাহ নামে একটী প্রকাণ্ড উষ্ণ প্রবাহ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইউরোপের পশ্চিম উপকূলকে উষ্ণ করিয়া তুলে। এই প্রবাহ না থাকিলে উক্ত স্থান কখনই এরূপ না হইয়া অতিশয় শীতল হইত। এই প্রকার শীতল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া আমেরিকার কোন কোন অংশের অতিরিক্ত উত্তাপ হরণ করিয়া থাকে।

ইউরোপ প্রভৃতি উদীচ্য দেশ বিষুবরেখা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের দেশ অপেক্ষা অধিক শীতল ও তথায় অনেক স্থলে বরফ পড়িয়া বায়ুরাজিকে অত্যন্ত শীতল করিয়া তুলে সুতরাং তথাকার তাপমান আমাদের অপেক্ষা অনেক অল্প। ইহার কারণ আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত অধিক মহাসাগরসন্নিকৃষ্ট।

যদি ইউরোপখণ্ড স্থল না হইয়া সাগরজলে আচ্ছাদিত থাকিত তাহা হইলে কখনই অত শীতল হইত না। এই সকল কারণে নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইতেছে যে, বায়ুর তাপমানের তারতম্য হইবার অপর একটী কারণ জলস্থলবিভাগের তারতম্য। অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশে স্থলভাগ অধিক, তথায় তাপমান অল্প, আবার যেখানে জলের অংশ অধিক, তথায় তাপমানও অধিক হইয়া থাকে।

কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে বায়ুর তাপমানের তারতম্য অর্থাৎ ন্যূনাতিরেক হইবার প্রতি আর ও একটী কারণ আছে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইবে, যে স্থল অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্ন, তথাকার বায়ু অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ হইয়া থাকে। সিমলার পাহাড় প্রভৃতি স্থান মধ্যাহ্নকালেও তন্নিম্নস্থ স্থানসমূহের ন্যায় উষ্ণ হয় না, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। দার্জ্জিলিঙ, সিমলার পাহাড় প্রভৃতি উচ্চস্থানে সূর্য্যকিরণের প্রখরতা স্বভাবতঃ অল্প ইহা কখনই হইতে পারে না, কারণ সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন পদার্থ। উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গাদি স্থানে সূর্য্যকিরণের বিভিন্নতা নাই যদি ইহাই সিদ্ধ হইল, তবে কি কারণে উক্ত স্থানসমূহের তাপমান নিম্ন স্থানের তাপমান অপেক্ষা অল্প হয়? এরূপ হইবার কারণ পূর্ব্বেই এক প্রকার নির্ণীত হইয়াছে। নিম্নস্থানের ভূমি ও ভূমিস্থ পদার্থ সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে ঐ উত্তাপ উপরিস্থ বায়ুতে সংক্রান্ত হয়, এবং এই সংক্রমণদ্বারা বায়ুর উষ্ণতা জন্মে। সুতরাং সাগরসমতল হইতে যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই এই উত্তাপ সংক্রমণ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে, এবং পরিশেষে হিমালয় আল্পস্ প্রভৃতি উত্তুঙ্গপর্ব্বতের শিখরদেশে উপনীত

হইলে দেখা যায় যে উহা চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং তত্রত্য বায়ু অতি শীতলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল কারণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব ও পৃথক্ পৃথক্ স্থলজলবিভাগ এই দুই কারণে তাপমানের তারতম্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাগরতল হইতে উচ্চতা অনুসারেও উহার ন্যূনাধিক্য হয়; অর্থাৎ যে স্থান সাগরতল হইতে যত উচ্চ,তথাকার তাপমান সেই পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা হিমালয়শিখর চিরনীহারে আবৃত রহিয়াছে দেখিতে পাই, এই জন্যই কাশ্মীর প্রভৃতি উন্নত প্রদেশসমূহের জলবায়ু (আবহাওয়া) বহুদূর উত্তরে অবস্থিত ইউরোপখণ্ডের ন্যায় হইয়াছে, এবং এইজন্যই উক্ত প্রদেশসমূহের মনুষ্য আকারে ও বর্ণে এবং উদ্ভিজ্জসমূহ জাতি ও গুণে ইউরোপীয় মনুষ্য ও উদ্ভিজ্জাদির ন্যায় হইয়া থাকে। স্থানের উন্নতি অনুসারে তাপমানের কিরূপ তারতম্য হয়, তাহা তাপমানযন্ত্রের বিষয় পাঠ করিলে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে, এক্ষণে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে প্রতি ৩০০ ফুটে তাপমানযন্ত্রের পারদ এক ডিগ্রী নামিয়া পড়ে। নিম্নে তাপমানযন্ত্রের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

ভূপৃষ্ঠের কোন্ স্থানে কিরূপ উত্তাপ ইহা নির্ণয় করিবার জন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাপমান নামে একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার কৌশল অতিশয় সহজ। প্রথমতঃ দুই মুখ বন্ধ এরূপ একটী কাচের নল প্রস্তুত করিয়া উহার এক মুখ প্রসারিত করিয়া একটী গোলাকার ফাঁপা মস্তকের ন্যায় প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর এই নলটী হইতে যতদূর সম্ভব বায়ু বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। পরে উহার কিয়দংশ গলিতপারদপূর্ণ করিয়া এক খানি অন্নায়ত কাষ্ঠ বা হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকের উপর

উহাকে বসাইয়া রাখিতে হয়, এবং উক্ত ফলকের গাত্রে ১, ২ প্রভৃতি ডিগ্রী বা অংশের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হয়। নলটীর অভ্যন্তরে যে পারা থাকে, উত্তাপ পাইলে উহা তরল হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান অবরোধ করে, সুতরাং উর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। আবার উত্তাপ অপসারিত হইলে ঐ পারা পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া নিম্নে নামিয়া যায়। ইংলণ্ডদেশে ফারণীট নামক কোন ব্যক্তির প্রস্তুত তাপমানযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফারণীটের তাপমানযন্ত্রে এরূপ কৌশলে অঙ্ক বিন্যস্ত হইয়াছে, যে উহাকে গলিতে আরম্ভ হইয়াছে এরূপ বরফ অথবা জমিতে আরম্ভ হইয়াছে এরূপ জলে ডুবাইলে পারদস্তম্ভ ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিবে। এই জন্য ঐ অঙ্ককে নির্ম্মলজলের গলনবিন্দু কহে। যে সময় কোন স্থানের উত্তাপ স্বভাবতঃ এতদূর অল্প হইয়া পড়ে, যে তাপমানের পারদস্তম্ভ গলনবিন্দু পর্য্যন্ত অবনত হয়, তখন উক্ত স্থানে জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়। পারদস্তম্ভ গলনবিন্দুর নীচে নামিয়া পড়িলে সমুদয় জল জমিয়া একবারে কঠিন বরফ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সচরাচর পারদস্তম্ভ ৯০ অংশ দাগের উপর থাকে, কখন কখন অতিরিক্ত গ্রীষ্ম হইলে উহা অপেক্ষাও উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। ইংলণ্ড দেশে গ্রীষ্মকালে তাপমান ৭০ ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক হয় না। আবার আফ্রিকার মরুভূমিতে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে পারদস্তম্ভ ১৫০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। তাপমান যন্ত্র ফুটন্ত জলে ডুবাইলে উহার পারদস্তম্ভ ২১২ অংশ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যদি কোন স্থানে উত্তাপের আধিক্য এতদূর হয়, যে পারদস্তম্ভ ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠে, তাহা হইলে উক্ত স্থানের সমুদয় জল ফুটিতে আরম্ভ হয়। যখন তাপমান যন্ত্রের পারদ উর্দ্ধে উঠে, তখন

উত্তাপ অধিক হইয়াছে বুঝা যায়, এবং পারদ যখন নামিয়া পড়ে তখন শীত ও হিমের আতিশয্য অনুভূত হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে উঠিবার সময় প্রতি ৩০০ ফুটে তাপমানের পারদ এক ডিগ্রীর হিসাবে নামিয়া পড়ে।

বায়ুর আর্দ্রতা

বায়ুর সহিত জলীয় বাষ্প প্রচুরপরিমাণে মিশ্রিত রহিয়াছে ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জলীয় বাষ্প-দ্বারা বায়ুর তাপমান কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কিপ্রকারে এবং কোথা হইতে এই জলীয় বাষ্প বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, কি প্রকারে ও কি কি আকারেই বা উহা বায়ু হইতে পৃথক্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার স্থল ও সাগরে পতিত হয়, ক্রমে তৎসমুদয়ের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে সূর্য্যকিরণের উত্তাপে জলীয় পরমাণু উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সমুদয় তরল পদার্থ অতিশয় উষ্ণ হইলে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যকিরণের উত্তাপবশতঃ পৃথিবীস্থ জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া নিরন্তর উর্দ্ধে উঠিতেছে। পৃথিবীর যেখানে জল আছে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাহাও সূর্য্যকিরণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আকর্ষণ সমান হইলেও কঠিন দ্রব্যসকল উর্দ্ধে উত্থিত হয় না, কিন্তু জল তরল পদার্থ বলিয়া সূর্য্যের আকর্ষণে অদৃশ্য বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। কি কঠিন কি তরল সকল পদার্থই উত্তাপদ্বারা স্ফীত ও শীত দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কঠিন বস্তু অপেক্ষা [illegible] বস্তু শীঘ্র বাষ্পাকারে পরিণত হয়। লৌহাদি কঠিন [illegible]র্থ উত্তপ্ত হইলে গলিয়া প্রথমতঃ তরল হয়, পরে বাষ্প হইয়া থাকে। জল স্বভাবতঃ তরল পদার্থ বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপেই বাষ্প হইয়া যায়। কোন প্রশস্ত পাত্রে জল

রাখিয়া সূর্য্যকিরণে স্থাপিত করিলে উহা কিয়ৎকালের মধ্যে বাষ্পকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। জল অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিবার সময় ও ধূমাকারে বাহির হইয়া আকাশে উত্থিত হইয়া থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সাগর ও অন্যান্য যাবতীয় জলাশয়ের উপর নিরন্তর সূর্য্যকিরণ নিপতিত হইতেছে। সুতরাং উহার উত্তাপে মহাসাগর উপসাগর হ্রদ নদী পুষ্করিণী বিল খাল কূপ প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার জলাশয় হইতেই জলরাশি বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হয়। হিমশিলা বরফ প্রভৃতি জলসংঘাত ও এই নিয়মের অধীন। এই সকল জলসংঘাত কঠিন পদার্থ হইলেও অদৃশ্য বাষ্পাকারে জলরাশি উহা হইতে নিরন্তর উপরে উঠিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই রৌদ্রে আমাদের আর্দ্র বস্ত্র শুষ্ক হয়, পথের জল কাদা প্রভৃতি শুষ্ক হয়, ও পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইয়া যায়। ঘটী বাটীতে জল রাখিলে তাহাও শুকাইয়া যায়। পুষ্করিণী প্রভৃতির জলের কিয়দংশ অবশ্যই মাটিতে শোষণ করে, কিন্তু আর্দ্র বস্ত্রের জল ঘটী বাটীর জল ইহার অতি অল্পমাত্রও ভূমিতে শোষণ করে না, অথচ অল্প বা অধিক সময়ে ঐসকল জল কোথায় উড়িয়া যায়। অবশ্যই এরূপ হইবার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সূর্য্যকিরণের আকর্ষণবশতঃ অনাবৃত স্থানের জল অতি শীঘ্রই আকাশে উত্থিত হয় এবং তত্রত্য বায়ুরাশির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়। বায়ু নিরন্তর বাষ্পাকারে পরিণত জল শোষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিতেছে। যদিও কোন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বায়ু নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বাষ্প অপেক্ষা অধিক শোষণ করিতে পারে না, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কখনই এইরূপ জলশোষণের নিবৃত্তি নাই, বায়ু অল্প বা অধিক পরিমাণে অনুক্ষণ জলশোষণ করিতেছে। যদি অল্প

সময়ের জন্যও বায়ুর জলশোষণকার্য্য রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীতে জীব জন্তু উদ্ভিদাদি আর তিষ্ঠিতে পারে না, সকলেরই প্রাণান্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই বায়ুর সহিত জলীয় বাষ্প প্রচুরপরিমাণে মিশ্রিত থাকাতে সূর্য্য-কিরণের প্রখরতা কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়, এবং আমরা প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণের অগ্নিবৎ উত্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাই। আবার রাত্রিকালে যখন পৃথিবীর উত্তাপ বহির্গত হইয়া যায়। তখনও জলীয় বাষ্প মেঘ কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি আকারে আকাশ-মণ্ডলে বিস্তৃত থাকাতে একবারে অধিক উত্তাপ নির্গত হইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীর কিয়দংশ উত্তাপ রক্ষিত হয়। বায়ুর এইরূপ শক্তি না থাকিলে মেঘ কুজ্ঝটিকা শিশির প্রভৃতি কিছুই জন্মিতে পারিত না, এবং দিবসে প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে সমগ্র পৃথিবী একবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। আবার রাত্রি-কালে ভয়ানক হিমে সমুদয় জমিয়া যাইত। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কখনই পৃথিবীস্থ জীবসমুদয়ের প্রাণরক্ষা হইতে পারিত না। ফলতঃ সূর্য্যকিরণের উত্তাপবশতঃ জলরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠে,এবং উহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এইজন্য কথিত হইয়াছে যে সূর্য্যকিরণের আক-র্ষণে আকৃষ্ট হইয়া জলরাশি নিয়তই ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়।

বায়ুরাশি জলীয় বাষ্পসমূহকে নিয়ত শোষণ করে বটে, কিন্তু বায়ুর সহিত উত্তাপের সংযোগ হইলে শোষণ কার্য্যের সবিশেষ সুবিধা হয়। উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা অল্প সময়ে অধিক জল শোষণ করিয়া থাকে। আবার মন্দ বায়ু অপেক্ষা বেগবৎ বায়ু অধিক বাষ্প শুষিয়া লয়। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, আর্দ্র স্যাৎসেঁতে স্থান ঝড় হইলে যেরূপ শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়,

মন্দসঞ্চার বায়ুতে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে সময় সূর্য্যের উত্তাপ অধিক, সেই সময়েই বায়ু অধিকপরিমাণে জল শুষিতে থাকে। এই জন্য রাত্রি অপেক্ষা দিবসে অধিক বাষ্প বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, এবং শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে জলশোষণের সুবিধা হইয়া থাকে। যদি বায়ু আর্দ্র অথবা স্থির থাকে, তাহা হইলে অধিক বাষ্প শোষিত হয় না। আবার বায়ু বেগে প্রবাহিত হইলে শোষণের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এই কারণেই আবার বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব অনুসারে বায়ুর শোষিকাশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বিষুবরেখার নিকট উষ্ণতার চরমসীমা বলিয়া বায়ুর শোষিকাশক্তিরও চরম সীমা। আবার বিষুবরেখা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই উষ্ণতা কমিয়া যায় বলিয়া বায়ুর শোষিকাশক্তিরও হ্রাস হইতে থাকে। কত জল বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে। তবে এইমাত্র বলা যায় যে প্রতি-বৎসর যত জল এইরূপে উত্থিত হইতেছে, তৎসমুদয় একত্র করিলে প্রায় ২০০,০০০ বর্গ মাইল স্থান ১ মাইল জলের নীচে ডুবিয়া যাইতে পারে।

আমরা দেখিতেছি সূর্য্যের উত্তাপে প্রভূতপরিমাণ জল অনুক্ষণ আকাশে উঠিতেছে, অনুক্ষণ এইরূপে জল উঠিয়া যাইতেছে, তথাপি পৃথিবীর জলভাগ ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইতেছে না ইহার কারণ কি? কারণ বুঝা কঠিন নহে। পৃথিবীর জল অল্পপরিমাণেও বৃথা নষ্ট হয় না, যে পরিমাণ জল সূর্য্যকিরণের উত্তাপে উত্থিত ও বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আবার ঐ জল শিশির কুজ্‌ঝটিকা করকা প্রভৃতি নানা আকারে পরিণত হইয়া

ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া জলের ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিতেছে, সুতরাং আয় ব্যয়ের সমতা রহিয়াছে বলিয়া ভূপৃষ্ঠে যত জল আছে তাহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই। কেবল নিরন্তর বাষ্পাকারে পরিণত হইতেছে, আবার পুনর্ব্বার জলের আকার ধারণ করিতেছে। এরূপ হইবার কারণ এই যে, যে প্রকার উত্তাপবশতঃ জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ উত্তাপ কমিয়া গেলে উহা পুনর্ব্বার কঠিন হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে বায়ু উষ্ণ হইলে বাষ্পাকারে পরিণত জল শোষণ করিয়া রাখে, এবং কোন কারণে বায়ুর উত্তাপ অল্প হইলে শৈত্যবশতঃ জলীয় বাষ্পসমূহ আবার ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি করকা শিশির প্রভৃতি আকার ধারণ করে। এইরূপ হওয়াকে জলীয় বাষ্পের ঘনীভাব কহে।

যখন সূর্য্যের উত্তাপবশতঃ জল উষ্মা বা বাষ্পাকারে পরিণত হয়, সেই সময় যে স্থান হইতে জল উষ্মাকারে আকাশে উত্থিত হয়, তথা হইতে অর্থাৎ জলের আধার হইতে উহার আন্তরিক উত্তাপ বহির্গত হইয়া যায়। জলে হাত ভিজাইলে শীত অনুভব হয় ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এরূপ হইবার কারণ এই যে ঐ জল বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় উহার সহিত হস্তের আন্তরিক উত্তাপের কিয়দংশ বাহির হইয়া যায়। এইরূপে যে উত্তাপ আকৃষ্ট হয় উহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলীয় বাষ্প পুনর্ব্বার ঘনীভূত হইয়া জল শিশির প্রভৃতি আকারে পরিণত না হয়, ততক্ষণ উহারই সহিত অদৃশ্যভাবে থাকে। বাষ্প ঘনীভূত হইবার সময় উক্ত উত্তাপ বাহির হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বায়ুর আপনার স্বাভাবিক উষ্ণতা, কমিয়া যাইলে উহার সহিত মিশ্রিত জলীয়বাষ্প পুনর্ব্বার

ঘন হইয়া শিশির জল করকা হিমশিলা প্রভৃতি নানাবিধ আকারে পরিণত হয়। ফলতঃ উত্তাপের তারতম্য অনুসারে এক জল হইতেই বাষ্প শিশির কুজ্ঝটিকা মেঘ প্রভৃতি তাবৎ জলীয় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মেঘ শিশির করকা প্রভৃতি সমুদয় এক কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে কারণে শিশির ও কুজ্ঝটিকা সংঘটিত হয়, সেই কারণেই আবার বৃষ্টি ও বরফ জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ উল্লিখিত পদার্থগুলি তাপমানের তারতম্য অনুসারে উৎপন্ন জলের আকার ভেদ মাত্র। তাপমানের ভিন্নতা অনুসারে জলের আকার সর্ব্ব শুদ্ধ তিন প্রকার হইয়া থাকে। তাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভ ৩২ ডিগ্রী হইতে ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অবস্থিত স্থানের মধ্যে অবস্থিত থাকিলে যেরূপ উত্তাপ অনুভূত হয়, উহাই সামান্য জলের স্বাভাবিক অবস্থার নিয়ামক অর্থাৎ উক্তরূপ উত্তাপে জলের ব্যবহারোপযোগী পানীয় অবস্থা রক্ষিত হয়। তাপমান ২১২ ডিগ্রী অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইলে জল ফুটিতে আরম্ভ হয়, এবং আরও বর্দ্ধিত হইলে ক্রমশঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়। আবার ৩২ ডিগ্রী অপেক্ষা অল্প হইলে জল জমিতে আরম্ভ হয় এবং আরও অল্প হইলে ক্রমশঃ জমিয়া বরফ প্রভৃতি জন্মিতে থাকে। নিম্নে শিশির বরফ মেঘ প্রভৃতির বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে।

শিশির—বায়ুর তাপমান যত অধিক হইতে থাকে, উহা ততই অধিক বাষ্পধারণ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং কোন কারণে তাপমানের হ্রাস হইলে বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হয়, ও উহার বাষ্পধারণশক্তি কমিয়া যাওয়াতে উহার অন্তর্গত বাষ্পরাশির কিয়দংশ ঘনীভূত হইয়া শিশিররূপে পতিত হইতে

থাকে। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় যদি নভোমণ্ডল নির্ম্মল থাকে, তাহা হইলে বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হওয়াতে ঘাস বৃক্ষপত্র প্রস্তর ও অন্যান্য পদার্থের উপরিস্থ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশির-রূপে উহাদিগের উপর পতিত হইতে থাকে, ও প্রাতঃকালে আমরা মুক্তার ন্যায় শিশিরবিন্দুসমূহ প্রত্যক্ষ করি। দিবসের উত্তাপের পর সন্ধ্যা সমাগত হইলে সকল পদার্থ হইতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে। যে সকল পদার্থ হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ নির্গত হয়, তৎসমুদয়ের উপর অধিক পরিমাণে শিশির পড়িয়া থাকে। এই জন্য ঘাস কাচ, প্রভৃতি দ্রব্যের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশিরবিন্দু দৃষ্ট হয়, আর ধাতু বালুকা কাঁকর প্রভৃতি দ্রব্যের উপর অতি অল্প পরিমাণে শিশির পড়িয়া থাকে। উত্তাপ নির্গত হওয়াতে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হইয়া যায়, এবং এই শীতল দ্রব্যসমূহের শৈত্যসংস্পর্শে উপরিস্থ বায়ু ও শীতল হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্বের ন্যায় অধিকপরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং উহার কিয়দংশ জমিয়া শিশির-রূপে পরিণত হয়। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শিশির-বিন্দু যে সকল পদার্থের উপর পতিত হইয়া থাকে, উহা তৎ-সমুদয়ের আন্তরিক জল নহে, পদার্থসমূহ শীতল হওয়াতে উহা-দের উপরিস্থ বায়ুর অন্তর্গত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশির-রূপে পরিণত হইয়া থাকে। কোন ধাতুপাত্রে বরফ রাখিলে কয়েকক্ষণ পরেই দেখা যায় যে, পাত্রের বাহির দিকের গাত্রে জলবিন্দুসমূহ জমিয়া পাত্রটী ভিজিয়া গিয়াছে, ইহার কারণ এই যে পাত্রের ভিতরে যে বরফ রহিয়াছে, উহার সংস্পর্শে তাহার উপরিস্থ বায়ু শীতল হওয়াতে জলীয় বাষ্পসমূহ জমাট

বাঁধিয়া পাত্রের পৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। যে কারণে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে,অবিকল সেই কারণেই শিশিরের ও উৎপত্তি হয়। আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে অধিক শিশির পতিত হয় না, অতি অল্পই পড়িয়া থাকে, আর আকাশ নির্ম্মল থাকিলে প্রচুর পরিমাণে শিশিরপাত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পরিতোবর্ত্তী বায়ুরাশির উত্তাপ তত দূর বাহির হইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং উহা তাদৃশ শীতল হয় না, শীতল না হইলে কাজে কাজেই উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্পও শীতল হইয়া জমাট বাঁধিতে পারে না, সুতরাং অল্পই শিশির পড়িয়া থাকে। আবার কেবল ইহাই নহে, আকাশে মেঘ থাকিলে উহার অন্তর্গত উত্তাপ অবাধে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, এবং এই জন্যই পরিষ্কার রজনী অপেক্ষা মেঘাচ্ছন্ন রজনী কিছু অধিক উষ্ণ বোধ হয়। আবার রাত্রিতে আকাশ নির্ম্মল থাকিলে অনায়াসেই সমুদয় পদার্থ হইতে উত্তাপ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং পদার্থসকল শীতল হওয়াতে উহাদের সংস্পর্শে উপরিস্থ বায়ুও শীতল হইতে থাকে ও অধিকপরিমাণে শিশির পতিত হয়।

তাপমানের যেরূপ অবস্থায় বায়ুর অন্তর্গত জলীয় বাষ্প জমিয়া শিশির হয়, তাহাকে শিশিরবিন্দু কহে। তাপমান যন্ত্র দেখিলে শিশিরবিন্দু কি তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। যদি দিবসের উত্তাপে বায়ুরাশি অধিক উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাত্রিতে তাপমানের অল্পমাত্র ন্যূনতা হইলেই শিশির পড়িতে আরম্ভ হয়। এই জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিশির পড়িয়া

থাকে। ঐ সকল প্রদেশে বৃষ্টি অধিক হয় না, কিন্তু প্রচুরপরিমাণে শিশির পড়াতে বৃক্ষলতাদি সতেজ থাকে এবং বৃষ্টির অভাবজন্য বিশেষ অনিষ্ট হয় না। বায়ুরাশির এই কয়েকটী অবস্থা হইলে অধিক পরিমাণে শিশির পতিত হইয়া থাকে। ১ দিবসের উত্তাপে বায়ুরাশির উত্তাপ। ২ বায়ুরাশির নির্ম্মলতা। ৩ বায়ুর স্থিরতা। প্রথমটীর অভাবে, অর্থাৎ দিবসে বায়ু পর্য্যাপ্তপরিমাণে উষ্ণ না হইলে,সন্ধ্যার পর উহার ও অন্যান্য পদার্থের উত্তাপ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হইতে পায় না। দ্বিতীয়ের অভাবে, অর্থাৎ বায়ু নির্ম্মল না হইয়া মেঘমিশ্রিত থাকিলে, উহার উত্তাপে অন্যান্য পদার্থের অন্তর্গত উত্তাপ অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে পায় না, সুতরাং পরিস্থ বায়ুর উত্তাপ বিনষ্ট না হইয়া বরং রক্ষিত হয়, কাজেই অধিক শিশির জন্মিতে পারে না। তৃতীয়ের অভাবে, অর্থাৎ বায়ু স্থির না থাকিয়া চঞ্চল হইলে,কোন পদার্থের উপরিস্থ বায়ু উহার শীতল পৃষ্ঠের সহিত অধিকক্ষণ সংস্পৃষ্ট থাকিতে পারে না,সুতরাং বাষ্প অতি অল্পপরিমাণে ঘনীভূত হওয়াতে, শিশির অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যে পদার্থের উপর শিশির সঞ্চিত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত থাকা আবশ্যক, উহার উপর বৃক্ষ লতা, এমন কি মাকসার জালের ন্যায় সূক্ষ্মপদার্থের আবরণ থাকিলেও উত্তাপবিকিরণের ব্যাঘাত জন্মে এবং শিশির অল্পই পতিত হয়। যে পদার্থের উপর শিশির পতিত হয়, উহার অব্যবহিত উপরের বায়ুর অন্তর্গত জলীয় বাষ্প জমিয়া যাওয়াতেই ওরূপ হইয়া থাকে, উহার দুই বা তিন ইঞ্চি উপরের বায়ু অর্দ্ধেকমাত্রায় শীতল হয়, আর ৬ ফুট উর্দ্ধের বায়ু ২০ ভাগের একভাগ মাত্র শীতল হইয়া থাকে। কোন পদার্থের উপর শিশির পতিত হই-

বার সময় উহার ঊর্দ্ধস্থ বায়ুর তাপমান উহা অপেক্ষা ৪ ডিগ্রী মাত্র অধিক থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইবার সময় উহার অন্তর্গত অনুদ্ভূত উত্তাপ বহির্গত হইতে থাকে, এই সময় নিম্নস্থ পদার্থের উত্তাপ ও বিকীর্ণ হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু যতই উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, ততই নিম্নস্থ পদার্থ অধিকতর শীতল হয়, এবং উহার সংস্রবে উপরিস্থ বায়ুর উত্তাপ বিনষ্ট হইয়া বায়ু শীতল হইতে থাকে, এবং অধিক পরিমাণে শিশির উৎপন্ন হয়। এই উত্তাপে সমগ্র বায়ুর তাপমান শিশিরবিন্দুর উপরে থাকে, এবং রাত্রিতে অত্যন্ত শীত অনুভব হইতে পারে না। কিন্তু কখন কখন তাপমান এত কমিয়া যায়, অথবা পদার্থসমূহ হইতে এত উত্তাপ বাহির হইয়া যায়, যে নিম্নস্থ ভূমি অতিশয় শীতল হইয়া পড়ে, এবং শিশিরবিন্দু সকল উৎপন্ন হইতে হইতেই জমিয়া কঠিন হইয়া যায়, এবং ঘাস প্রভৃতি পদার্থের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমশিলার ন্যায় পতিত থাকে। এই জমাট শিশিরের নাম শিশিরসংঘাত বা শিশিরশিলা। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় হোরফ্রষ্ট কহিয়া থাকে। এইরূপ ঘটনা প্রায় শীতকালেই ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে তাপমান প্রায় কখন ঘনীভাববিন্দুর নীচে নামিতে পায় না, সুতরাং আমরা সচরাচর ওরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই না। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে অনেক সময়েই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর নেপাল প্রভৃতি অত্যুচ্চ প্রদেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাববশতঃ উপরি উক্ত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের অনেক স্থানে, নীলগিরি হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানেও শীতকালে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে আমাদের

বাঙ্গালাদেশের ফরাশডাঙ্গা প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে এইরূপ ঘটনা দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে তাপমানের পরিবর্ত্তবশতঃ বোধ হয় আর দেখা যায় না।

কুজ্ঝটিকা বা কুয়াসা।

উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুরাশি শীতল বায়ুপ্রবাহ অথবা আর্দ্রতর ও অধিক শীতল ভূমির সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে হঠাৎ উহার তাপমান অল্প হইয়া যায়। উল্লিখিত প্রকারে বা অন্য কোন কারণে বায়ুর তাপমান শিশিরবিন্দু অপেক্ষা নীচে পড়িলে উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় বাষ্প-ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্পের কিয়দংশ ঘনীভূত হইয়া অতিশয় ক্ষুদ্র জলকণসমূহে পরিণত হয়, এবং কুয়াসার আকারে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শীতকালে আমরা ইহার একটী অতিশয় সহজ উদাহরণ দেখিতে পাই। শীতের সময় নিশ্বাস ত্যাগ করিলে আমাদের উষ্ণনিশ্বাস বহিস্থ শীতল বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র উহার অন্তর্গত জলীয়বাষ্প ঘন হইয়া ধূমের আকারে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে কারণে কুজ্ঝটিকা সংঘটিত হয়, ইহাও অবিকল সেই কারণেই হইয়া থাকে। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ, নদীর অববাহিকা, সাগরতীর, জলা প্রভৃতি স্থান ও শীতপ্রধান দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিউফাউণ্ডলণ্ড দ্বীপে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক প্রগাঢ় ও দীর্ঘকালব্যাপী কুজ্ঝটিকা দৃষ্ট হয়। মেক্সিকোর অন্তর্গত উপসাগরীয় প্রবাহ হইতে যে উষ্ণ বায়ু পূর্ব্ব ও উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে, উহাই উত্তর মহাসাগরীয় শীতল বায়ু ও তত্রত্য বরফরাশির সংস্রবে শীতল হওয়াতেই এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন ইংলণ্ড

প্রভৃতি ইউরোপখণ্ডের অনেক প্রদেশেই বহুকালব্যাপী কুয়াসা দৃষ্ট হয়। প্রভাতে কুয়াসা হইলে সূর্য্যের কিরণ একবারে আবৃত হয় ও কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই কারণে অনেক সময় বেলা ১০ টার সময়েও ইংলণ্ডের রাজপথসমূহে আলোক জ্বালিতে হয়। সচরাচর শেষ রাত্রিতেই কুজ্ঝটিকা সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু কি শীত, কি গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই কখন কখন নদী ও জলা ভূমির উপর কুয়াশা দেখিতে পাওয়া যায়। কুজ্ঝটিকার আকার ধূমের ন্যায়, সুতরাং অনেক সময় লোকালয়ে ধূমকে কুয়াসা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু লোকালয় হইতে বহুদূরস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ধূম থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তথায় বিশুদ্ধ কুয়াশা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মেঘ, বৃষ্টি ও ইন্দ্রধনু।

কুজ্ঝটিকা ও মেঘ এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নাই, উভয়ই অবিকল এক পদার্থ, কেবল ভিন্নভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয় বলিয়া ভিন্নভিন্ন নামে অভিহিত হয়, এবং প্রত্যেকের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। কুজ্ঝটিকা কাহাকে বলে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে মেঘ ও বৃষ্টির বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে মেঘও এক প্রকার কুজ্ঝটিকা। সূর্য্যের উত্তাপে ভূপৃষ্ঠস্থ জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, উপরিস্থ বায়ুরাশি যত উষ্ণ হয়, ততই উক্ত জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে থাকে, পরে শীতল বায়ু অথবা আর্দ্রভূমির সহিত সংস্পর্শে উক্ত বায়ুর উষ্ণতা বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় অধিক বাষ্প বহন করিতে পারে না, কাজেই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া কুজ্ঝটিকার আকারে

…ত হয়। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে বায়ুর অন্তর্গত …য় বাষ্প হইতেই কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি। মেঘ ও স্বতন্ত্র …র্থ নহে, আমরা যাহাকে কুজ্ঝটিকাশব্দে নির্দ্দেশ করি, উহা …র উপর অথবা উহার সন্নিহিত আকাশে সংঘটিত হয়, …াৎ ভূমির অব্যবহিত উপরে বা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে জলীয় বায়ু …কারে পরিণত হইলে উহাকে কুজ্ঝটিকা কহে, আর ভূমি …তে অনেক ঊর্দ্ধে শূন্যমার্গে উক্তপ্রকার জলীয় বাষ্প ধূমাকারে …ণত হইলে উহাকে মেঘ বলা যায়। সুতরাং মেঘ আর …ছুই নহে, কেবল ভূমি হইতে অনেক ঊর্দ্ধে উৎপন্ন কুজ্ঝটিকা …ত্র। গভীর সাগরতল বা উত্তুঙ্গ শৈলশিখর, যেখানে হউক, …মিসংস্পৃষ্ট হইলেই কুজ্ঝটিকা হইল, আর শূন্য আকাশে লম্ব…ান হইলেই মেঘ হইল, কুজ্ঝটিকা ও মেঘ উভয়ের মধ্যে এই …ত্র প্রভেদ। পর্ব্বতশিখরে সংঘটিত ধূমাকার জলীয় বাষ্পকে …লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে কুজ্ঝটিকা নামে নির্দ্দেশ করা উচিত …ট, কিন্তু মেঘের ন্যায় নিম্নভূমি হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া …হাকে সচরাচর মেঘই কহিয়া থাকে। মেঘ ও কুজ্ঝটিকা …কই উপকরণ হইতে উৎপন্ন, অতএব উহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত …কান প্রভেদ নাই, আকার ও বর্ণ এই দুই বিষয়ে উভয়ের …ধ্যে আপাততঃ যে প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাও বাস্তবিক কিছুই …হে, মেঘ বহুদূর ঊর্দ্ধে অবস্থিত ও উহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতি…ফলিত হয় বলিয়া উহা নানাবিধ আকার ও বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। কুজ্ঝটিকা অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত বলিয়া আমরা মেঘের ন্যায় উহার ভিন্ন ভিন্ন আকার ও বর্ণ বুঝিতে পারি না।

আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত থাকিয়া যে বায়ুপ্রবাহ অনুভব করি, উহা অতি নিম্ন আকাশে আমাদের নিকটেই প্রবাহিত হয়,

কিন্তু যদি পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানে আরোহণ করা যায়, তাহা হইলে তথায় বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রবাহ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। নিম্ন আকাশে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, উচ্চ আকাশে প্রবাহিত বায়ু তদপেক্ষা অনেক শীতল। নিম্নস্থ বায়ুর তাপমান অধিক হইলে উহা ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এইরূপে ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর সহিত উহার সংস্পর্শ হইবামাত্র, শৈত্যপ্রভাবে উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্পসমূহ ঘনীভূত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে, এবং উহা অপেক্ষা আরও অধিক শীতল হইলে উক্ত মেঘ বৃষ্টিস্বরূপে ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।

মেঘ অত্যন্ত চঞ্চল পদার্থ, কদাপি স্থির থাকিতে পারে না। উচ্চ আকাশে সর্ব্বদা যে সকল বায়ুপ্রবাহ নানা মুখে প্রবাহিত হয়, মেঘসমূহ উহাদের সহিত অনুক্ষণ প্রধাবিত হইতে থাকে, ও নানাপ্রকার আকার ধারণ করে। ঊর্দ্ধ আকাশে বায়ুর একটী প্রবাহ একদিকে, ও অপরাপর প্রবাহ উহার বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, সুতরাং মেঘসমূহ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে নীত হয়। নিম্নের বায়ু যে মুখে প্রবাহিত হইতেছে, ঊর্দ্ধের বায়ু সচরাচর তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, সুতরাং প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নস্থ এক খণ্ড মেঘ যে দিকে প্রধাবিত, উপরিস্থ আর এক খণ্ড তাহার বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। কখন কখন কোন কোন মেঘখণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যত্নসহকারে নিরীক্ষণ করিলে অনায়াসেই এই ভ্রমের নিরাকরণ হইয়া থাকে, ফলতঃ চঞ্চল বা নিশ্চল যাহাই বোধ হউক না কেন, মেঘ মাত্রেই আকাশমার্গে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, একবিন্দুও স্থিরভাবে থাকে না।

অনন্ত আকাশে অশেষবিধ ভিন্ন ভিন্ন বায়ুপ্রবাহ নিরন্তর বাহিত হইতেছে, উহাদের তাপমান ও ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য র্বদাই নূতন নূতন মেঘের উৎপত্তি ও বিলয় হইতে দেখা যায়। ষ্ণবায়ুপ্রবাহ তদপেক্ষা শীতলপ্রবাহের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে ৎক্ষণাৎ শৈত্যবশতঃ উষ্ণপ্রবাহের অন্তর্গত জলীয় বাষ্পসমূহের ়য়দংশ মেঘাকারে পরিণত হয়। আবার যখন মেঘসমূহ প্রবা- তে হইতে হইতে উষ্ণবায়ুপ্রবাহের সহিত সংহত হয়, তৎ- ণাৎ উষ্ণতাবশতঃ মেঘের জলকণাসকল পুনর্ব্বার বাষ্পাকারে রিণত হয়, এবং মেঘ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আকাশমার্গে নিরন্তর ায়ুর ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণ ও শীতল প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, তরাং সর্ব্বদাই নূতন নূতন মেঘের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, চরাচর মেঘ যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, ততই তত্রত্য বায়ুর শৈত্য- শতঃ উহার কলেবর বৃদ্ধি হয়, আবার উহা যত নিম্নে নামিতে থাকে, ততই অত্রত্য বায়ুর উষ্ণতাবশতঃ উহার অন্তর্গত জল- কণ সকল পুনর্ব্বার বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় ও উহার আকা- রের হ্রাস হইয়া যায়। অনেক সময় বোধ হয় যে আমাদের মস্তকোপরি সংস্থিত মেঘসমূহ মন্দ মন্দ সঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক উহাদের বেগ অল্প নহে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন আকাশস্থ মেঘসমূহের গতি মন্দ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে সকল মেঘ বহুদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া তত্রত্য বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহারা উক্ত বায়ুরাশির সহিত প্রতি ঘণ্টায় ৮০। ৯০ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। উচ্চ স্থানে মেঘের ছায়ার গতিবেগ নিরূ- পণ করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কখন কখন পর্ব্ব- তের উচ্চশৃঙ্গে লম্বমান মেঘখণ্ড স্থিরভাবে তথায় সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছে তথাপি উহা

স্থানভ্রষ্ট হয় না। এরূপ হইবার কারণ কি? বস্তুতঃ কি উক্ত মেঘ স্থিরভাবেই থাকে? মেঘ কখনই স্থিরভাবে থাকে না, বিশেষতঃ ঝড় বহিবার সময় ত কোন প্রকারেই নিশ্চল থাকিতে পারে না। তবে এরূপ হইবার কারণ আছে। উক্ত মেঘখণ্ড আপাততঃ নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা নিশ্চল নহে, ঝড়ের সঙ্গে উড়িয়া যায়, কিন্তু ঐ স্থানে উষ্ণ ও শীতল বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই নূতন নূতন মেঘের উৎপত্তি হয়, এক যাইতেছে, আর এক উৎপন্ন হইয়া উহার স্থান অধিকার করিতেছে। এই জন্যই উহাকে নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়।

মেঘ সচরাচর ধূম্রবর্ণ, কিন্তু সময়ে সময়ে শ্বেত, পীত, লোহিত, নীল, হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণের মেঘ দেখা যায়। সূর্য্যকিরণে সাত প্রকার বর্ণ আছে। মেঘের উপর উক্ত বর্ণসমূহ প্রতিফলিত হইলে মেঘ ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। বহুকোণবিশিষ্ট ঝাড়ের কলম প্রভৃতি কাচের উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইলে সমুদয় বর্ণই পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রামধনু বা ইন্দ্রধনুর অত্যাশ্চর্য্য শোভাও উক্ত প্রকারেই সংঘটিত হয়। বৃষ্টি হইবার সময় প্রত্যেক জলবিন্দু একখানি বহুকোণ কাচের ন্যায় কার্য্য করে। উহার উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে সাতটী বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়। এইরূপে বহুসংখ্যক জলবিন্দুর উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া সমগ্র ধনু উৎপাদন করে। আকাশমণ্ডলের যেভাগে সূর্য্যের অবস্থান, ইন্দ্রধনু তাহার বিপরীত দিকে দৃষ্ট হয়। এই জন্য উহাকে পূর্ব্বাহ্নে পশ্চিমে,ও অপরাহ্নে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়। সূর্য্যের দিকে কুলকুচী করিয়া জল ফেলিলে উক্ত জলেও রামধনুর আকার দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গতিবশতঃ মেঘ নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকে। আকারের বিভিন্নতা অনুসারে মেঘ সকল সাত শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথাঃ—(১) অলক, (২) স্তূপ, (৩) স্তর, (৪) অলকস্তূপ (৫) অলকস্তর, (৬) স্তূপস্তর, (৭) বৃষ্টিপ্রদ। এই সাত প্রকারের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ, আর অবশিষ্ট চারি প্রকার উহাদের যোগে উৎপন্ন।

১। প্রথম প্রকার মেঘের নাম অলকমেঘ, কারণ উহা নভোমণ্ডলে কুটিল কেশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অলকমেঘ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, সুতরাং আকাশের অত্যুচ্চস্থানে অবস্থিতি ও বিচরণ করিয়া থাকে। সচরাচর ভূপৃষ্ঠ হইতে তিন মাইল ঊর্দ্ধে এই মেঘ সংঘটিত হয়, কিন্তু কখন কখন ৫।৬ মাইল ঊর্দ্ধেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত দিন উত্তর দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইবার পর অলকমেঘ উদিত হইলে অচিরাৎ বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবায়ু হইবার সম্ভাবনা।

২। দ্বিতীয়প্রকার মেঘ স্তূপাকারে অবস্থিত হয় বলিয়া উহাকে স্তূপমেঘ কহে। স্তূপমেঘ সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া অশেষবিধ আকার ধারণ করে, কখন কখন উহা তুষারাচ্ছন্ন শৈলমালার ন্যায় লক্ষিত হয়, কখন বা হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই মেঘ প্রায় গ্রীষ্মকালেই সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দৃষ্ট হয়। পরে যত বেলা বাড়িতে থাকে, ততই ঊর্দ্ধগামী উষ্ণবায়ুর প্রবাহে ঐ সকল ক্ষুদ্র মেঘ একত্রিত হইয়া বৃহৎ আকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং মধ্যাহ্নে অনেক উচ্চে উঠিয়া সূর্য্যাস্তের সময় পুনর্ব্বার নিম্নগামী শীতল বায়ুর প্রবাহে বাষ্পাকারে পরিণত

হইয়া অন্তর্হিত হয়। যদি উক্ত মেঘের আকার ঘন ঘন প বর্ত্তিত হইতে থাকে ও উহা ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে এরূপ অনুমান করা যায় স্তূপমেঘ প্রায়ই নিম্ন ও মধ্য আকাশে সংঘটিত হয়।

৩। তৃতীয় প্রকার মেঘের নাম স্তরমেঘ। উহা ভূচ বালের উপরিভাগে নিম্ন আকাশেই সংঘটিত হয়, এবং পর্ব্ব কন্দর জলাশয়াদির উপর আচ্ছাদনরূপে অবস্থিত থাকে। এ মেঘের প্রকৃতি ঠিক স্তূপমেঘের বিপরীত। স্তূপমেঘ প্রাত কালে সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়ি মধ্যাহ্নকালে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং দিবাবসানে ক্রম কমিতে কমিতে অবশেষে সন্ধ্যার সময় একবারে তিরোহিত হয় কিন্তু স্তরমেঘ সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রিতে বাড়িতে থাকে এবং রাত্রিশেষে ক্রমশঃ কম হইয়া প্রাতঃকালে অন্তর্হিত হয় যদি স্তরমেঘ প্রাতঃকালের উত্তাপে বিগলিত না হইয়া অনবর বাড়িতে থাকে তাহা হইলে শীঘ্রই বৃষ্টি হইতে পারে।

৪। অলকস্তূপ মেঘ প্রথমে অলকস্বরূপে উৎপন্ন হইয় ক্রমশঃ স্তূপে পরিণত হয়। এই মেঘ অত্যন্ত স্বচ্ছ, এজন ইহার মধ্য দিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের গাত্রস্থ চিহ্ন সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গ্রীষ্মকালে উচ্চ আকাশে অবস্থিত হইবে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, আর নিম্ন আকাশে থাকিলে ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়।

৫। অলকস্তর মেঘ প্রথমতঃ অলকরূপে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ স্তরের সহিত মিশ্রিত হয়; এবং নূতন আকার ধারণ করে। এই প্রকারের মেঘ প্রায়ই বৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়, এবং উহা উৎপন্ন হইবার সময় সূর্য্য ও চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে একটী মণ্ডলাকার

রেখা অর্থাৎ পরিধি দৃষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ পরিধি দৃষ্ট হইলে বৃষ্টি ও ঝড়ের অনুমান হয়। স্তূপস্তর মেঘ স্তূপ ও স্তর এই উভয় মেঘের সমবায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দূরবিস্তীর্ণ সমতল মেঘ-রাশির উপর এই মেঘ বৃহৎ বৃহৎ স্তূপের আকারে অবস্থিত থাকে। প্রায়ই ঝড়বৃষ্টিরপূর্ব্বে স্তূপস্তর মেঘ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং বায়ুর সঞ্চালনে প্রকাণ্ড স্তূপাকারে লক্ষিত হইতে থাকে। এই মেঘ উর্দ্ধ আকাশে উঠিয়া যদি লঘু ও ছিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা হইলে প্রায়ই ঝড় হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি নিম্নে অবনত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঝড়ের পরিবর্ত্তে বৃষ্টি হয়।

৭। বৃষ্টিপ্রদ মেঘ উল্লিখিত সাত প্রকার মেঘের মধ্যে দুই চারিটীর সমবায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর স্তূপ, স্তর ও অলক এই তিন প্রকার মেঘেই ইহার উৎপত্তি। এই মেঘ প্রথমতঃ নীল বা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, কিন্তু অবশেষে সীসার ন্যায় বর্ণে পরিণত হয়। অলকমেঘ বায়ুর সঞ্চারে স্তূপস্তর মেঘের সহিত মিলিত হইলেই বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা সচরাচর ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ অবধি ৫০০০ ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে সংঘটিত হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপ্রদ মেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধসংখ্যা আধ ক্রোশ বা এক পোয়া উর্দ্ধে সংঘটিত হয়, আর অলকমেঘ দেড় ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে বিচরণ করে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,মেঘ সচরাচর অর্দ্ধক্রোশ হইতে তিনক্রোশপর্য্যন্ত উর্দ্ধেসংঘটিত হয়। অর্দ্ধক্রোশের নিম্নে বা তিনক্রোশের উর্দ্ধে প্রায়ই মেঘ দেখা যায় না। সিমলায় পাহাড় প্রভৃতি অত্যুচ্চ স্থানে আরোহণ করিলে সময়ে সময়ে দেখা যায় যে উহার নিম্নস্থ প্রদেশে বৃষ্টি ও বাত্যা হইতেছে।

বৃষ্টি।—সূর্য্যের উত্তাপে ভূপৃষ্ঠ হইতে যত জল বাষ্পাক আকাশে উত্থিত হয়, উহার অধিকাংশই বৃষ্টির আকারে পুনঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, অতি অল্প অংশই শিশির কুজ্ঝটিকা প্রভৃ আকারে পরিণত হইয়া থাকে। উষ্ণবায়ু ও শীতল ব পরস্পর সংঘর্ষ হইলে অথবা উষ্ণ বায়ু শীতল ভূমির সা সংস্পৃষ্ট হইলে ঐ উষ্ণ বায়ুর অন্তর্গত জলীয় বাষ্পের কিয় কুজ্ঝটিকা, শিশির, বা মেঘরূপে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হ মেঘের সহিত অধিকতর শীতল বায়ু বা তুষারাচ্ছন্ন পর্ব পার্শ্বের সংস্পর্শ হইলে উক্ত মেঘের অন্তর্গত সমুদয় উত্তাপ বা হইয়া যায়, এবং মেঘরাশি আরও গাঢ় হইয়া পরিশেষে জলব পরিণত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে থাকে। মেঘ শীতল হই থাকিলে উহার জলীয় অণুসমূহ ঘন হইয়া ক্রমশঃ একত্রিত হই আরম্ভ হয়। এই প্রকারে জলবিন্দু সকল যতই বড় হয়, ত উহার ভারবৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং পরিশেষে বায়ুভার অপেক্ষা অধিক ভারি হইলে, বায়ুরাশি আর উহাকে শূন্যে লম্ব রাখিতে পারে না, সুতরাং জলবিন্দুসমূহ অধিকতর ভারবশ জলধারারূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই বৃষ্টি কহে। জল আর্দ্র অথচ উত্তপ্ত বায়ু স্পঞ্জের ন্যায়। এই প্রকার বা সহিত শীতল বায়ুর সংস্পর্শ হইলে উহার অন্তর্গত জলীয় ব ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মেঘ ও বায়ু উ য়ের ভার সমান থাকে, ততক্ষণ মেঘ বৃষ্টিরূপে পতিত হয় না; কি অধিক শীতল হইলে মেঘের ভার বায়ুভারের অপেক্ষা অধিক হ সুতরাং জলসিক্তস্পঞ্জ নিপীড়ন করিলে যেমন জল পড়িতে থাকে সেইরূপ মেঘের ভার অধিক হইলে উহার জলবিন্দুসকল ভূতলে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন তড়িতের বেগ ও বৃষ্টির পক্ষে অনুকূল।

সমগ্র ভূপৃষ্ঠে প্রতিবৎসর যত বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার পরিমাণ করা যায়। গড়ে যত জল পতিত হয় উহা যদি মৃত্তিকাদ্বারা শোষিত ও নদী খাল প্রভৃতিদ্বারা সমুদ্রে নীত না হইয়া একত্র জমা হইত, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী পাঁচ ফুট গভীর জলদ্বারা সর্ব্বাবয়বে আচ্ছাদিত হইতে পারিত। গণনাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে প্রতি বৎসর প্রায় ১৮৬,২৪৭ ঘন মাইল জল বৃষ্টিস্বরূপে পতিত হয়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমপরিমাণে বর্ষা হয় না, উহার যে অংশ হইতে যে পরিমাণে জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়, তথায় তদনুরূপ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাষ্প উত্থিত হয়, আর গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে মেরুর দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই বাষ্পোত্থিতির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এই জন্য আবার সমশীতোষ্ণমণ্ডল হইতে যত বাষ্প উত্থিত হয়, হিমমণ্ডল হইতে তদপেক্ষা অনেক অল্প বাষ্প উঠিয়া থাকে। এই কারণে গ্রীষ্মমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও হিমমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা, আর সমশীতোষ্ণমণ্ডলে এই উভয়ের মাঝামাঝি বৃষ্টি হইতে পারে। ফলেও প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। শীতকালে বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে, এই জন্য শীতের সময় প্রচুরপরিমাণে বাষ্প জন্মিয়া থাকে, গ্রীষ্মকালেও বায়ুর উষ্ণতাবশতঃ অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। এই কারণে শীত ও গ্রীষ্মকালে বিল খাল প্রভৃতি অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। পরে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুজাতবাষ্পরাশিতে বায়ু পূর্ণ হইলে বাষ্পোত্থান ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং বায়ুমিশ্রিত বাষ্প বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে আরম্ভ হয়।

কেবল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জলাভূমি ও বায়ুরাশির ভিন্ন

ভিন্ন মুখে বহন এই উভয় কারণে উক্ত নিয়মের কিয়দংশে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) সাগরজলের উপর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া উপরিস্থ বায়ুরাশিকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক সিক্ত করে বটে, কিন্তু সমুদ্রের উপর হইতে যে পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়, উহার উপরিস্থ আকাশে বায়বীয় জলীয় বাষ্প তদনুরূপ ঘনীভূত হইতে পারে না, স্থলভাগের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাষ্প ঘনীভূত হইয়া থাকে; এই জন্য সাগরপৃষ্ঠ অপেক্ষা স্থলভাগের উপর অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধ অপেক্ষা উত্তরার্দ্ধে অধিক বর্ষা হইয়া থাকে, কারণ দক্ষিণার্দ্ধে জলের ভাগ অধিক, স্থলের ভাগ অল্প, আর উত্তরার্দ্ধে স্থলের ভাগ অধিক ও জলের ভাগ অল্প। (২) সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাষ্প উত্থিত হয়, এবং স্থলভাগের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাষ্প ঘনীভূত হয়, এই জন্য সাগরের উপকূলস্থ প্রদেশে যেরূপ বৃষ্টি হয়, উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী আভ্যন্তরিক প্রদেশে তাদৃশ হয় না। (৩) স্থলভাগের আকার অনুসারে বৃষ্টির তারতম্য হইয়া থাকে, পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানের তাপমান অল্প বলিয়া তথায় নিম্ন হইতে বায়ু উত্থিত হইলেই শীতল হইয়া যায় ও উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্প মেঘরূপে পরিণত হইয়া অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকে, সুতরাং প্রতীতি হইতেছে যে সমতল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অধিক বর্ষা হয়। [৪] কোন নির্দ্দিষ্ট বায়ুপ্রবাহের অভিমুখে অবস্থিত প্রদেশসমূহে কখন কখন অত্যন্ত বর্ষা, কখন বা বৃষ্টির একান্ত অভাব হইয়া থাকে। যখন তত্রত্য ভূখণ্ডের শৈত্য-সংস্পর্শে বহমান বায়ু শীতল হয়, তৎকালে তথায় প্রচুরপরি-

মাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, আবার যখন উক্ত ভূখণ্ডের উত্তাপে উপস্থিত বায়ুরাশি উত্তপ্ত হয়, তৎকালে বৃষ্টির অভাব হয়। এই জন্য মেরু হইতে বিষুবরেখার অভিমুখে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার সহিত প্রায়ই বর্ষার সংস্রব হয় না, আর বিষুবরেখা হইতে যে বায়ু মেরুর অভিমুখে ধাবমান হয়, উহা উদীচ্য প্রদেশসমূহের শৈত্যে শীতল হইয়া বর্ষা আনয়ন করে। এই কারণে ইংলণ্ডের পূর্ব্বভাগ অপেক্ষা পশ্চিমভাগে ও আয়রলণ্ডে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, কারণ বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উৎপন্ন বায়ুরাশি আটলাণ্টিক অতিক্রমণপূর্ব্বক নিয়তই এই সকল স্থানে অভিঘাত করিতেছে।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিবৎসর যত বৃষ্টি পতিত হয় তাহার পরিমাণ ও ভিন্ন ভিন্ন। গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাষ্প উৎপন্ন হয় বলিয়া অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে, আর যতই অগ্রসর হওয়াযায় ততই বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সমশীতোষ্ণমণ্ডলে বায়ুর প্রবাহ সর্ব্বদাই চঞ্চল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের বায়ু অপেক্ষাকৃত স্থির, এই জন্য সমমণ্ডলস্থ প্রদেশসমূহে গ্রীষ্মমণ্ডল অপেক্ষা অধিকসংখ্যক দিন বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু সমমণ্ডলে গ্রীষ্মমণ্ডল অপেক্ষা বৃষ্টির পরিমাণ অনেক অল্প। বিষুবরেখার সন্নিহিত স্থানে প্রতিবৎসর ৯৫ ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু বৎসরের মধ্যে ৮০ দিন মাত্র বর্ষাকাল, পক্ষান্তরে রুশিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ নগরে বৎসরে ১৭ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি হয়, কিন্তু ১৬৯ দিন বর্ষাকাল। গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে আবার যেখানে পর্ব্বতাদি উন্নত স্থান আর্দ্র উষ্ণবায়ুপ্রবাহের ঠিক অভিমুখে অবস্থিত, তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত খসিয়া পাহাড়, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌ-সুমী বায়ুর

অভিমুখে অবস্থিত বলিয়া তথায় মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া থাকে এই স্থানে ৫০০ বা ৬০০ ইঞ্চি পরিমিত বাষ্প প্রতি বৎসর বৃ রূপে পতিত হয়। এই জন্যই চিরাপুঞ্জি পাহাড়, গায়েং ব্রাজিল ও বোম্বাই উপকূলে যত বৃষ্টি হয়, পৃথিবীর আর কুত্রা সেরূপ হয় না। আবার যে স্থান কোন উচ্চ পর্ব্বতের পশ্চা অবস্থিত, তথায় অতি অল্পমাত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বতের উপ ভাগ ও তাহার যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তথায় প্রচুরপ মাণে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু যে স্থান পর্ব্বতের পশ্চাতে অব তথায় উক্ত বায়ুপ্রবাহ লাগিতে পায় না বলিয়া কিছুমাত্র নাই, এরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পশ্চি উপকূলে ভারতসমুদ্র হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে বায়ু প্রবাহি হইবার সময় বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়া থাকে, এই বায়ুর অভিমু পশ্চিম ঘাটগিরি অর্থাৎ সহ্যাদ্রি অবস্থিত। পশ্চিম ঘাটের উপ ও বোম্বাই উপকূলে প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হয়, কিন্তু ঘাটগি পূর্ব্বে অবস্থিত প্রদেশে ব্যবধানবশতঃ উক্ত বায়ুর তাদৃশ সং হয় না বলিয়া অতি অল্প বৃষ্টিপাত হয়। এই কারণে ঘাটগি উপরে বার্ষিক ২৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইলেও পুনানগরীতে প্রতি বৎ ২৬ ইঞ্চিমাত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যা তেছে যে দুই প্রদেশের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ব্যবধান থাকি বর্ষার ন্যায় অন্যান্য ঋতুর ও আবহাওয়ার ও বৈলক্ষণ্য হই থাকে। যে কারণে কোন পর্ব্বতশ্রেণীর এক পার্শ্বে বর্ষা ও এ পার্শ্বে শুষ্কতা হয়, সেই কারণেই পর্ব্বতের উপরিস্থ মালভূমিত অতি অল্পই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পর্ব্বতের গড়ানি অংশ অতিক্রম করিবার সময় বায়ুর অন্তর্গত প্রায় সমুদয় জলী বাষ্প বৃষ্টি হইয়া ব্যয়িত হইয়া যায়, সুতরাং উহা উচ্চ মা

ভূমিতে পৌঁছিতে পারে না। স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগর ও পর্টুগাল দেশের পশ্চিম উপকূল একই অক্ষরেখায় অবস্থিত, কিন্তু মেড্রিড নগর মালভূমির উপর অবস্থিত বলিয়া উহাতে অল্পই বর্ষা হয়, আর পর্টুগালের পশ্চিম উপকূলে প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। মেড্রিড নগরে বার্ষিক ১০ ইঞ্চিমাত্র বৃষ্টি হয়, কিন্তু পর্টুগালের পশ্চিম উপকূলে প্রতি বৎসর প্রায় ১১০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে।

বায়ুপ্রবাহের ভিন্নতা অনুসারে বৃষ্টির অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। এই জন্য বায়ুপ্রবাহের ন্যায় বৃষ্টিকেও সাময়িক, পরিবর্ত্তনশীল, এবং নিত্য, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বৎসরের মধ্যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাকেই সাময়িক বৃষ্টি কহে। এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বায়ুর ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৃষ্টি হইলে উহাকে অস্থির বা পরিবর্ত্তনশীল বৃষ্টি কহে। কোন কোন স্থানে সংবৎসর অনবরত বর্ষা হইয়া থাকে, ইহাকেই নিত্যবর্ষা কহে। আবার কোথাও কোথাও একবারে বৃষ্টি হয় না। এইরূপ বর্ষাবিহীন প্রদেশের নাম নির্বর্ষ দেশ।

সাময়িক বৃষ্টি।—গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে সাময়িক বর্ষার আবির্ভাব। এই সকল স্থানে বর্ষা ও গ্রীষ্ম এই দুইটিই প্রবল ঋতু। এখানে সূর্য্যের প্রতীয়মান গতির ভিন্নতা অনুসারে বৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন সূর্য্য বিষুবরেখার দক্ষিণাংশে লম্বভাবে অবস্থিত হয়, তখন তথায় বর্ষা উপস্থিত হয়, এইরূপে বিষুবরেখার উত্তরাংশে সূর্য্য লম্বভাবে অবস্থিত হইলে তথায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। সামান্যতঃ বিষুবরেখার উত্তরাংশে বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর দক্ষিণাংশে কার্ত্তিক

হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়। কিন্তু বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব ও দেশের আকার প্রভৃতি কতিপয় কারণে এইরূপ নিয়মের অনেক তারতম্য হয়। কিন্তু সকল স্থানেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বিষুবরেখার পাঁচ ডিগ্রী দূর হইতে ১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকেই বৎসরের মধ্যে দুই বার বর্ষা হয়, কারণ এই স্থানে সূর্য্য দুইবার বিষুবরেখা অতিক্রম করে। এই সকল প্রদেশে যদিও বর্ষাকালে গুরুতর বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু কখনই সমস্ত দিন বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। রাত্রিতে প্রায়ই বর্ষা হয় না, কেবল দিবাভাগে মধ্যাহ্ন হইতে বেলা ৪।৫ টা পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের কয়েক মাস প্রায় বিন্দুপাত হয় না, কিন্তু প্র পরিমাণে শিশির পড়াতে উদ্ভিজ্জাদি সতেজ থাকে ও বৃ অভাবজন্য কষ্ট অনুভব করিতে হয় না। ভারতবর্ষ ও ভা মহাসাগরের নিকটস্থ অন্যান্য দেশে বর্ষার নিয়ম স্বতন্ত্র, সকল স্থানে সূর্য্যের গতি অনুসারে না হইয়া সাময়িক ব গতি অনুসারে বর্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ প্র কোন কোন দেশে বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস একদিক হ বায়ু প্রবাহিত হয়, আর কয়েক মাস অন্যদিক হইতে প্রব হইয়া থাকে। এই সাময়িক বায়ু শীতলদেশ হইতে উষ্ণ প্রবাহিত হইলে উষ্ণতাবশতঃ গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, আর উষ্ণ হইতে শীতল দেশে বহন করিলে শৈত্যবশতঃ উহার বর্ষা উপস্থিত হয়। এই প্রযুক্ত এই সকল দেশে বর্ষা সময় এবং শীত ও গ্রীষ্ম এই কয়েকটাই প্রধান ঋতু। আষাঢ় শ্রাবণ প্রভৃতি মাসে আমাদের দেশে বর্ষা উপস্থিত হয়। ভা বর্ষের পশ্চিমাংশে পশ্চিম-দক্ষিণ দিক হইতে মৌসুমী বায়ু প্রবা

়ত হইয়া বর্ষা উপস্থিত করে, আর পূর্ব্বাংশে উত্তরপূর্ব্ব বায়ুর ভাবে বর্ষা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশে পৌষ ও মাঘ াসে উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া ঐ ময় অল্পই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

অস্থির বা পরিবর্ত্তশীল বর্ষা।—গ্রীষ্মমণ্ডলের বহির্ভাগে অর্থাৎ মশীতোষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত দেশসমূহে এই প্রকার বৃষ্টির াদুর্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর সমমণ্ডলে স্থলের অংশ ়ধিক বলিয়া অধিক বৃষ্টি হয়। ইংলণ্ড দেশে গ্রীষ্মকালে যে রিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, শীতকালে তদপেক্ষা আট গুণ অধিক র্ষা হয়। ভূমধ্যসাগরের পরিতোবর্ত্তী দেশসমূহে প্রায় শীত- ালেই অধিক বর্ষা হইয়া থাকে। ইউরোপ মহাদেশের পশ্চি- াংশে শরৎকাল বৃষ্টির প্রকৃত সময়, ইউরোপের পূর্ব্বাংশ হইতে আল্পস্ ও বলকান পর্ব্বতের উত্তরে) সাইবীরিয়া দেশ পর্য্যন্ত ীষ্মকালে বর্ষা উপস্থিত হয়। ইউরোপ খণ্ডে পশ্চিম-দক্ষিণ ইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে বর্ষা ও উত্তর-পূর্ব্ব হইতে বায়ু াসিলে শীত উপস্থিত হয়। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় উত্তরপূর্ব্ব ইতে বায়ুপ্রবাহ আসিয়া বসন্ত ও শরৎকালে বর্ষা উপস্থিত রে।

স্থির বর্ষা।—বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থলভাগে সর্ব্বাপেক্ষা ়ধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে ও প্রায় সর্ব্বদাই বর্ষা হয়। বিষুবরেখার নকটে যেখানে বায়ুর নিয়মিত গতি, এবং যেখানে বায়ু সর্ব্বদাই নিয়মে প্রবাহিত হয়, উভয়ত্রই চিরকাল বর্ষা হইয়া থাকে। ়ই সকল স্থানে এত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় যে কখন ়খন সমুদ্রজলের উপরিভাগেও মিষ্ট অর্থাৎ অলবণ জল পাওয়া ায়। নূতন মহাদ্বীপে ব্রাজিল, গায়েনা, মধ্য আমেরিকা, মেক্-

নিকো উপসাগরের উপকূল প্রভৃতি স্থানে বার মাস সমানভাবে বর্ষা হয়, আর পুরাতন মহাদ্বীপের অন্তর্গত গিনি, সেনিগাম্বিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী প্রভৃতি স্থান চিরকাল বর্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। খসিয়া পর্ব্বতে প্রতিবৎসর প্রায় ৬০০ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়, এবং কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে।

নির্ব্বর্ষ দেশ।—যেমন কোন কোন দেশে চিরকালই বর্ষা হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার পৃথিবীর মধ্যে এরূপ দেশ অনেক আছে যেখানে কোন কালেই বর্ষা হয় না। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে কর্কট ক্রান্তির সন্নিহিত বহুদূরব্যাপী স্থানে একবারে বিন্দুপাত হয় না। এই নির্বর্ষ প্রদেশ উক্ত স্থানে সমগ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া উহার কটিবন্ধস্বরূপ রহিয়াছে, কেবল যে স্থানে হিমালয় ও হিন্দুকুস উভয় পর্ব্বতের সংযোগস্থল তথায় কিয়ৎ পরিমাণে বর্ষা দেখা যায়। এই কটিবন্ধে আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকোর মালভূমি, গোয়াটিমালা, কালিফর্ণিয়া, এবং প্রাচীন মহাদ্বীপের অন্তর্গত সাহারা মরুভূমি, ইজিপ্ট, আরব, পারস্য, বেলুচিস্তান, গোবি মরুভূমি, তিব্বৎ ও মোঙ্গোলিয়ার মালভূমি প্রভৃতি অনেক গুলি দেশ আছে। এই সকল দেশের পরিমাণফল প্রায় ৫$\frac{1}{2}$ কোটি বর্গ মাইল হইবে। বিষুবরেখার দক্ষিণে পেরু ও বলিবিয়ার অন্তর্গত আটাকামা মরুভূমিতে কখনই বৃষ্টি হয় না। উল্লিখিত নির্বর্ষ প্রদেশসমূহের মধ্যে কোন কোনটীতে কখনই বিন্দুপাত পর্য্যন্ত হয় না, কোন কোনটীতে ১০০ বৎসরের মধ্যে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিন চারিবার বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের অধিবাসীরা বর্ষা বিষয়ে এতদূর অনভ্যস্ত যে ১০০ বৎসরের মধ্যে এক আধবার দুই চারি ফোটা বৃষ্টি হইলে উহা পুরাবৃত্তে

কটী অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হয়। পেরুদেশের সন্নি-
ত উপকূলে সাগর হইতে যে আর্দ্রবায়ু প্রবাহিত হয়, আণ্ডিস
র্বতের উপরে উহা শীতল হওয়াতে উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্প
হইয়া পতিত হয়, সুতরাং পেরুতে যে বায়ু পৌঁছে উহা সম্পূর্ণ-
পে শুষ্ক ও জলবিহীন হয়, অতএব তথায় আর বৃষ্টির সম্ভাবনা
কে না। সাহারা প্রভৃতি মরু ভূমিতে কিছুমাত্র জল বা বৃক্ষ
ই, সুতরাং উহার উপরিস্থ বায়ু বালুকারাশির উত্তাপে অত্যন্ত
হইয়া উঠে ও উহাতে অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত যে কিছু
থাকে তাহা শুকাইয়া যায়, আর নিম্নে জলবিন্দু না থাকাতে
ন বাষ্প উঠিতে পারে না, সুতরাং এই সকল স্থানে বিন্দুপাত
য় হয় না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নির্বর্ষ দেশগুলি প্রায়ই
র্বতের উপরিস্থ মালভূমি। মালভূমি সমূহের অভিমুখে যে বায়ু
বাহিত হয়, পর্ব্বতের শীতলপার্শ্ব দিয়া উঠিবার সময় উহার সমু-
বাষ্পই বৃষ্টিরূপে ব্যয়িত হইয়া যায়, সুতরাং যে বায়ু পরিশেষে
চ মালভূমির উপর উত্থিত হয় উহাতে আর কিছুমাত্র আর্দ্রতা
কে না এবং এই জন্যই এই সকল স্থানে প্রায়ই বৃষ্টি হইতে
খা যায় না।

বৃষ্টির জল প্রায় নির্ম্মল, ইহার সহিত অন্য পদার্থ মিশ্রিত না
লে উহা প্রায় বিশুদ্ধভাবে পতিত হইত। কিন্তু বায়ুর সহিত
াকাশে যে অশেষবিধ অণুপরিমাণ পদার্থ নিরন্তর উড্ডীয়মান
ইতেছে, উহার অধিকাংশই বৃষ্টির জলে মিশ্রিত হইয়া ভূতলে
তিত হয় এবং এই প্রকারে বৃষ্টি দ্বারা বায়ু ধৌত ও পরিষ্কৃত
ইয়া থাকে। লবণ অঙ্গার এমোনিয়া ও প্রাণিজ নানাবিধ দ্রব্য
ষ্টির সহিত ভূতলে পতিত হয়। বৃষ্টি দ্বারা আমাদের অশেষ
পকার সাধিত হয়, বৃষ্টি দ্বারা তৃণশস্যাদি উৎপন্ন হয় এবং উহা

দ্বারা সমুদয় জীবজন্তু প্রাণধারণ করে। বৃষ্টি না হইলে সমুদয় উদ্ভিজ্জ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং প্রাণিসমূহ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। যদি কোথাও নিয়মিত সময়ে আবশ্যকমত বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া থাকে। এবৎসর মান্দ্রাজ প্রদেশে যেরূপ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, কেবল বৃষ্টি না হওয়াই উহার একমাত্র কারণ। যে বায়ু আমাদের জীবনধারণের পক্ষে মূলীভূত, বৃষ্টি দ্বারা উহাও পরিষ্কৃত হইয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী হয়।

কোন্ দেশে কত পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হয় তাহা নির্ণয় করিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদ্বারা কোন্ স্থানে কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, তাহা অনায়াসেই স্থির করিতে পারা যায়। এত ইঞ্চি পরিমাণ জল হইয়াছে বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে যেস্থানে ঐ জল পতিত হইয়াছে মৃত্তিকাকর্তৃক শোষণ, নদীতে পতন প্রভৃতি কারণে উক্ত জল স্থানান্তরিত না হইয়া যদি ঐ স্থানেই অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে উক্ত স্থান এত ইঞ্চি গভীর জলে আচ্ছাদিত হইত। নিম্নে কতিপয় স্থান ও তাহাদের বাৎসরিক বৃষ্টিপরিমাণের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

স্থানের নাম।	বার্ষিক বৃষ্টির গড়।	
চিরাপুঞ্জী	৫০০	ইঞ্চি।
আফগানিস্তান	১৫০	,,
দার্জিলিং [দুর্জয়লিঙ্গ]	১২৫	,,
বোম্বাই	৮২	,,
কলিকাতা	৮০	,,
মান্দ্রাজ	৪৮	,,
কাশী	৪৩	,,

স্থানের নাম	বার্ষিক বৃষ্টির গড়।	
দিল্লী	২৩	,,
রোম	৩৮	,,
লিবরপুল	২৮	,,
লণ্ডন	২৩	,,
প্যারিস	২১	,,
সেণ্টপিটর্স বর্গ	১৯	,,
সেণ্ট ডোমিঙ্গো দ্বীপ	১১০	,,
গ্রাণেডা দ্বীপ	১২২	,,

তুষার, করকা, বরফ ও চিরহিমানীরেখা।——উষ্ণ বায়ু শীতল হইলে উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্পসমুহ শীতল হইয়া ঘনীভূত হয়, এবং কুজ্ঝটিকা, মেঘ, শিশির, বৃষ্টি ও বরফ প্রভৃতি নানাবিধ আকারে পরিণত হইয়া পুনর্ব্বার ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। শৈত্যবশতঃ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া থাকে। এই শৈত্যের আধিক্য বা ন্যূনতা অনুসারে ঘনীভূত বাষ্পের ভিন্ন ভিন্ন আকার হইয়া থাকে। যেরূপ শৈত্যদ্বারা কুজ্ঝটিকা ও মেঘের উৎপত্তি হয়, বায়ুরাশিতে তদপেক্ষা অধিক শৈত্য-সংযোগ হইলে শিশির ও বৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ মেঘ শীতলতর বায়ুর সহিত সংঘর্ষে ঘনীভূত ও অধিক ভারি হইয়া বৃষ্টির আকারে পরিণত হয়। আবার ইহা অপেক্ষা অধিক শৈত্য হইলে বৃষ্টির জল জমিয়া গিয়া বরফ হইয়া যায়, ফলতঃ জল ভূপৃষ্ঠেই হউক, সাগরগর্ভেই হউক, বা আকাশেই হউক, যেখানে অবস্থিত হউক না কেন, অতিশয় শীতল হইলেই ঘনীভূত ও কঠিন হইয়া বরফরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সচরাচর ফারনীট-নির্ম্মিত তাপমানযন্ত্রের পারদস্তম্ভ ৩২ ডিগ্রীতে অবস্থিত হইলে

যেরূপ শৈত্যের পরিচায়ক হয়, তাহা দ্বারা জল জমিয়া বরফ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেখানে জল আছে তথাকার তাপমান ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অবনত হইলে তত্রত্য জল আর দ্রব ও তরল থাকিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব ও সাগরপৃষ্ঠ হইতে উন্নতি এই বিষয় দুইটী কোন স্থানের তাপমাননির্দ্ধারণের প্রধান কারণ। যে স্থান বিষুবরেখা হইতে যত দূর, অথবা যে স্থান সাগরপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চ, তথায় তাপমানের তদনুরূপ তারতম্য দেখা যায়। বিষুবরেখা হইতে মেরুর দিকে অগ্রসর হইলে তাপমান ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিলেও তাপমানের হ্রাস হয়। মেরুদ্বয়ের সন্নিহিত প্রদেশসমূহের তাপমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলিয়া উহা চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন। মেরুদ্বয়ের সন্নিহিত প্রদেশে উষ্ণতা ৩২ ডিগ্রী তাপাংশ অপেক্ষা অনেক ন্যূন হয়, তত্রত্য কোন কোন স্থানে উহা গ্রীষ্মকালেও ঐ সংখ্যা অতিক্রম করে না, সুতরাং এই সকল স্থানে তরল জল দৃষ্টিগোচর হওয়া সুকঠিন, সমস্ত জল বারমাসই বরফরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তথায় শিশির ও বৃষ্টির পরিবর্ত্তে বরফ পড়িয়া থাকে। যেসকল স্থানে গ্রীষ্মকালে যথানিয়মে গ্রীষ্ম হইয়া শীতকালে বায়ু ৩২ ডিগ্রী অপেক্ষা শীতল হয়, তথায় জল শীতকালে বরফরূপে পরিণত ও গ্রীষ্মকালে আবার দ্রবীভূত হয়। সমমণ্ডলের কোন কোন স্থানে ও হিমমণ্ডলের সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। সমমণ্ডলের কোন কোন স্থানে বৎসরের মধ্যে ২।৪ দিন মাত্র শীতের আতিশয্যবশতঃ জল জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে শীত অল্প বলিয়া জল জমিতে পারে না; কলিকাতায় অত্যন্ত শীতের সময়েও তাপমান ৫০ডিগ্রীর নীচে নামে না। সুতরাং তথায়

নই জল জমিতে পারে না। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলের উচ্চ পর্ব্বতে তে থাকিলে ক্রমশঃ সমশীতোষ্ণমণ্ডল ও হিমমণ্ডল উভয়েরই চিহ্ন হয়। আবার ইংলণ্ড উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশ বিষুব-া হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া শীতকালে উহাদের মান এত কমিয়া যায়, যে নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠে স্থিত তাবৎ জলই জমিয়া বরফ হইয়া যায়। বিষুবরেখার টে অত্যন্ত উত্তাপ বলিয়া জল জমিতে পারে না, কিন্তু সকল স্থানেও সাগরপৃষ্ঠ হইতে অধিক উর্দ্ধে উঠিলে শীত ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত বিলক্ষণ দেশে অবস্থিত, কিন্তু উল্লিখিত কারণে উহার শিরোভাগ কালই নীহার ও বরফে আচ্ছন্ন থাকে। বায়ুর সহিত যে ল জলীয় বাষ্প মিশ্রিত আছে, উহা কখন কখন বায়ু অত্যন্ত তল হইলে জমিয়া যায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফকণের ন্যায় ভূতলে তিত হইতে থাকে। শীতের সময় এইরূপ হইলে উহাকে নীহার হি। বৃষ্টির সময় হইলে শিলাবৃষ্টি বা হিমশিলা কহে। আর । সময় প্রবল বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া নীহারের কারপরিবর্ত্ত হয় ও উহা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ুর মধ্য দিয়া ড়িবার সময় অর্দ্ধগলিত হয়, তখন উহাকে নীহারকণ হে। ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উর্দ্ধে উঠা যায় ততই বায়ুর তাপমান মশঃ অল্প হইতে থাকে, সুতরাং যতদূর উর্দ্ধে উঠিলে তাপমান ২ ডিগ্রী হওয়াতে জল জমিয়া যায়, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে অধিক র্দ্ধে হইবেনা। এরূপ একটি রেখা কল্পনা করা যাইতে রে, যদ্দ্বারা কোন্ দেশে ভূপৃষ্ঠ হইতে কত উর্দ্ধে উঠিলে জল মিয়া বরফ হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্যই অক্ষ-খার প্রভেদ অর্থাৎ বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব, বায়ুর গতি, ভূ-

শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু এই সকল কারণে উল্লিখিত রেখা কোথাও অধিক উচ্চে, কোথাও বা তদপেক্ষা নীচে অবস্থিত হইবে, এবং একস্থানেও কখন বা উচ্চ কখন অপেক্ষাকৃত নীচ হইয়া থাকে। এইরূপ কল্পিত রেখাকে চিরনীহাররেখা কহে। ইহার উপরে জল থাকিলে উহা চিরকালের জন্যই জমিয়া বরফ হইবে, কখনই দ্রব হইবে না, পর্ব্বতাদির চিরনীহারসীমার নীচে যে বরফ জমিয়া থাকে, গ্রীষ্মের সময় সূর্য্যের উত্তাপে উহা গলিত হইয়া বেগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, কখন কখন বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড ও এই রূপে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু চিরনীহারসীমার উপরিস্থ-স্থান চিরকালই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এই নীহারসীমা ইংলণ্ডদেশে শীতের সময় একবারে ভূমিস্পর্শ করে, সুতরাং নদী পুষ্করিণী প্রভৃতির সমুদয় জল বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায় ও নিরন্তর আকাশ হইতে বরফ পতিত হইতে থাকে, আবার গ্রীষ্মকালে উহা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, ঐ সময় ১½ মাইলের নীচে আর জল জমিয়া বরফ হয় না। ভারতবর্ষের চিরনীহারসীমা ভূমি হইতে তিন মাইল ঊর্দ্ধে অবস্থিত। বিষুবরেখার সন্নিহিত স্থানে নীহারসীমা সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধে অবস্থিত ও মেরুদ্বয়ের সন্নিহিত স্থানে উহা সর্ব্বদাই ভূমিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানেই নীহার পতিত হয় না। যেখানে শীতের এতদূর প্রাবল্য হয় যে, নীহারসীমা ভূপৃষ্ঠের অব্যবহিত উপরে বা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানেই বরফ পড়িতে পারে। ভূভাগের যে অংশ চিরনীহারসীমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তথায় চিরকালই নীহারপাত হইয়া থাকে। এই প্রযুক্ত হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশ চিরকালই তুষারাচ্ছন্ন থাকে। এই পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে সাগরতল হইতে ১৬০০০ ফুট ঊর্দ্ধে

বরফ দৃষ্ট হয়, উহার নিম্নে বরফ নাই। কিন্তু উত্তরাংশের নীহারসীমা ইহা অপেক্ষা ১০০০।১২০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। উল্লিখিত কারণবশতঃ সকল পর্ব্বতের সর্ব্বাংশ মনুষ্যের বাসোপযোগী হইতে পারে না। হিমমণ্ডলস্থ কোন পর্ব্বতেই মনুষ্যের [illegible] সেথায় মনুষ্য জীবনধারণ করিতে পারে না। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৬৫০০ ফুটের উর্দ্ধে মনুষ্যের বসতি নাই. [illegible] পর্ব্বতের উপরিস্থ সেণ্টবার্ণার্ড নামক স্থানে একটী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশালা ও মঠ আছে, উহা ৮০০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। গ্রীষ্মমণ্ডলে ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধ প্রদেশেও মনুষ্যের গমনাগমন ও বসতি আছে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পটসি নগর ১৩,৩৫০ ফুট উচ্চ। আমাদের হিমালয়শিখরে যে সকল বসতি আছে, উহাও ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। হুমবোল্ড নামক প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ১৯,১৯২ ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, আর জেরার্ড ও বুনিঙ্গণ্ট নামক দুই জন সাহেব হিমালয় পর্ব্বতে যথাক্রমে ১৯৩৩৬ ও ১৯৬২৬ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। ইহার উর্দ্ধে কখনই মনুষ্যের পদচিহ্ন পড়ে নাই।

বরফরাশি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের সমবায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক খণ্ডের আকার ষট্‌কোণ নক্ষত্রের ন্যায়। অদ্যাবধি সর্ব্বসমেত ১০০০ প্রকার তুষারনক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমুদয় পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। বরফখণ্ড সমূহ দেখিতে অতি সুন্দর ও সমানাকার। বরফ শ্বেতবর্ণ। কিন্তু এক এক খণ্ড বরফ স্বতন্ত্ররূপে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা বহুকোণ কাচের ন্যায় সূর্য্যকিরণের সম্পাতে নানাবর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ সকল প্রকার বর্ণের একত্র সম্পাতে বরফরাশির বর্ণ শুক্ল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে অত্যন্ত বরফ পড়িয়া থাকে। সমুদয় উদ্ভিজ্জ বরফের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইরূপ বরফের নিম্নে থাকিয়া ও উদ্ভিজ্জসমূহের বিনাশ না হইয়া বরং রক্ষা হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের উত্তাপে বরফ গলিয়া স্থানান্তরিত হইলে আবৃত উদ্ভিজ্জসমূহ পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ এই যে ভূমি বরফরাশিদ্বারা আবৃত থাকাতে উহার নিম্ন হইতে উত্তাপ বহির্গত হইয়া যাইতে পারে না। আবার জলের উপর কিয়দংশ বরফ পড়াতে নিম্নস্থ জলের উষ্ণতা রক্ষিত হয়, এবং মৎস্যাদি জীব জন্তু স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করে। বরফ জল অপেক্ষা লঘু, সুতরাং জলের উপর অনায়াসে ভাসিতে থাকে। উপরিভাগ বরফদ্বারা আচ্ছন্ন না হইলে ঘোরতর শীতে উহাদের প্রাণবিনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বরফের ভিতর প্রচুর পরিমাণে বায়ু থাকাতে উহাদ্বারা উত্তাপ নির্গত হইয়া যাইতে পারে না। ফলতঃ বরফদ্বারা আমাদের নানাবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

চিরনীহারসীমার উপরে তুষারপাত হইলে উহা জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয়, এবং বরফরূপে পরিণত হইতে থাকে। কখন কখন বৃহৎ বৃহৎ বরফখণ্ড স্খলিত হইয়া বেগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, এবং জীবজন্তুর প্রাণহানি করে। কখন কখন উহা আস্তে আস্তে পতিত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ গলিয়া যায়। আবার কখন বৃহৎ বৃহৎ বরফরাশি পর্ব্বতাদির উচ্চশিখর হইতে পতিত হইয়া সমুদ্রের উপর ভাসিতে থাকে। জাহাজ প্রভৃতি এই বরফরাশির প্রতিঘাতে অনেক সময় ভগ্ন হয়, বা ডুবিয়া যায়। উত্তর মহাসাগরে সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বরফরাশির পরিমাণ ৫।৬ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত

হইয়া থাকে, এবং উহা সচরাচর ২।৩ শত হাত উচ্চ হইয়া থাকে, এবং উহার প্রায় ৯ গুণ সাগরের গর্ভে ডুবিয়া থাকে। গ্রীণলণ্ডের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের অনেক স্থান ভগ্ন ও বন্ধুর। সেই সকল স্থান হইতে বরফরাশি স্খলিত হইয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নিউফাউণ্ডলণ্ড পর্য্যন্ত উপনীত হয়। দক্ষিণ মহাসাগর হইতে এইরূপ ভাসমান বরফরাশি কখন কখন উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। হিমময় সাগরে তিমি মৎস্য ও উহার নিকটে শ্বেত ভল্লুক বাস করে। ইংলণ্ড ফ্রান্স হলণ্ড ও আমেরিকার বহুসংখ্যক জাহাজ তিমি ধরিবার জন্য সর্ব্বদাই উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

নীহারকণা। বরফ পড়িবার সময় যখন অত্যন্ত প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়, তৎকালে উহার বেগে বরফখণ্ড সকল চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ুরাশি ভেদ করিয়া পড়িবার সময় উহা কিয়ৎপরিমাণে গলিতে থাকে। এইরূপে অর্দ্ধগলিত অবস্থায় যে তুষারসমূহ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাকে বরফকণা বা স্লীট কহে।

হিমশিলা, শিলাবৃষ্টি। বৃষ্টি পড়িবার সময় অতিশয় শীতল বায়ুপ্রবাহের সহিত সংঘর্ষে ও আকাশসঞ্চারী বিদ্যুতের প্রভাবে বৃষ্টির জলবিন্দুসমূহ কখন কখন জমাট বাঁধিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ইহাকেই হিমশিলা ও শিলাবৃষ্টি কহে। ইহাতে তুষার ও বরফ উভয় পদার্থই মিশ্রিত থাকে। হিমশিলা অস্বচ্ছ ও নিপ্রভ পদার্থ। ইহা শুভ্রবর্ণ, ও ইহার আকারের নির্ণয় নাই। ইহা গোলাকার ত্রিকোণ প্রভৃতি নানাবিধ আকারের হইয়া থাকে। পেঁয়াজের কোসার ন্যায় উহার গাত্র ক্রমান্বয়ে এক স্তবক বরফ

ও এক স্তবক হিম দ্বারা আবৃত। কখন কখন শিলাখণ্ড সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ বিন্দুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। উহার আক প্রায় মটরের ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু কখন কখন উহা ডিম্বের ন্য বড় হইয়া থাকে, আবার কখন বা অনেকগুলি পৃথক পৃথ খণ্ডের সংযোগে বড় বড় শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে, শীতকালে প্রায়ই হ না, এবং গ্রীষ্মকালেও অতিশয় গ্রীষ্মের সময় অধিক শিলাপা হয়। সমমণ্ডলের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে শিলাবৃষ্টির যেরূ প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সেরূপ নহে। সর্ব্বত্রই রা অপেক্ষা দিবাভাগে অধিক শিল পড়িয়া থাকে। শিলাবৃষ্টি দ্বা অনেক সময় ঘোরতর উপদ্রব ও ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা দ্বা বৃক্ষলতাদি নষ্ট হইয়া যায়, আম্রাদি ফলের মুকুলের উপর শি বৃষ্টি হইলে উহা একবারে বিনষ্ট হয়, ফলের উপর শিলাপা হইলে উহা হয় একবারে বিনষ্ট হয়, নতুবা আর বাড়িতে পা না। অনেক সময় গৃহের ছাদ একবারে বিনষ্ট হয়, জীবজন্তুর প্রাণহানি হইয়া থাকে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে অ ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল।

বায়ুর গতি ও প্রবাহ।

বায়ু সর্ব্বদাই চঞ্চল, এক মুহূর্ত্তও স্থিরভাবে থাকিতে পা না। এই জন্য সংস্কৃতভাষায় বায়ুকে সদাগতি কহে। যথ গ্রীষ্মকালের নিদারুণ উত্তাপে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হইতে থাকে কুত্রাপি বায়ুর সঞ্চার অনুভূত হয় না, বৃক্ষপত্রসকল চিত্রাপি তের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকে, সমগ্র বিশ্ব গতিশূন্য নিস্তব্ধ বলি

বোধ হয়, এবং আমরা তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে থাকি "অদ্য গাছের একটী পাতাও নড়িতেছে না," তৎকালেও বায়ুরাশি প্রকৃতপ্রস্তাবে নিশ্চল থাকে না। বৃক্ষপত্র কখনই নিবাতনিষ্কম্প হইতে পারে না। উল্লিখিত সময়েও বায়ু ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে। ফলতঃ আমরা বুঝিতে পারি আর নাই পারি, আমাদের পরিতস্থ বায়ুরাশি নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে, কখনই উহার বিশ্রাম নাই। যখন বায়ুর মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতে থাকে, অথবা প্রবল ঝটিকা বা ভীষণ বাত্যাবর্ত্ত প্রবাহিত হয়, তখনই আমরা বায়ুর গতি অনুভব করি। অন্য সময় উহা নিশ্চল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু কি কারণে বায়ু নিশ্চল না থাকিয়া অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে তাহা সুচারুরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। জল প্রভৃতি যাবতীয় তরল পদার্থের একটী প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এই যে উহার উপরিভাগ সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকে। যে কোন কারণে উহার এক অংশ নিম্ন হইয়া সমোচ্চতার ব্যাঘাত ঘটিলে চতুষ্পার্শ্ব হইতে উহার অন্যান্য অংশ আসিয়া ঐ সমোচ্চতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বায়ু অতিশয় তরল পদার্থ, সুতরাং কোন কারণে উহার কিয়দংশ স্থানভ্রষ্ট হইলেই চতুষ্পার্শ্ব হইতে উহার অন্যান্য অংশ অগ্রসর হইয়া ঐ শূন্য স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপবশতঃ বায়ু অনুক্ষণ স্থানভ্রষ্ট হইতেছে, এবং এই জন্যই বায়ু এক মুহূর্ত্তও নিশ্চল না থাকিয়া সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে।

পৃথিবীর সকল স্থানে এবং এক স্থানেও সকল সময়ে সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে পতিত হয় না। কোন স্থানে উহা অপেক্ষাকৃত অধিক, আর কোথাও বা অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপ পতিত হয়।

আবার এক স্থানেও কোন সময়ে অধিক, কোন সময়ে অল্প সূর্য্যোত্তাপ পতিত হইয়া থাকে। সূর্য্যোত্তাপের আধিক্য হইলে বায়ু স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক তরল হইয়া যায়। কারণ কি কঠিন কি তরল, সকল দ্রব্যই উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত ও প্রসারিত এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়। এই কারণে যখন যে স্থানের বায়ু উহার পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা অধিক তরল হয়, তখনই উহার ভার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর ভার পূর্ব্বের ন্যায় থাকে। ভার কমিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইলে বায়ু আর পূর্ব্বস্থানে থাকিতে পারে না, ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবার শীতল না হয় ততক্ষণ ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং এইরূপে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে কোন কারণবশতঃ শীতল হইলে পুনর্ব্বার অধোগামী হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন বায়ুর ভারলাঘব হইবার আরও একটী কারণ আছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বায়ুর সহিত যতই জলীয় বাষ্প মিশ্রিত হইতে থাকে, ততই উহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে এবং ভার কমিয়া যায়। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্যোত্তাপের তারতম্য ও জলীয় বাষ্পের ন্যূনাতিরেক এই দুই কারণে বায়ুর ভার কমিয়া যায় বা বাড়িয়া উঠে, কখনই একরূপ থাকিতে পারে না। যখন যে স্থানের বায়ুর ভার কমিয়া যায়, তখনই উহা ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং উহার পূর্ব্ব স্থান শূন্য হইয়া যায়, পূর্ব্বস্থান শূন্য হইলেই পরিতোবর্ত্তী বায়ুপ্রবাহ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উহা অবরোধ করে। কখন কখন এরূপ ঘটে যে চতুষ্পার্শ্বের বায়ুরাশি উল্লিখিত শূন্য স্থানে উপস্থিত হইলে উত্তাপবশতঃ লঘুতর হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুরাশি পুনর্ব্বার ঐ স্থান অধি-

কার্য্যার্থ অগ্রসর হয়। এইরূপে কোন কোন স্থানে অনুক্ষণ বায়ুর গতি ও প্রবল প্রবাহ লক্ষিত হইয়া থাকে।

কোন স্থান উক্ত কারণে বায়ুশূন্য হইলে উহার চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশি ঐ স্থান অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে, এবং ইহাই বায়ুর অস্থিরতার প্রতি কারণ ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে দেখা যাউক বায়ুর গতি কিরূপ পথে হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর যে পরিমাণ বায়ুর গতি অনুভব করিয়া থাকি, উহা অতি অল্পমাত্র স্থান অবরোধ করিয়া থাকে। দূরস্থ বায়ু কিরূপ গতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মনে কর চতুর্দ্দিকে ১০ ক্রোশ স্থান লইয়া প্রবল-বেগে বায়ু বহিতেছে, আমরা ঐ স্থানের এক পার্শ্বে রহিয়াছি। সুতরাং প্রবলবেগে বায়ু বহিবার সময় আমাদের বোধ হয় যে বায়ুপ্রবাহ ঠিক ঋজুভাবে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা উহার গতিপথের কিয়দংশ মাত্র প্রত্যক্ষ করি বলিয়া আমাদের ওরূপ বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা হয় না। বায়ু একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বায়ুর ভারলাঘব হইলে উহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং বায়ুর অভাববশতঃ উহার পূর্ব্বস্থান শূন্য হইয়া পড়ে, আবার বায়ুর চাপ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিলে উহার ভারও বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে উহা অপেক্ষা অধিক ভারি বায়ুস্তর নিচে নামিয়া পড়ে ও নিম্নমুখ দিয়া শূন্য স্থানে প্রবেশ করিতে থাকে। অত-এব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়ুরাশি ঋজুভাবে প্রবাহিত না হইয়া শূন্যের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার পথে ঘুরিতে থাকে এবং এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া শূন্যস্থান অধিকার

করে। বায়ু উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার সময়েও ম[illegible]ণ্ডলাক পথে উঠিয়া থাকে। এই আভ্যন্তরিক মণ্ডলের নাম বাতাব আর বাতাবর্ত্তের স্থান অধিকার করিবার জন্য যে বায়ু [illegible] হইতে মণ্ডলাকারে অগ্রসর হয় উহাকে বিপরীতাবর্ত্ত কে ঘড়ির স্প্রিং কসিবার সময় উহার যেরূপ গতি হয়, তা আভ্যন্তরিক আবর্ত্তের অনুরূপ। আর স্প্রিং খুলিবার স[illegible] উহার যেরূপ গতি হয়, তাহা বাহ্য আবর্ত্তের গতির অনুরূ[illegible] বাতাবর্ত্তের বেগ বাহ্য আবর্ত্ত অপেক্ষা অনেক অধিক। বাতাব পরিধির অন্তর্গত স্থানসমূহে ঘোরতর ঝটিকা প্রবাহিত হ কিন্তু উহার বাহিরে প্রায়ই বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চার হইয়া থাকে উত্তপ্ত হইলে বায়ু অধিকতর তরল হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, অ পার্শ্বস্থ বায়ু উহার স্থান অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হই[illegible] থাকে। যে বায়ু এইরূপে অগ্রসর হয়, উহা অবশ্যই ভা বশতঃ নীচে নামিতে থাকে, এবং শূন্য স্থানের নিম্নস্থ মুখ দি ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমগ্র শূন্য অবরোধ করে। অতএব স্পষ্টই প্রতী মান হইতেছে যে, উক্তপ্রকারে সর্ব্বদাই বায়ুর কিয়দংশ উে উঠিতেছে ও কিয়দংশ নিম্নে নামিতেছে, আর উহাদের উভয়ে গতিই মণ্ডলাকার পথে হইয়া থাকে। আমরা ভূপৃষ্ঠের একপা[illegible] থাকি বলিয়া উপরে বায়ুর কিরূপ গতি হইতেছে, তাহা সবিশে অনুভব করিতে পারি না, আমাদের বোধ হয় বায়ু ঋজুভাবে আমাদের দিকে আগমন করিতেছে। কিন্তু কখন কখন অ[illegible] অল্পমাত্র স্থান অবরোধ করিয়া বায়ু মণ্ডলাকার পথে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষুদ্র বাতাবর্ত্তের সময় ধূলিরাশি স্তম্ভের ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতেছে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই। আমরা যে বায়ু ঋজুভাবে অগ্রসর হইতেছে বোধ করি উহা

গ ও ঊর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী স্তম্ভদ্বয়ের বেগবশতঃ উৎপন্ন হইয়া কে। নিম্নগামী স্তম্ভের ভার অধিক হইলে উহা অধিক গে নামিতে থাকে, ও অল্প হইলে অল্প বেগে নামিতে থাকে। লতঃ ঊর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী এই উভয় স্তম্ভের মধ্যে নিম্নগামী স্তম্ভের বেগ হইতে ঊর্দ্ধগামী স্তম্ভের বেগ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আমরা বায়ুর বেগ বলিয়া অনুভব করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন নিম্নগ ও ঊর্দ্ধগ উভয় মণ্ডলের কেন্দ্র যদি পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমরা বায়ুর বেগ অতিশয় প্রবল অনুভব করি, আর যদি কেন্দ্রদ্বয় পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে বেগ অল্পই অনুভূত হইয়া থাকে।

উত্তাপবশতঃ বায়ুরাশি লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে ও পার্শ্বস্থ বায়ু উহার স্থান অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে, ইহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। যদি মাঠের মধ্যে শুষ্ক পাতালতা পোড়াইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়, তাহা হইলে অনায়াসে প্রত্যক্ষ হয় যে উহার ঊর্দ্ধস্থ বায়ু উপরে উঠিতেছে ও উহার সহিত ধূম ও ভস্ম প্রভৃতি ও ঊর্দ্ধগামী হইতেছে। আবার কেবল ইহাই নহে, যে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু অগ্রসর হইয়া সেই অগ্নির সহিত মিশিতে থাকে। যদি অগ্নির অদূরে শুষ্ক পত্রাদি পতিত থাকে, তাহা হইলে উহা উড়িয়া আসিয়া অগ্নির উপর পতিত হয়। আর ঘরে আগুন লাগিলেও অবিকল এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। যদি নিম্নস্থ বায়ু অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে গৃহদাহের সময় শীঘ্র শীঘ্র অগ্নির প্রসরবৃদ্ধি হইতে পারিত না। এইরূপ আবার গৃহের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেও দ্বার গবাক্ষ প্রভৃতি দ্বারা চারিপার্শ্বের বায়ু উক্ত অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, যদি

গৃহের দ্বার গবাক্ষ প্রভৃতি সমুদয় রুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে অগ্নি ভালরূপ জ্বলিতে পারে না, এবং বায়ুপ্রবাহ কোন প্রকারে একবারে বন্ধ করিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্যোত্তাপবশতই বায়ুর ঊর্দ্ধ ও নিম্ন দুই প্রকার গতি হইয়া থাকে।

অগ্নি দ্বারা বায়ু উত্তপ্ত হইলে অল্প স্থান ব্যাপিয়া উল্লিখিত ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সূর্য্য একটী প্রকাণ্ড অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ডবিশেষ। উহার উত্তাপে সমস্ত পৃথিবী উষ্ণ হইয়া উঠে সূর্য্যের উত্তাপে একবারে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান অগ্নির পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা অনেক অধিক উষ্ণ হইতে পারে, সুতরাং এরূপ হইলে উক্ত উষ্ণ স্থান ও উহার চারি পার্শ্ব এই উভয় স্থানে বায়ুর প্রবল সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়। দিবসে সূর্য্যের উত্তাপে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।

সমুদ্রের উপকূল ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে এই ব্যাপার যেরূপ স্পষ্ট অনুভূত হয়, অন্য কুত্রাপি সেরূপ হয় না। দিবসে সূর্য্যের কিরণে স্থলভাগ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। এই জন্য সমুদ্রের উপকূলে সাগরজল অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থলভাগ অধিক উষ্ণ হইয়া থাকে, অতএব স্থলভাগের উপরিস্থ বায়ু সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হইয়া উঠে। এই প্রকারে উভয় বায়ুর তাপমান ও ভারের তারতম্য হওয়াতে উভয়ই স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়। স্থলভাগের বায়ু অধিক উষ্ণ হওয়াতে অধিক তরল হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং সমুদ্রের বায়ু অপেক্ষাকৃত অল্প উষ্ণ সুতরাং অল্প তরল বলিয়া ঐ শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হয়। বেলা ৯টার সময় সমুদ্র হইতে অল্প অল্প বায়ু উপকূলের অভিমুখে বহিতে থাকে, ক্রমে যতই

সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতে থাকে, ততই উক্ত বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হয়, এবং সমস্ত দিন এইরূপ হইয়া সূর্য্যাস্তের সময় যখন স্থলভাগের উত্তাপ অল্প হওয়াতে তাপমান কমিয়া যায়, তখন উহার নিবৃত্তি হয়। ইহাকেই সাগরবায়ু কহে। আবার রাত্রিকালে স্থলভাগের উত্তাপ শীঘ্র শীঘ্র চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে স্থলভাগ অতি অল্প সময়েই শীতল হইয়া থাকে ও তথাকার তাপমান কমিয়া যায়। কিন্তু জল যেমন শীঘ্র উষ্ণও হয় না, তেমনিই একবার উষ্ণ হইলে আর শীঘ্র শীতল হইতে পারে না, সুতরাং রাত্রিকালে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্থলভাগ অপেক্ষা উষ্ণ থাকে। এই কারণে স্থলভাগে বায়ুর তাপমান কমিয়া যাওয়াতে উহার ভার অধিক হইয়া উঠে, আর সমুদ্রের বায়ু অধিক উষ্ণ থাকাতে স্থলের বায়ু অপেক্ষা লঘু হইয়া যায় এবং ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এইজন্য রাত্রিকালে উপকূল হইতে সমুদ্রের দিকে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং রাত্রির সহিত যতই স্থলভাগ অধিক শীতল হয়, ততই উক্ত বায়ুর বেগবৃদ্ধি হইতে থাকে। সমস্ত রাত্রি এইরূপ স্থলবায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে উহার নিবৃত্তি হয়, এবং ক্ষণকাল স্থলভাগ ও জল উভয়ের তাপমান প্রায় সমান থাকাতে কোনদিকেই বায়ুর প্রবল প্রবাহ লক্ষিত হয় না। ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতে বাড়িতে আবার বেলা ৯টার সময় সাগরবায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়।

উত্তাপের ন্যায় বায়ুর অন্তর্গত জলীয় বাষ্পও উহার গতির অতি একটী প্রধান কারণ। পৃথিবীর যে অংশে যখন সূর্য্যোত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তখন তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্প উঠিয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং বায়ুর গতি উৎপাদন

করে। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি এই উভয়ের অন্তর্গত কটিবন্ধে সূর্য্যোত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর এই অংশে বায়ুর ভার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। এইজন্য এইস্থানে বায়ু সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখে উঠিতেছে, এবং উহার স্থান অধিকার করিবার জন্য উভয় কেন্দ্র হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু অনবরত বিষুব রেখার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদি পথিমধ্যে কুত্রাপি কোন কারণে গতির ব্যাঘাত না হইত, তাহা হইলে অনুক্ষণ দক্ষিণ মেরু হইতে উত্তরমুখে ও উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণমুখে বায়ু প্রবাহিত হইয়া বিষুবরেখার নিকট পরস্পর মিলিত হইত। উভয় বিরুদ্ধ বায়ুপ্রবাহের পরস্পর সংঘাতে একটী নূতন প্রবাহ উদ্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিত। কিন্তু স্থলজলের বিশেষপ্রকার সন্নিবেশদ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার কিয়দংশে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বাংশেই এইরূপ নিয়মে বায়ুর গতি হইতে পায় না। যে স্থানে উভয় প্রবাহের পরস্পর বায়ুভারের সঙ্গম হয়, তাহাকে লঘুতম বায়ুভারের কটিবন্ধ কহে। লঘুতম কটিবন্ধ সকল সময় একস্থানে থাকে না। আষাঢ় মাসে উহা কর্কটক্রান্তির নিকটে অবস্থিত থাকে, এবং ক্রমশঃ সূর্য্যের দক্ষিণায়নের সহিত দক্ষিণবাহী হইয়া পৌষমাসে মকরক্রান্তির নিকট উপস্থিত হয়।

সূর্য্যের উত্তাপে বায়ু লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু নিম্নে নামিতে থাকে ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নগ শীতল বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, ও ঊর্দ্ধগ উষ্ণ বায়ু উচ্চ আকাশ দিয়া ঠিক বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপে সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন বা

বাহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে, এবং কোন কটা বিশেষ প্রবাহ প্রবাহিত হইতে দেখিলে আমরা উহার রুদ্ধ প্রবাহ কতদূরে প্রবাহিত হইতেছে তাহা কতক কতক নুমান করিতে পারি। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বায়ুপ্রবাহের বেগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যে বায়ু ঘণ্টায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করে হাকে মৃদুমন্দ বায়ু কহা যায়। ৭ মাইল অবধি ১৪ মাইল র্যন্ত বেগ হইলে বায়ু উচ্চবায়ু শব্দে অভিহিত হয়। এইরূপে তি ঘণ্টায় ২১ হইতে ৪১ মাইল পর্য্যন্ত বেগ হইলে উহাকে চ্চ বায়ু শব্দেই নির্দ্দেশ করা যায়। ঘণ্টায় ৬১ মাইল বেগ ইলে উহাকে বাত্যা কহে। ৮২ মাইল বেগের বায়ুকে ঝটিকা হা যায়, ও ৯১ হইতে ১০০ বা ততোধিক মাইল পর্য্যন্ত বেগ ইলে উহাকে প্রলয়বায়ু কহে।

গতির বিভিন্নতা অনুসারে বায়ুকে সর্ব্বশুদ্ধ তিন শ্রেণীতে ভক্ত করা যায়, যথা নিত্য, সাময়িক, ও অনিত্য বায়ু। যে হার কখন বিরাম নাই, তাহাকে নিত্য বায়ু কহে; যাহা র্দ্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত হয়, তাহার নাম সাময়িক বায়ু; ও হার গতির কিছুই নিয়ম নাই, তাহাকে অনিত্য বায়ু কহে।

নিত্য বায়ু।—নিত্য বায়ু দুই প্রকার, বাণিজ্যবায়ু ও মেরু-য়ু। বিষুবরেখার উভয়দিকে ২৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত মাপিয়া যে ই কাল্পনিক বৃত্ত অঙ্কিত আছে, তাহাদের একের নাম উত্তর । কর্কটক্রান্তি, আর অপরটীর নাম দক্ষিণ বা মকরক্রান্তি। ান্তিদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে গ্রীষ্মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাবল্য লিয়া উহাকে গ্রীষ্মমণ্ডল কহে। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ প্রায় ম্বভাবে পতিত হইয়া থাকে, এই জন্য তথায় সূর্য্যকিরণের তিশয় প্রখরতা ও উত্তাপ। এই কারণবশতঃ তত্রত্য বায়ু

অন্যান্য সকল স্থানের বায়ু অপেক্ষা অধিক উষ্ণ ও তরল, এবং জলীয় বাষ্পও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঐ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। সূর্য্যের উত্তাপ ও জলীয় বাষ্পের আধিক্য হইলে বায়ু অত্যন্ত তরল ও লঘু হইয়া যায়। সুতরাং গ্রীষ্মমণ্ডলে সর্ব্বদাই বায়ু উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। বায়ুস্তম্ভ যত ঊর্দ্ধগামী হয়, ততই উহার আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ উহা অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া যায়। শীতল হইলেই উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্পরাশির কিয়দংশ মেঘাকারে পরিণত হয়, এবং বৃষ্টিস্বরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে থাকে। এই জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলে যেমন অত্যন্ত গ্রীষ্ম ও উত্তাপ অনুভূত হয়, সেইরূপ বর্ষার ও আতিশয্য হইয়া থাকে। এমন কি এই ভূভাগের অন্তর্গত অনেক স্থানে নিরন্তর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়া থাকে। বিষুবরেখার নিকটে উত্তাপের প্রাবল্যবশতঃ তত্রত্য বায়ু তরল হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে বটে, কিন্তু উহা চিরকাল উর্দ্ধগামী থাকে না। উহার উর্দ্ধগমনের সীমা আছে। অনেক দূর উর্দ্ধে উঠিয়া উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্পরাশি বৃষ্টিস্বরূপে বহির্গত হইবার পর উহা আরও অধিক তরল হয়, এবং দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ উত্তরাভিমুখে সুমেরুর দিকে চলিয়া যায়, অপর ভাগ দক্ষিণদিকে কুমেরুর অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। আবার বিষুবরেখাস্থ বায়ু উর্দ্ধগামী হওয়াতে যে স্থান শূন্য হয়, উহা অধিকার করিবার জন্য উভয় কেন্দ্র হইতে বায়ুপ্রবাহ বিষুবরেখার দিকে অনবরত ধাবিত হইতে থাকে। উত্তর মেরুর বায়ু দক্ষিণমুখে ও দক্ষিণ মেরুর বায়ু উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। এই দ্বিবিধ মেরুবায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক গুরু ও শীতল বলিয়া বিষুবরেখাস্থ উর্দ্ধগামী বায়ুর নিম্নভাগ দিয়া ধাবিত হইতে

কে, সুতরাং ইহাই ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অনুভূত হয়। মেরু-য়ের অভিমুখে যে বিষুবরেখাস্থ বায়ু প্রধাবিত হয়, উহা আমরা ায়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কারণ উহা অনেক উর্দ্ধে বাহিত হইয়া থাকে। উর্দ্ধ প্রবাহদ্বয় বিষুবরেখার নিকট পৃষ্ঠ হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু যতই মেরুর দিকে গ্রসর হইতে থাকে, ততই শীতল বায়ুর সহিত সংযোগে মশঃ শীতল ও ভারাক্রান্ত হইয়া নিম্নে নামিতে থাকে, এবং রিশেষে সমশীতোষ্ণমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূতল র্শ করে, ও উহার কিয়দংশ মেরুর অভিমুখে ধাবিত হয়, ার কিয়দংশ আবার বিষুবরেখার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কে। পক্ষান্তরে নিম্নগ প্রবাহদ্বয় মেরু হইতে যতই বিষুব-খার দিকে অগ্রসর হয়, ততই ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া ঠিক রেখার কেট অত্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে র্দ্ধশুদ্ধ চারিটী প্রবাহ সর্ব্বদাই প্রধাবিত হইতেছে, ইহাদের ধ্যে দুইটী প্রবাহ বিষুবরেখার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া র্দ্ধ দিয়া একটী উত্তরমুখে ও একটী দক্ষিণমুখে যথাক্রমে দুই রুর দিকে অগ্রসর হয়, আর দুইটী নিম্নগ প্রবাহ মেরুর নিকট থিত হইয়া একটী দক্ষিণমুখে ও একটী উত্তরমুখে বিষুবরেখার কে অগ্রসর হইতে থাকে। এই চারিটী প্রবাহের কোন ালেই বিশ্রাম নাই বলিয়া উহাদিগকে নিত্য বায়ু কহে। নিত্য য়ুদ্বয়ের মধ্যে যে দুইটী মেরুদ্বয় হইতে উত্তর ও দক্ষিণমুখে ষুবরেখার দিকে অগ্রসর হয়, তাহাদিগকে ইউরোপীয় নাবি-করা বাণিজ্যবায়ু কহে। কারণ উহা দ্বারা অর্ণবপোতাদির তায়াতের পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হওয়াতে বাণিজ্যের ও ীকর্য্য হইয়া থাকে।

উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা আপাততঃ এরূপ বোধ হইতে পারে যে উল্লিখিত চারিটী বায়ুপ্রবাহ ঠিক ঋজুভাবে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তরদিকে একটী প্রবাহ ঠিক উত্তরমুখে উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর হয়, আর একটী উত্তরমেরু হইতে ঠিক দক্ষিণমুখে বিষুবরেখার দিকে আসিতে থাকে, এবং বিষুবরেখার দক্ষিণেও একটী প্রবাহ ঠিক দক্ষিণ-মুখে মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়, আর একটী দক্ষিণ মেরু হইতে ঠিক উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে বস্তুতঃ প্রবাহ চারিটীর ঠিক উক্ত প্রকার গতি হয় না। পৃথিবীর গতি না থাকিলে উল্লিখিত বায়ুপ্রবাহ গুলি ঠিক ঋজুভাবে প্রধাবিত হইতে পারিত বটে, কিন্তু পৃথিবী অনবরত আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে। ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী একবার আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ আবর্ত্তন করে। পৃথিবীর আকার উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা বলিয়া বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে আর যত কাল্পনিক রেখা আছে, সমুদয় গুলিই বিষুবরেখা অপেক্ষা ক্রমশঃ ছোট ছোট হইয়াছে, পরিশেষে কেন্দ্রদ্বয়ের উপরিভাগে উক্ত প্রকার বৃত্তের স্থলে একটী বিন্দু ধরিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিষুবরেখাস্থ বৃহত্তম বৃত্ত ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যে স্থান আবর্ত্তন করে, ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তগুলি ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই তদপেক্ষা অল্পস্থান আবর্ত্তন করিয়া থাকে, সুতরাং কেন্দ্র-দ্বয়ের নিকট আবর্ত্তন নাই বলিলেও চলে। অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল যে বিষুবরেখায় উপর পৃথিবীর গতিবেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বিষুবরেখা হইতে যতই মেরুর অভিমুখে অগ্রসর হওয়া

য়, ততই উহার গতিবেগ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এবং পরিশেষে মেরুদ্বয়ের উপর প্রায় কিছুমাত্র বেগ থাকে না। গাড়ির চাকার পরিধি এক সম্পূর্ণ আবর্ত্তনে যত স্থান অতিক্রম করে, তাহার অক্ষদণ্ড ও তদপেক্ষা অনেক অল্পস্থান অতিক্রম করিয়া থাকে, অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে চক্রপরিধির যত বেগ উহার অক্ষদণ্ডের বেগ তদপেক্ষা অনেক অল্প। পৃথিবীর আবর্ত্তন ও এবিষয়ে ঠিক শকটচক্রের ন্যায়। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে পৃথিবী যে প্রকার বেগের সহিত আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে, উহার পৃষ্ঠস্থ পদার্থসমূহও ঠিক সেইরূপ বেগে পৃথিবীর সহিত আবর্ত্তন করিতেছে। গতি ও বেগের নিয়ম এই যে, বেগে ভ্রমণ করিবার সময় যদি কোন পদার্থের উপর অপর পদার্থ স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে গতিমান পদার্থের বেগ উহার উপরিস্থ নিশ্চল পদার্থের উপরেও সংক্রান্ত হয়, এবং এই জন্যই নিশ্চল পদার্থটীও গতিমান পদার্থের সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। এই কারণে রেলওয়ে গাড়িতে যাইবার সময় আমাদেরও শরীরে রেলগাড়ির বেগ সংক্রামিত হয়, রেলগাড়ি চলিবার সময় যদি আমরা হঠাৎ উহা হইতে অবতীর্ণ হইতে যাই তাহা হইলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষুবরেখার নিকট পৃথিবীর গতিবেগ এক ঘণ্টায় প্রায় ৫ শত ক্রোশ। এই জন্য বিষুবরেখার নিকটস্থ পদার্থসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অবস্থিত পদার্থসমূহ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক বেগে পৃথিবীর আহ্নিক গতির অনুসরণ করিয়া থাকে। বিষুবরেখার উপরিস্থ পদার্থের যেরূপ বেগ, মেরুদ্বয়ের উপরিস্থ পদার্থের বেগ তদপেক্ষা অনেক অল্প। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিষুবরেখার নিকটে উত্থিত

বায়ুরাশি উত্তর বা দক্ষিণ যে কোন মেরুর দিকে অগ্রসর হইবার সময় অধিক বেগবিশিষ্ট স্থান হইতে ক্রমশঃ অল্প বেগবিশিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিষুবরেখার উপরিভাগে পৃথিবীর যেরূপ বেগ, বায়ুও ঠিক সেই বেগে অগ্রসর হয়, অতএব যদি বায়ুপ্রবাহ বিষুবরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণমুখে প্রবাহিত না হইয়া ঠিক পূর্ব্ব-পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে উহার গতিপথের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিত না। কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক এরূপ হয় না। পৃথিবী নিরন্তর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে, ও বিষুবরেখা হইতে উত্থিত বায়ু উত্তর ও দক্ষিণ মুখে মেরুর দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই জন্য বায়ুপ্রবাহ বিষুবরেখা হইতে অগ্রসর হইবার সময় যে সকল ভূভাগ অতিক্রম করিয়া যায়, উহাদের যেরূপ বেগ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, কারণ দূরে প্রচালিত হইবার সময়েও উহার বিষুব রৈখিক বেগের কিঞ্চিৎ উহাতে অবশিষ্ট থাকে এবং পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান বলিয়া ঋজুগামী বায়ুপ্রবাহও পৃথিবীর উক্ত গতিবশাৎ মেরুর দিকে ঠিক ঋজুভাবে অগ্রসর না হইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে বক্র হইয়া যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে ও বায়ুরাশির ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে যে গতিপথ উক্ত দুইটী ঋজুরেখা অঙ্কিত করিলে ঐ ঋজুরেখাদ্বয়ের পরস্পর সম্পাতে যে সমকোণ উৎপন্ন হয়, উহাকে একটী ঋজুরেখা দ্বারা সমভাবে দ্বিখণ্ডিত করিলে ছেদক ঋজুরেখা যে মুখে অগ্রসর হয় বায়ুপ্রবাহ ঠিক সেইমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কারণে বিষুবরেখা হইতে কিছুদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া যে বায়ু উত্তরমেরুর অভিমুখে প্রবাহিত হয়, উহা ঠিক উত্তরমুখে প্রবাহিত না হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর হইতে পূর্ব্ব মুখে প্রবাহিত হয়; আর বিষুবরেখা

তে উত্থিত বায়ুর যে অংশ দক্ষিণ মেরুর দিকে প্রধাবিত হয়, তাও ঠিক উত্তরাভিমুখে না যাইয়া উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণ-র দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে বিষুবরেখা হইতে উত্থিত ও মেরুদ্বয়ের অভিমুখে ধাবিত অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধগামী বায়ুপ্রবাহের পূর্ব্বস্থান অধিকার করিবার জন্য যে বায়ু মেরুদ্বয় হইতে বিষুবরেখার দিকে প্রবাহিত হয়, উহাদেরও গতিপথ পূর্ব্বোক্ত কারণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বিষুবরেখার নিকটস্থ পৃথিবীর অংশ প্রতি-ঘণ্টায় ন্যূনাধিক ৫০০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। বিষুবরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণমুখে মেরুর দিকে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ ঐ বেগের হ্রাস হইয়া যায়, সুতরাং স্পষ্টই প্রতি-পন্ন হইতেছে যে মেরুর নিকট হইতে বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হইবার সময় বায়ুরাশিকে অল্পবেগবিশিষ্ট স্থান হইতে ক্রমশঃ অধিক বেগবিশিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। বায়ু অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইলেও প্রতি ঘণ্টায় ১২৫ ক্রোশের অধিক স্থান অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীর বেগের সহিত সমান বেগে অগ্রসর হওয়া উহার পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। এই জন্য মেরুদ্বয় হইতে যে বায়ুপ্রবাহ বিষুবরেখার দিকে প্রবাহিত হয়, উহা পৃথিবীর সহিত সমান আসিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে, এবং ঠিক দক্ষিণ ও ঠিক উত্তর মুখে না আসিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া যায়। এই জন্য উত্তর মেরু হইতে যে বায়ু দক্ষিণ মুখে বিষুবরেখার দিকে প্রবাহিত হয়, উহা ঠিক দক্ষিণমুখে না আসিয়া উত্তর পূর্ব্ব অর্থাৎ ঈশান-কোণ হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, এবং দক্ষিণ মেরু হইতে যে প্রবাহ উত্তর মুখে বিষুবরেখার দিকে

আসিতে থাকে উহাও ঠিক উত্তরমুখে না আসিয়া দক্ষিণপূর্ব্ব অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। বিষুবরেখা হইতে যে বায়ু মেরুর দিকে ধাবিত হয়, উহা ঊর্দ্ধগ প্রবাহ, আর মেরুদ্বয় হইতে যাহা বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হয় উহাই নিম্নগ প্রবাহ। এই নিম্নগ প্রবাহদ্বারাই জাহাজাদির যাতায়াতের সুবিধা হয়, এই জন্য ইহাদিগকে বাণিজ্যবায়ু কহে। বিষুবরেখার উত্তরদিকে উত্তরমেরু হইতে প্রবাহিত বায়ুর নাম উত্তরপূর্ব্ব বাণিজ্য বায়ু, ও উহার দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ মেরু হইতে প্রবাহিত বায়ুর নাম দক্ষিণপূর্ব্ব বাণিজ্য বায়ু।

যে দুই সীমার মধ্যে বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা বৎসরের মধ্যে সকল সময় ঠিক একস্থানে থাকেনা। গ্রীষ্মকালে উদীচ্য প্রদেশসমূহে বাণিজ্যবায়ুর সীমা আরও অধিক উত্তরে অগ্রসর হইয়া থাকে, এবং শীতকালে দক্ষিণদিকে নামিয়া যায়। ফলতঃ কর্কটক্রান্তি ও বিষুবরেখা এবং মকরক্রান্তি ও বিষুবরেখা এই উভয় সীমার অন্তর্গত স্থানসমূহে বাণিজ্যবায়ুর সবিশেষ প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। আবার সমুদ্রের উপর এই বায়ুর প্রভাব যেরূপ অনুভূত হয়, স্থলভাগের উপর সেরূপ নহে। স্থলভাগ সমুদ্র অপেক্ষা শীঘ্র উষ্ণ হয় ও শীঘ্রই শীতল হয়, এবং উহাতে নানাস্থানে পর্ব্বতাদি বাধা থাকাতে বায়ুর গতির ব্যাঘাত হইয়া থাকে, এই জন্য স্থলভাগে বাণিজ্যবায়ু প্রবাহ উল্লিখিত নিয়মে প্রবাহিত হইতে পারে না। অনেক সময় অনেক প্রকার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সমুদ্রের উপর উক্ত ব্যাঘাত না থাকাতে, উহা ঠিক উল্লিখিত নিয়মে প্রবাহিত হয়। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে বাণিজ্যবায়ু ঠিক নিয়মে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তথায় উহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১০ হইতে ২০

া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। স্থলভাগে নানাবিধ ব্যাঘাত আছে য়া সমুদ্রতীর হইতে ১০০ মাইলের পর তথায় আর উহা কবারে অনুভূত হয় না।

সূর্য্যের উত্তাপে জল অপেক্ষা স্থল অধিক উষ্ণ হয়, অতএব াবীর যে অংশে অধিক স্থল আছে, উহা যে অংশে অধিক জল পেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বিষুবরেখার দক্ষিণ পক্ষা উত্তর দিকে অধিক স্থল আছে। এই জন্য ঠিক বিষুব- ত্তর উপরিস্থ স্থানসমূহ তাদৃশ উষ্ণ না হইয়া উহার সাত অংশ র ও দক্ষিণে অবস্থিত স্থানসমূহ অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া থাকে। প্রযুক্ত পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে ও দক্ষিণার্দ্ধে যে স্থান অত্যন্ত উষ্ণ তথাকার উভয় পার্শ্বে প্রায় সাত অংশপরিমিত স্থানের বায়ু ন্ত উষ্ণ হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এবং পূর্ব্বোক্ত বাণিজ্য- উক্ত স্থান পূরণার্থ প্রবাহিত হয়, কিন্তু পৃথিবীর গতিবশতঃ ার গতির বক্রতা হওয়াতে ঐ স্থানে উক্ত বায়ুর প্রবাহ বিশেষ ভূত হয় না। বিষুবরেখার উত্তরে ১০ অংশ হইতে ২৫ অংশ ন্ত উত্তরবাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং দক্ষিণভাগের ণিজ্যবায়ু বিষুবরেখার দক্ষিণে তৃতীয় অংশ হইতে ২৩ অংশ ন্ত স্থানে প্রবাহিত হয়। এই দুই বায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নের বায়ু উর্দ্ধে গমন করে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের নিকটে ঐ উর্দ্ধগতি ত্তে অনুভূত হয় না। সুতরাং ঐ স্থান সর্ব্বদাই প্রায় নির্ব্বাত নয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে তথায় অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে। ই জন্য ঐ দুই স্থানকে নির্ব্বাত বা অস্থিরবায়ুমণ্ডল কহে। থিবীর উত্তরার্দ্ধের নির্ব্বাত স্থানের নাম কর্কট নির্ব্বাত, ও ক্ষণার্দ্ধের নির্ব্বাত স্থানকে মকরনির্ব্বাত কহে। পৃথিবীর যে স্থানে বায়ুর ভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তথা হইতে বিষুবরেখায়

দিকে একটী প্রবাহ ও মেরুর দিকে আর একটী প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর গতিবশতঃ মেরুর অভিমুখ বায়ুর গতি ঠিক উত্তর বা দক্ষিণ মুখে না হইয়া ঐ বায়ু উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়। এই জন্য পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও ইউ-রোপের পশ্চিমাংশের সর্ব্বত্রই এই প্রকারে সর্ব্বদাই দক্ষিণপশ্চিম হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই জন্য এই সকল দেশে নগরের পশ্চিমাংশেই সমৃদ্ধ লোকেরা বাস করিয়া থাকেন; কারণ তথায় নিয়ত দক্ষিণপশ্চিম হইতে বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে পশ্চিমদিগের ধূম ধুলি প্রভৃতি নিয়তই বায়ুপ্রবাহের সহিত পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়, এজন্য পূর্ব্বদিক অপেক্ষা পশ্চিমদিকে বাস করাই সুবিধা-জনক হইয়া থাকে।

বিষুববৃত্ত হইতে যে বায়ু মেরুর অভিমুখে প্রবাহিত হয়, উহা আকাশের অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। এজন্য গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত কোন স্থানেই উহা ভূপৃষ্ঠের নিকট অনুভূত হয় না। আফ্রিকার অন্তর্গত টেনিরিফ পর্ব্বতের উপর উঠিলে মেরুর অভিমুখ উর্দ্ধগ ও বিষুববৃত্তের অভিমুখ নিম্নগ উভয় বায়ুপ্রবাহই স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। উর্দ্ধগ বায়ুর অস্তিত্ববিষয়ে আরও নানাবিধ প্রমাণ আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইলে উহার ধূম ভস্ম ও ধূলি প্রভৃতি পদার্থ বেগে উর্দ্ধে উঠিয়া উর্দ্ধগামী বায়ুপ্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া কখন কখন ৪।৫ শত ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। আইসলণ্ড দ্বীপে স্কপটার জোকল নামে একটী আগ্নেয় গিরি আছে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সেই পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত হইলে উহার ভস্মরাশি প্রায় ৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া-

ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও প্রুসিয়া উভয় দেশের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, ঐ সময় যে দিন প্রবল উত্তরীয় বায়ু বহিতে-ছিল, সেই দিবস পারিস নগরী হইতে বেলুনে আরোহণ করিয়া দুই জন কোসাক দক্ষিণে গমন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বেলুন প্রুসিয়দিগের কামানের গোলা অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে উর্দ্ধে উঠিলে উর্দ্ধগ বায়ুপ্রবাহের শক্তিবশতঃ প্রবল-বেগে মেরুরদিকে ধাবমান হইয়া ৯০০মাইল উত্তর স্বইডেন দেশে উপনীত হয় ও তথায় ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়।

মেরব বায়ু।—উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণমুখে ও দক্ষিণ মেরু হইতে উত্তরমুখে অনবরত বায়ুপ্রবাহ বহিয়া থাকে। এই প্রবাহদ্বয় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বাণিজ্যবায়ুরূপে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী অনেক প্রদেশে অনেক সময় বায়ু-প্রবাহের সহিত রক্তবর্ণ ধূলিরাশি উড়িতে দেখা যায়। বৃষ্টি হইলে ঐ ধূলিরাশি রক্তবিন্দুসমূহের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, ইহাকেই লোকে রক্তবৃষ্টি কহিয়া থাকে। কিছুদিন হইল মান্দ্রাজ প্রদেশে এইরূপ রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশে রক্ত বৃষ্টিকে লোকে অতি অশুভ লক্ষণ মনে করিয়া থাকে।

সাময়িক বা আর্ত্তব বায়ু।—পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে স্থল-ভাগের ভিন্নপ্রকার সন্নিবেশবশতঃ বাণিজ্যবায়ুর যাতায়াতের পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রের পৃষ্ঠে কোন প্রকার বাধা নাই বলিয়া তথায় ঐ বায়ু যথানিয়মে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যদি স্থল না থাকিয়া কেবল জলময় হইত, তাহা হইলে বাণিজ্যবায়ুও সর্ব্বত্র সমানরূপে প্রবাহিত হইত। কিন্তু স্থলভাগের উচ্চতা ও পর্ব্বতাদির বাধাপ্রযুক্ত উহা স্থল-ভাগের সর্ব্বত্র অনুভূত হয় না। কেবল মহাসমুদ্রেই উহার

বিলক্ষণ প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারত মহাসাগরের উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব সীমা ভূমিদ্বারা বেষ্টিত, আবার সুদূরবিস্তৃত হিমাল পর্ব্বত দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় উহার অধিকাংশ আবরণ করি রহিয়াছে। উত্তর মেরু হইতে প্রবাহিত বাণিজ্যবায়ু এই সব বাধা অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং ভারত ম সাগর ও ভারতবর্ষে উক্ত বাণিজ্যবায়ুর প্রচার নাই। এই সব স্থানে উক্ত বাণিজ্যবায়ুর পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার ব প্রবাহিত হইয়া থাকে। আসিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড মালভূমি আছে। শীতকালের প্রারম্ভে অগ্রহায়ণ মাসে শীতের প্রভাবে তত্রত্য বায়ুরাশির ভার অতিশয় বাড়িয়া উ এই জন্য শীতকালে শীতল বায়ুপ্রবাহ ঐ স্থান হইতে প্রবলবে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। চীন ও জাপান দেশে উ উত্তর-পশ্চিম বায়ুস্বরূপে অনুভূত হয়, ভূমধ্যসাগরে উহা পূর্ব্ব পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে পশ্চিম ও পশ্চিম উত্তরে প্রবাহিত হয়, এ ভারতবর্ষে উহা উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহি হইয়া থাকে। কিন্তু আষাঢ় মাসে উল্লিখিত মালভূমির অনে অবস্থাপরিবর্ত্ত হয়। ঐ সময় গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তা মালভূমি অতিশয় উষ্ণ হওয়াতে তত্রত্য বায়ুরাশি তরল হই যায়, এবং উহার ভার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প হওয়াতে উ অনবরত ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে, সুতরাং ঐ স্থান অধিক করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে প্রবলবেগে তথায় বায়ু আসি থাকে। আফ্রিকার পূর্ব্বার্দ্ধ, ইউরোপের পূর্ব্বভাগ, ও আসিয় উত্তরভাগ এই তিন ভূভাগেরই আষাঢ় মাস হইতে এইর অবস্থা হয়। সুতরাং ঐ সময় এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ নানাদি হইতে প্রবাহিত বায়ুর ক্রীড়াভূমিস্বরূপ হয়। সাইবীরিয়া

স্কাণ্ডিনেবিয়া দেশে উত্তরদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। চীন হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত আসিয়ার দক্ষিণাংশে উহা ভারতমহাসাগর হইতে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ স্থানভেদে উত্তর পশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বায়ু কোন্ সময় কোন্ মুখে প্রবাহিত হইবে, স্থানটীর সমুদ্র ও মহাদেশের সম্বন্ধে কিরূপ অবস্থান তাহা জানিলে অনায়াসেই নির্ণীত হইতে পারে। উপরে যেরূপ বায়ুর বিষয় কথিত হইল তাহাকে মৌসুম বায়ু কহে। আরবী ভাষায় মৌসুম শব্দের অর্থ ঋতু। উল্লিখিত বায়ু ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় বলিয়া উহাকে মৌসুম বায়ু কহা যায়। কিন্তু পৃথিবীর যে যে অংশে আর্ত্তব বায়ু প্রবাহিত হয় সর্ব্বত্র এই শব্দের ব্যবহার নাই। কেবল ভারতবর্ষেই আর্ত্তব বায়ুকে মৌসুম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মৌসুম শব্দের অপভ্রংশে মরসুম শব্দ বাঙ্গালা ভাষাতেও গৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের উপকূলে গ্রীষ্ম ও শীতকালে যে বায়ু প্রবাহিত হয় উহাকে মৌসুম বায়ু কহে। আসিয়াখণ্ডের মধ্যভাগে গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, আর শীতকালে তথা হইতে চতুর্দ্দিকে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, সুতরাং যে স্থান যেরূপে অবস্থিত, তথায় মৌসুম বায়ুর সেইরূপ প্রবাহ লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে বৎসরের মধ্যে পাঁচ ছয় মাস কাল একদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, আর পাঁচ ছয় মাস কাল উহার বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষের বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ ও তরল হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে

এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায়। এই সময় দক্ষিণ মহাস
হইতে বাষ্পপূরিত বায়ু প্রবলবেগে উত্তরমুখে প্রবাহিত হ
উষ্ণ বায়ুর পূর্ব্বস্থান অধিকার করে এবং নিজেও ক্র
উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে ও উহার কিয়দংশ মেঘ
পরিণত হইয়া বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পর বাষ্পশূন্য হইয়া উহা পুন
নিম্নে নামিতে থাকে এবং ক্রমে দক্ষিণ মহাসাগরের দি
ধাবমান হয়। সাগরে পৌঁছিয়া পুনর্ব্বার জলসংগ্রহপূর্ব্বক
আবার উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হয় ও ক্রমে আবার দক্ষিণ
যায়। ভারতবর্ষে চিরকালই পর্য্যায়ক্রমে এইরূপে বায়ুর য
য়াত হইয়া থাকে।

আবার শীতকালে সূর্য্যকিরণের উত্তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা ক
যায় এবং ভারতবর্ষে বায়ুর ভাব শীতের প্রভাবে বা
উঠে ও স্থলভাগ সাগর অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া য
এই সময় বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অ
গ্রীষ্ম উপস্থিত হয় ও তত্রত্য বায়ুরাশি তরল হইয়া ঊর্দ্ধে উ
থাকে। এই কারণবশতঃ শীতকালে ভারতবর্ষের শীতল
ক্রমাগত দক্ষিণমুখে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উষ্ণ দেশের অভি
প্রবাহিত হয়, এবং কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার উচ্চ আকাশ দি
ফিরিয়া আইসে। এই বায়ু উত্তরমুখে ফিরিয়া আসিবার স
হিমালয়পর্ব্বতের প্রতিঘাতে শীতল হইয়া পুনর্ব্বার ভূ
অবতীর্ণ হইতে থাকে এবং পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদে
শীতকালে বিলক্ষণ অনুভূত হয়। এই প্রত্যাগত বায়ুর অঙ্গ
জলীয় বাষ্প শীতকালে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বর্ষা আনয়ন ক
এবং ঐ বর্ষাতে হরিৎ শস্যসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কার্ত্তিক ম

অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় মাস উত্তর পূর্ব্ব অর্থাৎ ঈশান কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, ও বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিম অর্থাৎ নৈঋত কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে।

এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটীকে ঐশানিক মৌসুম ও দ্বিতীয়টীকে নৈঋত্য মৌসুম কহে, ফলতঃ মৌসুম বায়ু বাণিজ্যবায়ুর প্রকারমাত্র। দক্ষিণ মৌসুম আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাহিত দক্ষিণ বাণিজ্যবায়ুর অনুরূপ, ও উত্তর মৌসুম বায়ুও উত্তর বাণিজ্যবায়ুব অনুরূপ, কেবল ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থাবশতঃ উহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এপ্রেল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বিষুবরেখার উত্তরাংশে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুম প্রবাহিত হয়, আর অক্টোবর হইতে এপ্রেল পর্যান্ত তথায় উত্তরপূর্ব্ব মৌসুম প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার বিষুবরেখার দক্ষিণাংশে অক্টোবর হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম ও এপ্রেল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত দক্ষিণপূর্ব্ব মৌসুম প্রকাশিত হয়। মৌসুম পরিবর্ত্ত হইবার সময় প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। চীন দেশের উপকূলে শীতকালে উত্তর পশ্চিম ও গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পূর্ব্ব মৌসুম প্রবাহিত হয়। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ স্থানেও এইরূপ আর্ত্তব বা মৌসুম বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সমুদয় জলবৃষ্টি উল্লিখিত মৌসুম বায়ুদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে নৈঋত্য মৌসুমী প্রবল হইবার পূর্ব্বেই স্থলভাগে আমরা উহার মন্দ মন্দ প্রচার অনুভব করি। এই জন্য মৌসুম প্রবাহিত হইবার অনেক পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসেই আমরা মন্দ মন্দ মলয়ানিল উপভোগ করিয়া থাকি। প্রত্যেক মৌসুম আরম্ভ হইবার সময় বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত

বায়ুপ্রবাহের পরস্পর সংঘাতে প্রায়ই ঝড় ও তুফান হই থাকে।

অনিত্য বা স্থানীয় বায়ু।—বাণিজ্যবায়ু, মেরববায়ু, আ বায়ু এবং সামুদ্রিক ও স্থলজ বায়ু এই কয়টী নিয়মাধীন। এতদ্ভি যতপ্রকার বায়ুপ্রবাহিত হয়, তৎসমুদয় নিয়মবহির্ভূত। ইহাদে মধ্যে একপ্রকারও কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রবাহিত হয় না কখন এক দেশে, কখন অন্য দেশে, কখন বা একই দেশের ভি ভিন্ন অংশে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই সকল বায়ুকে অনি বা অনিয়মিত বায়ু কহে। এই সকল বায়ু কখন কখ ভয়ানক বেগে প্রবাহিত হইয়া নানাবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিয় থাকে। অপেক্ষাকৃত শীতল দেশে তাপমান অল্প ও বায়ুর ভা অধিক, এবং উষ্ণদেশে তাপমান অধিক ও বায়ুর ভার অল্প সুতরাং যদি অনিত্য বায়ু শীতল দেশ হইতে উষ্ণদেশের অভি মুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে উহা শীতলপ্রবাহ হইয়া থাকে, এবং তথায় বৃষ্টি মুষলধারে পতিত হইতে থাকে। কিন্তু যদি আরব ও আফ্রিকা দেশের মরুভূমি প্রভৃতি উষ্ণ দেশের উপর বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে উহা অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়া উঠে। ইটালি, স্পেন, আরব, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা দেশে এইরূপ উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু আফ্রিকার অন্তর্গত সাহারা মরুভূমিতে এই ভয়ানক বায়ুর যেরূপ প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি সেরূপ নহে। এই ভয়ানক মরুভূমি অতিক্রম করিবার সময় কতশত পথিক ও সার্থবাহ যে একবারে অগ্নিময় বালুকারাশির নীচে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার স্থিরতা নাই। এই বায়ুকে সাইমুম কহে। ইহার সহিত কখন কখন রক্তবর্ণ ধূলি ও বালুকারাশি মিশ্রিতহইয়া সমুদয় আকাশকে

রক্তবর্ণ করিয়া তুলে। ইহা প্রবাহিত হইলে প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ উভয় পদার্থই জ্বলিয়া শুষ্ক হইয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও আরবদেশের মরুভূমিতে যে ভয়ানক অগ্নিবৎ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে সাধারণ ভাষায় লু কহে। লু চলিলে উহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথিকেরা নিম্নমুখে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আত্মরক্ষা করে।

পেরু সাইবিরিয়া প্রভৃতি নানাদেশে ভয়ানক শীতল বায়ু মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই বায়ু এত শুষ্ক যে উহা প্রবাহিত হইলে মৃতদেহ প্রভৃতি অনেক দিন পর্য্যন্ত পচিয়া যায় না।

ঝটিকা।—যে বায়ু প্রতি ঘণ্টায় আধক্রোশ মাত্র অতিক্রম করে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। বায়ু প্রতি ঘণ্টায় ২ বা ২॥০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে উহাকে মন্দ বায়ু কহে। প্রতি ঘণ্টায় যে বায়ু ৫ হইতে ৭ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে তাহার নাম তেজোবায়ু। তেজোবায়ুর বেগ বৃদ্ধিহইলে উহা প্রতি ঘণ্টায় ১০ হইতে ১৫ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করে। বায়ুর বেগ ইহা অপেক্ষা অধিক হইলেই উহাকে ঝটিকা বা প্রবল বাত্যা কহে। বেগ ও গতিপথের বিভিন্নতা অনুসারে ঝড় নানাপ্রকার হইয়া থাকে। অনেক সময় প্রবল ঝড় হইবার পূর্ব্বে উহার কোন প্রকার পূর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত হয় না। বায়ু মৃদু বহিতে বহিতে হঠাৎ উহার বেগবৃদ্ধি হয়, এবং উহা ক্রমশঃ বলবান হইয়া প্রতি ঘণ্টায় ৩৫, ৪০, ৬০, ও ৭৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে থাকে। কয়েক ঘণ্টা এইরূপে প্রবাহিত হইবার পর উহার বেগ কমিয়া যায়, এবং উহা হয় একবারে নিবৃত্ত হয়, নতুবা স্থানান্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগের সহিত পুনরুত্থান করে। দেশের সর্ব্বত্র এক

সময়ে ঝড় হইতে দেখা যায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ ঝড় পূর্ব্ববায়ু হইতে আরম্ভ হয়, ইউরোপের অধিকাংশেই পশ্চিম দিক হইতে ঝড় প্রবাহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বায়ুর গতি সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার পথে হইয়া থাকে। আমরা অল্পমাত্র স্থানের উপর প্রবাহ দেখিতে পাই বলিয়া ঐ মণ্ডলাকার গতি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি না। ফলতঃ আমরা অনুভব করিতে পারি, আর নাই পারি, বায়ুর গতি কেবল মণ্ডলাকার পথেই হইয়া থাকে, অন্য কোন প্রকার হয় না। এই নিয়ম অনুসারে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সকল প্রকার ঝড়ের গতিও অবিকল মণ্ডলাকার হইয়া থাকে। ফলতঃ সকল প্রকার ঝড়ই ঘূর্ণি বায়ু বা বাত্যাবর্ত্ত। পদার্থদ্বয় পরস্পর আহত হইলে বেগে পশ্চাদ্গমন করিয়া থাকে। এইজন্য বায়ুপ্রবাহ পর্ব্বতাদি কোন উচ্চ পদার্থে আহত হইলে সেই পদার্থ হইতে বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে. বিপক্ষাভিমুখ দুই বায়ুপ্রবাহ পরস্পর আহত হইলেও এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। কোন স্থান হঠাৎ বায়ুশূন্য হইলে সেই স্থান পূরণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে বায়ুপ্রবাহ ধাবমান হয়। এই সকল কারণে ঘূর্ণিবায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঘূর্ণিবায়ুতে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ বায়ুমণ্ডল থাকে, একটী অভ্যন্তরীণ মণ্ডল আর একটী বাহ্য মণ্ডল। অভ্যন্তরীণ মণ্ডলের বায়ু উত্তাপাদি কারণে বিরলসংযোগ ও তরল হইয়া নিরন্তর মণ্ডলাকার পথে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, সুতরাং এই স্থানে বায়ুর ভার অল্প এবং তাপমান অধিক। অভ্যন্তরীণ মণ্ডলের বায়ুশূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে মণ্ডলাকারে যে বায়ুপ্রবাহ অগ্রসর হয় তাহাকেই বাহ্য মণ্ডল

কহে। বাহ্য মণ্ডল বায়ুর ভার অধিক ও তাপমান অল্প। এই ঘূর্ণিবায়ু অল্পপরিসর হইলে উহাকে ধূলিধ্বজ কহে। এইরূপ ধূলিধ্বজ আমরা প্রায় সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

বাত্যাবর্ত্তের বহির্মণ্ডলে বায়ুর যেরূপ ভার উহা যদি আভ্যন্তরিক মণ্ডলের বায়ুভার অপেক্ষা অধিক হয়, আর যদি উভয় মণ্ডলের কেন্দ্রদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে ঝড় অতিশয় প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। যদি হঠাৎ কোন স্থানে বায়ুর ভার কমিয়া যায় ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বায়ুর ভার অধিক থাকে, তাহা হইলে প্রবল ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ হইয়া থাকে, এক স্থান বায়ুশূন্য হইলে উহার চতুর্দ্দিকের বায়ু মণ্ডলাকারে অগ্রসর হইয়া ঐ স্থান অধিকার করে ও ঝড়ের মধ্যমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া আবার ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যে স্থানে উভয় মণ্ডল পরস্পর মিলিত হয়, তথায় বায়ু অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। ঘূর্ণি বায়ুর দ্বিবিধ গতি আছে, প্রথমতঃ বায়ু মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে বায়ুশূন্য আভ্যন্তরিক মণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, দ্বিতীয়তঃ উভয় বায়ুমণ্ডল ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। সচরাচর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিধ্বজ দেখিতে পাওয়া যায় তদ্দৃষ্টে প্রকাণ্ড বাত্যাবর্ত্তের ও গতির নিয়ম সুন্দর রূপে বুঝা যাইতে পারে। ধূলির গতি দেখিলেই বুঝা যায় যে প্রত্যেক ধূলিধ্বজেই বায়ু মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে বায়ুপ্রবাহ আসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হইতেছে ও সমগ্র ধূলিস্তম্ভ অগ্রসর হইতেছে এবং ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। এইরূপ ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ সমুদয় ঘূর্ণি বায়ুরই মুখ প্রশস্ত হইতে থাকে ও উহা অবশেষে উচ্চ আকাশের বায়ুর সহিত

মিশিয়া যায়। পৃথিবীর সকল অংশে ঝড় সমানরূপে প্রবাহিত হয় না। গ্রীষ্মমণ্ডল প্রবল ঝটিকার প্রধান স্থান। বিশেষতঃ যেখানে গ্রীষ্মমণ্ডল ও সমমণ্ডলের সীমা পরস্পরসন্নিহিত, তথায় অত্যন্ত প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া থাকে। সচরাচর আমেরিকার অন্তর্গত মহাসাগর ভারত মহাসাগর ও চীন সাগর এই কয় স্থানে ভয়ানক ঝড় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

আপাততঃ এরূপ বোধ হইতে পারে যে, বাতাবর্ত্ত ও ঝড়ের গতির কিছুমাত্র নিয়ম নাই। কিন্তু এটী ভ্রম। কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে সমুদয় বাতাবর্ত্তই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। এই নিয়ম পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে যেরূপ, দক্ষিণার্দ্ধে তাহার ঠিক বিপরীত। উত্তরার্দ্ধে বাতাবর্ত্তের গতি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ তত্রত্য তাবৎ ঝড় পূর্ব্ব হইতে উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘূর্ণন করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়। আর দক্ষিণার্দ্ধে ঝড়ের গতি ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ, অর্থাৎ তত্রত্য তাবৎ ঝড় পশ্চিম হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে। ঝড়ের গতি উক্তরূপ নিয়মে হইয়া থাকে ইহা জানা আছে বলিয়া জাহাজ যাতায়াতের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হয়।

গাড়ির চাকা ঘুরিবার সময় তাহার পরিধি যেরূপ বেগে ঘুরিতে থাকে, তাহার নাভি ততদূর দ্রুতগতি ঘুরে না। ফলতঃ নাভির মধ্যভাগ প্রায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু ঝটিকা ঘূর্ণনসময়ে উহার ঠিক বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে। ঝটিকামণ্ডলের পরিধি যেরূপ ঘুরিতে থাকে, তাহার মধ্যভাগ তদপেক্ষা অনেক গুরুতর বেগের সহিত ঘূর্ণিত হয়। এই জন্য ঝড়ের সময় যে স্থানে ঝটিকামণ্ডলের কেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হয়, তথায়

ানক উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। তদনন্তর তথায় ঝড়ের শেষ
াং পরিধি উপস্থিত হইলে প্রথমে যে দিক হইতে বায়ু আইসে
াহার বিপরীত দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে।

সকল বাত্যাবর্ত্তের বেগ সমান হয় না। কখন কখন উহার
গ অল্পই হইয়া থাকে, আবার কখন বা উহা প্রতি ঘণ্টায় ২৫
্রাশ পথ অগ্রসর হয়। যখন ঘূর্ণিবায়ু অতিশয় প্রবলবেগে
বিত হইতে থাকে, তৎকালে উহার গমনপথে প্রাসাদ বৃক্ষ
ভৃতি যাহা কিছু পতিত হয়, সমস্তই সমূলে উৎপাটিত হইয়া
য়, এমন কি কখন কখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে না।
বাত্যাবর্ত্তের ব্যাসও সর্ব্বত্র সমান হয় না। আমেরিকা
্ধ্যে ৭ হইতে ৮ শত মাইল, ও কখন কখন ১০ শত মাইল
্যন্ত উহার ব্যাস হইয়া থাকে। ভারতমহাসাগরে উহার ব্যাস
চরাচর ৪ হইতে ৫ শত ক্রোশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আবার
ীনসাগরে উহা সঙ্কীর্ণ হইয়া ১০০ হইতে ১৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত
ইয়া যায়।

স্থলভাগে পর্ব্বত, বৃক্ষ, বাটী প্রভৃতি বহুবিধ বাধাপ্রযুক্ত
ত্যাবর্ত্ত সমধিক বেগবান হইতে পারে না, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ
োন বাধা না থাকাতে তথায় বাত্যাবর্ত্ত প্রবলবেগে প্রবাহিত
ইয়া থাকে। বঙ্গসাগর, চীনসাগর, ও কারিবসাগরে ইহার
ারূপ প্রাদুর্ভাব, পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি সেরূপ নহে। এই কারণ
ক্ত স্থানসমূহ বাত্যাবর্ত্তমণ্ডল নামে খ্যাত হইয়াছে।

আমাদের দেশে প্রায় ১০। ১২ বৎসর অন্তর প্রবল বাত্যাবর্ত্ত
বাহিত হইয়া থাকে। ১২৪৯, ১২৫৯, ১২৭১ ও ১২৭৪ সালে
ামাদের দেশে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা হইয়াছিল। উহাতে
সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। ১২৭১

ও ১২৭৪ সালের ঝড় বোধ হয় অদ্যাপি অনেকের মনে জাগরূক রহিয়াছে।

প্রাচীন মহাদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত সমুদ্রে ভাদ্র ও চৈত্রমাসে প্রায়ই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইয়া থাকে। ভারতমহাসাগরে মৌসুম পরিবর্ত্তের সময় এইরূপ ঝড় প্রবাহিত হয়। ঝড়ের যে সকল কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত তড়িতের বিশেষ প্রকার সঞ্চালনেও এই সকল ঝড়ের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। *

চীনসাগরে প্রায় তিন বৎসর অন্তর প্রবল বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হয়। আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ৬ মাস কাল এই ঝড়ের প্রধান সময়। চীনদেশীয়েরা এই প্রকার ঝড়কে টাইফুন কহিয়া থাকে।

কোন অনাবৃত স্থানে প্রচণ্ড বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হইলে তদ্দ্বারা ধূলিরাশি ও শুষ্ক তৃণগুল্মাদি স্তম্ভাকারে আকাশে উত্থিত হয়। এইরূপ স্তম্ভকে ধূলিধ্বজ কহে। এই প্রকার বাতাবর্ত্ত সাগরপৃষ্ঠ বা অন্য জলাশয়ে প্রবাহিত হইলে জলরাশি স্তম্ভাকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। সমুদ্রের যেস্থানে জলস্তম্ভ উত্থিত হয়, তাহার ঠিক উপরে আকাশমণ্ডলে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য জল অতিমাত্র আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং চারি পার্শ্বের তরঙ্গভঙ্গ অতি দ্রুতবেগে সেইস্থানে আগমন করিতে থাকে। প্রভূত জল ও

* বায়ুগোলকে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তড়িৎপ্রবাহও প্রবাহিত আছে। ফলতঃ প্রায় সমুদয় পার্থিব পদার্থেই অল্প বা অধিক পরিমাণে তড়িৎ আছে। কাচ গালা প্রভৃতি দ্রব্য পশমী কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই উহাতে তড়িতের বেগ উদ্ভূত হয়। বায়বীয় তড়িৎদ্বারা বজ্রপাত প্রভৃতি ঘটনা হয়।

বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে এবং মেঘ হইতে আর একটা স্তম্ভ অবতীর্ণ হইয়া উহার সহিত এক হইয়া যায়। জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইবার সময় ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণগোচর হয়। জলস্তম্ভ সকল সময় এবং সকল স্থানে সমান উচ্চ হয় না। কিন্তু কখন কখন উহা ১৭৫০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। জলস্তম্ভসকল কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া বা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া পরিশেষে নিম্নস্থ জলরাশির সহিত মিশিয়া যায়। *

বায়ুর উপকারিতা।—বায়ুদ্বারা আমাদিগের অনেকবিধ উপকারসাধন হয়। ইহাদ্বারা প্রধানতঃ ভূভাগের তাপমানের তারতম্য ও বৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি কোন উষ্ণ ও বাষ্পপূর্ণ স্থান হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে যে স্থানে উক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, তথাকার তাপমান পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশ হইতে ব্রিটেন দ্বীপের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। এই জন্য উক্ত স্থানসকল স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ব্রিটেন দ্বীপ যে স্থানে অবস্থিত, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে উল্লিখিত বায়ু প্রবাহিত না হইলে উক্ত স্থানসকল অত্যন্ত শীতল ও অস্বাস্থ্যকর হইত। আবার শীতল দেশ হইতে উষ্ণ দেশে বায়ু প্রবাহিত হইলে উক্ত উষ্ণ দেশের তাপমান কমিয়া যায়। শীতকালে আসিয়ার অন্তর্বর্ত্তী শীতল প্রদেশ হইতে বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের অনেক স্থান শীতল থাকে। দ্বিতীয়তঃ বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি কুত্রাপি বায়ু প্রবাহিত না হইত, তাহা হইলে

* ইংরাজী ভাষায় ঘূর্ণিবায়ুকে সাইক্লোন কহে।

সূর্য্যের উত্তাপে যে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইত, তাহা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত না হইয়া সমুদ্রপৃষ্ঠেই পুনঃ পতিত হইত। কিন্তু বায়ুর প্রবাহে এই বাষ্পরাশি সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হওয়াতে বর্ষা হইয়া থাকে ও পৃথিবীর মহোপকার সাধিত হয়।

যদি পর্ব্বতাদি কোন উচ্চ স্থান বায়ুপ্রবাহের মুখে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতাদি সংস্পর্শে উক্ত বায়ু শীতল হইয়া যায়, ও উহার অন্তর্গত জলীয় বাষ্পরাশি তথায় আবদ্ধ হওয়াতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এই কারণে ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী খসিয়া পর্ব্বতে অত্যন্ত বর্ষা হইয়া থাকে। দেশে উন্নত বৃক্ষসমূহ থাকিলেও পূর্ব্বোক্তপ্রকার উপকার হইয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকেন আমাদের দেশে সুন্দরবনের অধিকাংশ কাটিয়া আবাদ হওয়াতেই মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে বিচার করিলে এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল, যে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনেক স্থানে বায়ুর গতিপথ ও ভূভাগের সন্নিবেশপ্রকার অনুসারেই গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রাদুর্ভাব হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জল-সমুদ্র।

বায়ুর ন্যায় জলও পৃথিবীকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে। বায়ু জল অপেক্ষা অনেক লঘু বলিয়া ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান রহিয়াছে, আর জল বায়ু অপেক্ষা গুরু বলিয়া ভূপৃষ্ঠের উপরে সংলগ্ন রহিয়াছে। যখন অগ্নি অথবা সূর্য্যের উত্তাপে উহার ভার কমিয়া যায়, তখন আবার জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশস্থ বায়ুরাশির সহিত মিশ্রিত হয়। বায়ু ও জল উভয়েই পৃথিবীর আবরণ বটে, কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে উভয়েব মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে সর্ব্বাবয়বে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, কুত্রাপি উহার বিচ্ছেদ নাই, আবার বায়ু ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চ আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু জল পৃথিবীর সর্ব্বাবয়বের আবরণ নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ সাগরজলে আচ্ছাদিত বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভূভাগ নানাকারণে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্রভেদপূর্ব্বক স্থলাকারে পরিণত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে,সমগ্র পৃথিবীর চারিভাগের কিঞ্চিদূন তিন ভাগ, অর্থাৎ প্রায় বার আনা রকম, জলে আবৃত, আর এক ভাগের কিঞ্চিৎ অধিক অর্থাৎ প্রায় সিকিভাগ স্থল।

পৃথিবীর সমগ্র আয়তন প্রায় ১৯৬,৭১২০০০ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ১৪৪,৭১২,০০০ বর্গ মাইল জল, এবং ৫২০০০,০০০বর্গ মাইল স্থল। দ্বিতীয়তঃ আমরা বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের বিষয় সম্যক্‌রূপে বিদিত নহি, ভূপৃষ্ঠ হইতে কতদূর উৰ্দ্ধে উহার শেষ হইয়াছে তাহা আমরা কেবল অনুমান করিয়া থাকি, কিন্তু মহাসাগর পৃথিবীর অঙ্গে বস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে ইহা আমরা চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে কতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত অবস্থিত অর্থাৎ উহার গভীরতা কত তাহাও আমরা মাপিয়া নির্ণয় করিতে পারি। সমুদ্র অসীম সমভূমির ন্যায় আমাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং তাহার উপরিভাগে সুনীল আকাশে বায়ু মেঘ সূর্য্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত কাল লম্বমান রহিয়াছে, কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগে জাহাজারোহণে উপস্থিত হইলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যে উহা সমভূমি নহে, উহার পৃষ্ঠদেশ গোলাকার।, এই জন্য প্রতি মাইলে ৮ ইঞ্চি করিয়া নিম্ন দেখা যায়। অতএব সমুদ্রের যে স্থলে আমাদের জাহাজ রহিয়াছে, তথা হইতে এক মাইলের কিঞ্চিৎ দূরে যদি ৮ ইঞ্চি উচ্চ কোন পদার্থ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে আমরা উহা দেখিতে পাই না, মধ্যবর্ত্তী জলভাগের উচ্চতা আমাদের চক্ষুর গতিরোধ করিয়া থাকে। বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র এই উভয়ের মধ্যে নানাবিষয়ে আরও নানাবিধ প্রভেদ আছে। সমুদ্রের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠার্থীরা তৎসমুদয় আপনারাই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

আমাদের দেশের অনেক স্থান সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর পক্ষেই বোধ হয় কখনই সমুদ্রদর্শন ঘটিয়া উঠে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষেও অবিকল এইরূপ বলা যাইতে

রে। সুতরাং অগত্যা পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই মানচিত্র বর্ণনাদ্বারা সমুদ্রের বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হয়। প্রথম মুদ্রদর্শন করিবার সময় উহার অসীম জলরাশি দেখিয়া ক্ষণকাল তবুদ্ধি হইতে হয়। পরে ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির করিয়া মনোযোগ রিলে সমুদ্রের বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দর্শন নিত বিস্ময় দূর হইলে সমুদ্রের অন্যান্য গুণসমূহ আমাদের চিত্ত কর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে সমুদ্রের অসীম লেরাশি কখন কখন স্থির ও নিস্তব্ধ থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই ায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চারে উহা আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হয়. আবার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইলে ভীষণ তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া লোকের প্রাণসংশয় করিয়া তুলে। ফলতঃ সাগরপৃষ্ঠ উহার পরিস্থ বায়ুরাশির অনুগত ভৃত্যের ন্যায় নিরন্তর উহার অনুসরণ রিয়া থাকে। আবার বায়ু না থাকিলেই যে সমুদ্র সর্ব্বদা নিস্তব্ধ াকে তাহাও নহে, দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার উহা স্ফীত হইয়া ঠে, এবং ক্ষণকাল ঐ ভাবে থাকিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় বস্থিত হয়। সমুদ্র ভয়ানক গভীর, অনেক স্থলে উহার গভীতার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সমুদ্রের অভ্যন্তরে কত শত ক্ষুদ্র ও হৎ প্রাণী বাস করিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। সমুদ্রের জল অতিশয় লবণাক্ত, কিন্তু অপরিষ্কৃত নহে। উৎকৃষ্ট নির্ঝরের জল অপেক্ষাও সাগরের জলরাশি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। লবণ প্রভৃতি অশেষবিধ পার্থিব পদার্থ উহার সহিত প্রভূত পরিমাণে মিশ্রিত আছে বলিয়া উহা লবণাক্ত ও কষায় হইয়াছে। যদি ভূপৃষ্ঠ স্থানে স্থানে উচ্চ ও স্থানে স্থানে নিম্ন না হইয়া লৌহাদিনির্ম্মিত গোলকের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সমতল হইত, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী সাগরজলে বিলীন থাকিত এরূপ নিশ্চয়

প্রতীতি হয়। বোধ হয় সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা ছিল, পরে কালক্রমে ভূগর্ভস্থ পদার্থসমূহের শক্তিবশতঃ ভূমিকম্পাদি হইয়া ভূভাগ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এই প্রকারে পৃথিবীর কিয়দংশ সাগরজল ভেদপূর্ব্বক স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে, আর অবশিষ্ট নিম্নভূভাগ জলে আচ্ছাদিত থাকিয়া মহাসাগর সাগর উপসাগর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। ফলতঃ উল্লিখিত কারণে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আবহমান কাল এই রূপে স্থল ও জলের ক্ষতি ও বৃদ্ধিবশতঃ কখন নূতন নূতন সাগর কখন বা নূতন নূতন দ্বীপ প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া আসিতেছে।

সৃষ্টির আদিম কালে পৃথিবী একটী তপ্ত ও তরল অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় ছিল, কালক্রমে উহা শীতল হইয়া আসিতেছে, উহার উপরিভাগ একেবারে শীতল হইয়া মনুষ্যাদি জীবের বাসোপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরভাগ অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় উষ্ণ ও তরল রহিয়াছে। কোন উষ্ণ পদার্থ ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকিলে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। পৃথিবীও ক্রমশঃ শীতল হইতেছে বলিয়া উহার উপরিভাগ কুঞ্চিত হইয়া কোথাও নিম্ন ও গভীর হইয়া গিয়াছে ও কোথাও উচ্চ হইয়া দ্বীপ পর্ব্বতাদি সমুৎপন্ন হইয়াছে। নিম্নভাগ জলরাশির আশ্রয় হইয়া সাগর মহাসাগর প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে, আর উন্নত অংশ স্থলভাগ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মহাসাগরের তরঙ্গবেগেও এক স্থানের মৃত্তিকা স্থানান্তরে নীত হইয়া ক্রমশঃ নূতন দ্বীপাদিরূপে পরিণত হইতেছে, আর কোথাও বা ভূভাগ ভগ্ন হইয়া সাগরের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে। ফলতঃ প্রকৃতির নিয়মানুসারে অনুক্ষণই এইরূপ উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইতেছে, কখনই ইহার বিরাম নাই।

উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মুদ্রের বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। এই অধ্যায়ে সমুদ্রের াকার,পরিমাণ,উপকরণ,উহার জলের বর্ণও লবণাক্ততা, উহার াপমান,ও গতি প্রভৃতির বিষয় যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

সমুদ্র দ্বারা ভূপৃষ্ঠের নানাবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে বহুবিধ পরিবর্ত্ত সংঘটিত হয়। অতএব সমুদ্রের গুণসমূহের বয় বিশেষরূপে বিদিত হওয়া ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই নিতান্ত র্ত্তব্য।

(১) সমুদ্র হইতে ভূপৃষ্ঠের সমুদয় জলই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-ম্বন্ধে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমুদ্র জলের একমাত্র নিদান। এই জল-নধি হইতে সূর্য্যের উত্তাপে জল নিয়তই বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশে উত্থিত হইতেছে এবং মেঘাকারে পরিণত হইয়া স্থল-ভাগের সর্ব্বত্রই বারিবর্ষণ করিতেছে। এই বারিদ্বারা নদী হ্রদ বিল খাল নির্ঝর উৎস প্রভৃতি সমুদয় জলাশয়েরই পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। অতএব সমুদ্র হইতেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে পৃথিবীর সমুদয় জলই উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; যদি সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত না হইত, যদি পৃথিবীর অন্তর্গত রস আকর্ষণ করিয়া উহা হইতেই মেঘের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি শিশির প্রভৃতি একবারে রহিত হইয়া যাইত, সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হইতে উদ্ভিজ্জজীবন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইত, এবং জীবজন্তু-গণও অনাহার ও পিপাসার ক্লেশে কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিত না। ফলতঃ এরূপ অবস্থা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী শুষ্ক মরুভূমি হইয়া উঠে, উহার সমুদয় জলাশয় শুকাইয়া যায়, এমন কি পর্ব্বতের উপরিভাগ সকল ও বরফশূন্য হইয়া ধূধূ করিতে থাকে। ফলতঃ সমুদ্র হইতে বাষ্পরূপে জল

উত্থিত হইয়া স্থলভাগের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতেছে বলিয়া সংসার চলিতেছে, নতুবা নিশ্চয়ই সৃষ্টিলোপ হইত। নদী বিল খাল প্রভৃতি হইতে নানাপ্রকারে জল আসিয়া নিরন্তর সমুদ্রে পতিত হইতেছে, আবার মেঘসমূহের সহিত অপরিমিত জল বাহির হইয়া স্থলভাগে উপনীত হইতেছে, এইরূপ আয় ব্যয় দিবারাত্রি অনুক্ষণ হইতেছে বলিয়া সমুদ্রজলের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, উহা চিরকাল একরূপই রহিয়াছে।

সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া থাকে, এই জন্য সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ভূভাগে উহার অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা অধিকপরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক বলিয়া তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে বাষ্প উঠিয়া থাকে। এই বাষ্পসমূহের কিয়দংশ গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে বর্ষা আনয়ন করে, আর কিয়দংশ ভারতমহাসাগরের মৌসুমী বায়ু দ্বারা পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে বর্ষাকাল উপস্থিত করিয়া থাকে। আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, উহাই উত্তরপূর্ব্বমুখে প্রবাহিত বায়ুর সহিত ইউরোপে উপনীত হয় এবং তথাকার বর্ষা উৎপাদন করে। এই প্রযুক্ত ইউরোপে পশ্চিম ও পশ্চিম দক্ষিণ হইতে যে বায়ু পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র ও সজল, আর পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্ব হইতে যাহা পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত হয়, তাহা শুষ্ক ও নির্জ্জল হইয়া থাকে। ভারত মহাসাগর হইতে সমুত্থিত বাষ্পরাশি দ্বারা আফ্রিকার পূর্ব্ব ও আসিয়ার দক্ষিণাংশে বৃষ্টি হইয়া থাকে। আফ্রিকার পশ্চিমাংশে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে উত্থিত বাষ্প দ্বারা বর্ষা উপস্থিত হয়, দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ

বৃষ্টি আটলাণ্টিকের দক্ষিণাংশ হইতে উত্থিত বায়ু দ্বারা সংঘটিত হয়, আর প্রশান্ত মহাসাগর হইতে বাষ্প উত্থিত ও সঞ্চারিত হইয়া উত্তর আমেরিকার জলাশয়সমূহকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। সমুদ্র দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বাংশের তাপমান নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য্যের উত্তাপ অতি ভয়ানক, উত্তর মহাসাগর হইতে শীতলপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া উষ্ণ প্রদেশে আনীত হয়, এবং ইহা দ্বারা উষ্ণতার অনেক লাঘব হইয়া থাকে। শীতল প্রবাহ এইরূপে সঞ্চারিত হইয়া তাপমান না কমাইলে বিষুবরেখার সান্নিহিত ভূভাগ কোন ক্রমেই জীবজন্তুর আবাসভূমি হইতে পারিত না। যেমন শীতল প্রবাহ মেরু-সন্নিহিত প্রদেশ হইতে বিষুববৃত্তের নিকট আনীত হয়, সেইরূপ গ্রীষ্মমণ্ডলের উষ্ণ প্রবাহ ও শীতমণ্ডলে নীত হইয়া তথাকার তাপমান অনেকাংশে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ফলতঃ এইরূপে শীতল ও উষ্ণ উভয় প্রবাহ উভয় দিকে সঞ্চারিত না হইলে গ্রীষ্মমণ্ডল অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত ও শীতমণ্ডল ভয়ানক হিমে আচ্ছন্ন থাকিত, কুত্রাপি মনুষ্যাদি বাস করিতে পারিত না। যে সকল স্থান সমুদ্র তীরে অবস্থিত তথায় শীতাতপের আতিশয্য থাকে না, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গ্রীষ্মকালে যেরূপ প্রবল গ্রীষ্ম, শীতকালে সেইরূপ দুর্জ্জয় শীত হয়, কিন্তু বোম্বাই বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলিয়া গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত শীতল ও শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং কোন ঋতুতেই অধিবাসীদিগকে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। আবার মেক্সিকো উপসাগর হইতে উপসাগরীয় প্রবাহ নামে যে উষ্ণপ্রবাহ পূর্ব্বাভিমুখে প্রধাবিত হয় উহার প্রভাবে ইউরোপের পশ্চিমাংশে শীতকালেও শীতের তাদৃশ

প্রাদুর্ভাব হয় না। গ্ল্যাসগো নগর যে অক্ষরেখায় অবস্থিত, উত্তর আমেরিকার যে স্থান সেই অক্ষরেখায় অবস্থিত তথায় আষাঢ় মাসেও শীতের প্রাদুর্ভাবে জল জমিয়া যায়, কিন্তু উপসারীয় প্রবাহের উত্তাপে ইংলণ্ডের পশ্চিমাংশে শীতকালেও ভয়ানক কষ্টভোগ করিতে হয় না।

পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ অনেক অধিক, সুতরাং তথায় এক অক্ষরেখায় অবস্থিত যাবতীয় প্রদেশে শীতাতপ একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু উত্তরার্দ্ধে জল অপেক্ষা স্থলভাগ অনেক অধিক বলিয়া তথায় এক অক্ষরেখায় অবস্থিত প্রদেশসমূহেও শীতাতপের ভিন্নতা লক্ষিত হয়, কুত্রাপি সাম্য থাকে না। কিন্তু পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধেও সাগরের উপকূলে শীতাতপ নির্দ্ধারিত নিয়মের অধীন, এই জন্য বৃহৎ বৃহৎ মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে শীতগ্রীষ্মের অধিক সমতা হয়। সিংহল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ বলিয়া উহাতে শীতগ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, কিন্তু আফ্রিকার যে অংশ সিংহলের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থিত তথায় গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ। সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা উহার উপকূল নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকারে স্থলভাগ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। যে সকল উপকূল মৃত্তিকা ও বালুকারাশিদ্বারা সংঘটিত, সমুদ্রের প্রবলতরঙ্গে তৎসমুদয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভগ্ন হইয়া যায়, এই জন্য মৃণ্ময় উপকূলসকল সর্ব্বদা ভাঙ্গিতেছে ও সেই সকল মৃত্তিকা বেগে স্থানান্তরে নীত হইয়া নূতন নূতন চর উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু যে সকল উপকূল পাহাড় ও পর্ব্বতে আচ্ছন্ন, তথায় ও সমুদ্রের বেগ অপ্রতিহতপ্রভাবে আঘাত করিয়া ক্রমশঃ

পাহাড় পর্ব্বত বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এই প্রকারে সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে আঘাত করে, তথাকার উপকূলভাগ ভগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু প্রস্তরখণ্ডসকলও ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ি বা বালুকাকণরূপে পরিণত হয়। যে সকল স্থান সাগরগর্ভ হইতে একবারে লম্বভাবে উত্থিত হইয়াছে, তথায় তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক হয়, এবং এই প্রযুক্ত এইরূপ স্থান শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, আর যে সকল স্থানে জল অতি অল্প ও অনেক দূর পর্য্যন্ত চড়া, তথায় সাগরের তরঙ্গ বেগবান হইলেও অধিক ভাঙ্গিতে পারে না, বরং অন্যান্য স্থানের মৃত্তিকা প্রভৃতি তথায় ভাসিয়া আসাতে চড়াগুলি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। পদ্মানদীর প্রবল স্রোতে সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটনা হইতে দেখা যায়। আবার কোন কোন স্থানে উপকূলভাগ এরূপে অবস্থিত, যে তথায় সমুদ্রের বেগ ভালরূপ পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং তথায় ভাঙ্গনও অল্পই হইয়া থাকে। এইরূপ নিরাপদ স্থানে নাবিকেরা জাহাজ বান্ধিবার জন্য বন্দর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। করমণ্ডল উপকূল ও মেক্সিকোর উপকূলে সমুদ্রতরঙ্গে এত কর্দ্দম ও পঙ্ক উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, যে উহাদ্বারা প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও চর উত্থিত হইতে দেখা যায়।

চতুর্থতঃ। সমুদ্র দ্বারা স্থলভাগ নিয়তই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জগৎসংসারে একটী ক্ষুদ্র পরমাণুরও ক্ষয় ও বিনাশ নাই। কোন পদার্থের ক্ষয় বা বিনাশ হইলে উহার পরমাণুসমষ্টি, হয় স্থানভ্রষ্ট হয়, নতুবা নূতন আকার ধারণ করিয়া থাকে। সমুদ্রের বেগে নিরন্তর ভূভাগ ভগ্ন হইয়া

ক্ষয়িত হইতেছে বটে, কিন্তু উহার একটী পরমাণুরও বিনাশ নাই। এক স্থানের ক্ষয় হইতেছে, আবার এক স্থানে নূতন গঠন হইতেছে। সমুদ্রতরঙ্গ যে সকল মৃত্তিকা প্রস্তর বালুকা প্রভৃতি ভাসিয়া যায়, তৎসমুদয় স্থানান্তরে নীত হইয়া কালক্রমে নূতন দ্বীপাদির সূত্রপাত করিয়া থাকে। নদীর উপর, বিশেষ উহার মোহানায়, সর্ব্বদাই এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে নদীর স্রোতে দশ বিদেশ ভাঙ্গিয়া যে মৃত্তিকারাশি ভাসিয়া আইসে, উহা মোহানার নিকট সমবেত হইয়া প্রায়ই নূতন চ ও দ্বীপ উৎপাদন করে। কথিত আছে, বহুকাল পূর্ব্বে অধুন তন বাঙ্গালাদেশ সমুদ্রের গর্ভে বিলীন ছিল, কালক্রমে পূর্ব্বো প্রকারে মৃত্তিকাস্তূপ জমাট হইয়া এই প্রদেশের উৎপত্তি হ য়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে সমুদ্রদ্বারা ভূভা যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেইরূপ সমুদ্রগর্ভে নূতন নূত দ্বীপাদি সৃষ্টির উপকরণ নিয়তই রক্ষিত হইতেছে। এই সব উপকরণ সমুদ্রগর্ভে বহুকাল ধরিয়া জমিতে থাকে, পরে ভূ কম্পাদি কারণে উহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া একেবারে জলের উপ ভাগে উত্থিত হয়, এবং নূতন দ্বীপাদি উৎপন্ন করিয়া থা সমুদ্রের তীরবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রদেশের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা কর্ প্রায়ই সামুদ্রিক জীবজন্তুর অস্থি ও প্রবাল প্রভৃতি দৃষ্টিগে হয়। উক্তরূপে নূতন দ্বীপাদি উৎপন্ন না হইলে কখন ঐ স সামুদ্রিক পদার্থ স্থলভাগের উপর লক্ষিত হইত না।

এতদ্ভিন্ন সমুদ্রগর্ভে অশেষবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীব বাস ক থাকে। ঐ সকল জীবের মৃতদেহ একত্রিত হইয়া অনেক নূতন নূতন দ্বীপ উৎপাদন করে। প্রশান্তমহাসাগর, ভে সাগর ও অন্যান্য নানাস্থানে প্রবালকীটদ্বারা বহুঃ

দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের চক পাহাড়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণুদ্বারা নির্ম্মিত।

সমুদ্রের উপরিভাগ সর্ব্বদাই চঞ্চল। দিনের মধ্যে দুইবার জোয়ার ও ভাটা হওয়াতে নির্ব্বাত সময়েও সমুদ্রের জল স্থির থাকিতে পারে না। জোয়ার ও ভাটা এই দুইটী সমুদ্রের নির্দ্ধারিত গতি। এতদ্ভিন্ন বায়ু প্রবল হইলে সাগরপৃষ্ঠে ভয়ানক তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া থাকে। জোয়ার ভাটা তুফান প্রভৃতির আঘাতেই স্থলভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পার্শ্ববর্ত্তী স্থলভাগের যে পর্য্যন্ত সমুদ্রের জোয়ার উত্থিত হয়, ততদূর পর্য্যন্তই ভাঙ্গিয়া যায়, নতুবা সমুদ্রের পৃষ্ঠ হইতে কিছু-দূর নিম্নে জলের প্রায় গতি নাই; উপরে ভীষণ তরঙ্গ প্রবাহিত হইলেও নিম্নস্থ জল সর্ব্বদাই নিস্তব্ধ থাকে এবং তথায় তর-ঙ্গাদি দ্বারা আনীত মৃত্তিকারাশি নিক্ষিপ্ত জমিতে থাকে। ফলতঃ সমুদ্রের বেগে স্থলভাগের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু ক্ষয় অপেক্ষা পুষ্টির পরিমাণ অনেক অধিক। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, যে সমুদ্রদ্বারা যে পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নূতন নূতন স্থলভাগ সংঘটিত হইতেছে। সমুদ্র-জলের আহ্নিক গতিবশতঃ বায়ু পরিস্কৃত হইয়া থাকে ইহাও একটী মহৎ উপকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রের আকার।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যে বিস্তীর্ণ জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহাকে সমুদ্র কহে। সমুদ্র একই,

কুত্রাপি উহার বিচ্ছেদ নাই। উহা মধ্যে মধ্যে স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহার সর্ব্বত্রই পরস্পর যোগ আছে। স্থলভাগের ন্যায় সমুদ্র কুত্রাপি সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন নাই, সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপশ্রেণী মহাদেশাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, সমুদ্র পার না হইলে আর একপ দ্বীপহইতে মহাদেশে যাইতে পারা যায় না, কিন্তু সমুদ্রের সর্ব্বাংশেই পরস্পর যোগ আছে, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি আভ্যন্তরিক জলরাশিও নদী প্রভৃতি দ্বারা মহাসাগরের সহিত সংলগ্ন। ফলতঃ সমুদ্রের একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে সর্ব্বত্রই জলের উপর দিয়া যাওয়া যায়, কুত্রাপি স্থল অতিক্রম করিতে হয় না। সমুদ্র এক ও অভিন্ন বটে, কিন্তু স্থলভাগের ভিন্ন ভিন্ন আকার অনুসারে সাগরের ও আকার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া মহাসাগর সাগর উপসাগর প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে। সুবিধার জন্য মহাসাগরকে সমুদয়ে পাঁচটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা ;—প্যাসিফিক বা প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর উত্তর মেরব মহাসাগর ও দক্ষিণ মেরব মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগর প্রাচীন মহাদ্বীপ ও নূতন মহাদ্বীপ এই উভয়ের অন্তর্গত। প্রশান্ত মহাসাগর প্রাচীন মহাদ্বীপের পূর্ব্বে ও নূতন মহাদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত আর আটলাণ্টিক মহাসাগর প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিমে ও নূতন মহাদ্বীপের পূর্ব্বে অবস্থিত। উত্তর মহাসাগর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মহাসাগর দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত ও ভারতমহাসাগর ভারতবর্ষের দক্ষিণে বিষুববৃত্তের নিকট অবস্থিত। মহাদ্বীপ ও মহাসাগরসমূহের মধ্যে আকার পরি-মাণফল প্রভৃতি নানাবিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। সূক্ষ্ম অনুসন্ধ

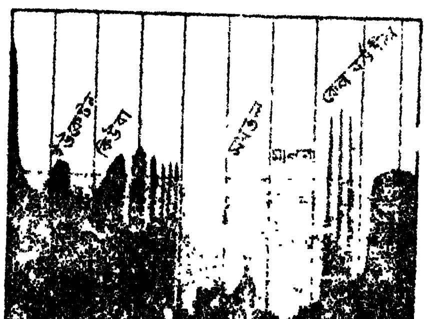
করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, যে প্রাচীন মহাদ্বীপের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের, নূতন মহাদ্বীপের সহিত আটলাণ্টিক মহাসাগরের, ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারত মহাসাগরের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যেরূপ প্রাচীন মহাদ্বীপ আকারে নূতন মহাদ্বীপের দ্বিগুণ, সেইরূপ প্রশান্ত মহাসাগর ও আকারে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দ্বিগুণ। আটলাণ্টিক মহাসাগর ও নূতন মহাদ্বীপ উভয়েই অপেক্ষাকৃত লম্বা ও বিস্তারে অল্প। উভয়েরই উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশ অধিক অপ্রশস্ত। স্থল ও জলের পরস্পর প্রধান বৈপরীত্য এই যে স্থলভাগ উত্তর দিকে প্রশস্ত ও দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়াছে, আর মহাসাগর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ উত্তরে সঙ্কীর্ণ ও দক্ষিণে প্রশস্ত।

আটলাণ্টিক মহাসাগর।—আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিষয় যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, অন্যান্য সাগরের বিষয় ততদূর নহে। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে ইউরোপ আফ্রিকা ও ভারতসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর ও পশ্চিমে নূতন মহাদ্বীপ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ অংশ বিলক্ষণ প্রশস্ত, কিন্তু মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। দক্ষিণাংশ বিষুবরেখার নিকট হইতে ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য গড়ে ৯০০০ মাইল ও প্রস্থ ৪১০০ মাইল। পরিমাণফল প্রায় ৩৫১৬৫০০০ বর্গ মাইল। ইহা সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণফলের পঞ্চমাংশ হইবে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উহার অনেক শাখা প্রশাখা স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে ভূমধ্যসাগর ও বাল্টিক সাগর ইহার দুই প্রধান শাখা। কৃষ্ণসাগর, আজব-

সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরও বোধ হয় বহুকাল পূর্ব্বে উহার শাখাস্বরূপ ছিল। আর পশ্চিমে হডসন বে ও মেক্সিকো উপসাগর এই দুইটী ইহার প্রধান শাখা। এতদ্ভিন্ন ভূমধ্য সাগর, কারিব সাগর ও সেন্টলরেন্স উপসাগর, এগুলিকে আটলাণ্টিকের অংশ বলিতে হইবে। আবার আটলাণ্টিক মহাসাগরে অন্যান্য সাগর অপেক্ষা অধিকসংখ্যক নদী পতিত হইয়াছে। মানচিত্র দেখিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় আমেরিকার সমুদয় প্রধাননদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পতিত হইয়াছে। এই নদীসমূহের মধ্যে সেন্টলরেন্স, মিসিসিপি, ওরিণকো, আমেজন ও লাপ্লাটা এই কয়টী প্রধান। ইউরোপ ও আফ্রিকার যাবতীয় প্রধান নদী আটলাণ্টিক অথবা ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি উহার কোন না কোন শাখায় পতিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে রাইন, রোন ডানিয়ুব, নীপর, নীল, নাইজর, এবং কঙ্গো প্রধান। আটলাণ্টিক মহাসাগরের একদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা ও অপরদিকে আমেরিকা আবার ইহাতে উভয় মহাদেশ হইতে অনেক নদী পতিত হইয়াছে ও অনেকগুলি সাগরশাখা স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কারণে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া বাণিজ্যাদি উপলক্ষে যত জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে অন্য কোন মহাসাগর দিয়া সেরূপ নহে।

সমুদ্রের উপরিভাগ জলরাশিতে পরিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বত্র সমোচ্চ, কিন্তু উহার তলভাগ সমভূমি নহে। উহা মহাদেশের স্থলভাগের ন্যায় বন্ধুর অর্থাৎ কোথাও উচ্চ পাহাড়, কোথাও নিম্ন সমভূমি। আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলভাগ ও অন্য স্থলভাগের ন্যায় উচ্চাবচ। এই মহাসাগরের উত্তরাংশে

বহুসংখ্যক দ্বীপশ্রেণী লক্ষিত হয়। এই সকল দ্বীপশ্রেণী আর কিছুই নহে, কেবল নিম্নস্থ পর্ব্বতাদির চূড়ামাত্র জলভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে দ্বীপের আকারধারণ করিয়াছে। আফ্রিকার পশ্চিমস্থ অ্যাজোরপুঞ্জ, ও আমেরিকার সন্নিহিত বর্ম্মুডাস দ্বীপ এই সমুদ্রের মধ্যে প্রধান। ইহার দক্ষিণাংশের তলভাগে দীর্ঘ পাহাড়-শ্রেণী বিদ্যমান আছে, এই সকল পর্ব্বতের চূড়া জলভেদ করিয়া সেণ্ট হেলেনা, আসেনসন, প্রভৃতি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের গভীরতা সর্ব্বত্র সমান নহে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা গভীর অংশের গভীরতা ৫½ মাইলের অপেক্ষা অধিক হইবে না। অন্যান্য স্থানে ইহা ২ মাইল হইতে ৩½ মাইল পর্য্যন্ত গভীর।



সাগরগর্ভ।

প্রশান্ত মহাসাগর।—প্রশান্ত মহাসাগরের আকার কিয়দংশে ডিম্বের ন্যায়, কিন্তু উহার দক্ষিণভাগ প্রশস্ত ও দক্ষিণ মহাসাগরের সহিত সংলগ্ন। ইহার পশ্চিমে প্রাচীন মহাদ্বীপ ও পূর্ব্বে নূতন মহাদ্বীপ, ইহা যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ তথায় ইহার দৈর্ঘ্য ১০০০ মাইল

তথায় বিস্তার ১২০০০ মাইলের অধিক হইবে না। ইহার পরি মাণফল ৭২০০০,০০০ বর্গ মাইল। ইহার পূর্ব্ব উপকূল প্রা কুত্রাপি ভগ্ন নহে, কেবল কালিফর্ণিয়া উপসাগর ও পানা উপসাগর এই দুই স্থানে এই মহাসাগর ভূভাগের অভ্যন্তে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পশ্চিম উপকূলে কামস্কাট্ক উপসাগর, ওখট্স্কসাগর, জাপানসাগর, পীতসাগর ও চীনসাগ এই পাঁচটী বৃহদাকার উপসাগর স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবে করিয়াছে। আটলাণ্টিকের ন্যায় প্রশান্ত মহাসাগরের তলভা ও সমভূমি নহে। ইহার মধ্যস্থলে উভয় ক্রান্তির মধ্যে উত্ত পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিস্তৃত একটী সুবিস্তীর্ণ উন্নত ভূমি রহিয়াছে, ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬০,০০০০০ বর্গ মাইল হইবে। এই উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী প্রবালকীটদ্বারা নির্ম্মিত। ইহারই উপরি ভাগ সুবিখ্যাত পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ। এতদ্ভিন্ন প্রশান্ত মহা সাগরের মধ্যস্থলে আরও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপশ্রেণী আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক স্থল আটলাণ্টিক মহাসাগ অপেক্ষাও গভীর। ইহার উত্তরাংশে জাপান ও আড্মিরাল দ্বীপের মধ্যস্থল প্রায় ৫ মাইল গভীর। সে যাহা হউক ইহা গভীরতা ৩½ হইতে ৪ মাইলের অধিক হইবে না।

ভারত মহাসাগর।—ভারত মহাসাগর দৈর্ঘে প্রায় ৪৫০০ প্রস্থেও প্রায় ৪৫০০ মাইল হইবে। ইহার পরিমাণফল প্রা ২৫০০০০০০ বর্গ মাইল। ভারত মহাসাগর আকারে এক প্রকাণ্ড উপসাগরের ন্যায়, ইহার উর্দ্ধসীমায় ভারতবর্ষ চূড়াস্বরূ অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার উত্তর সীমায় বঙ্গসাগর, আরবসাগ লোহিতসাগর ও পারস্য উপসাগর প্রভৃতি কয়েকটী প্রসি উপসাগর স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভারত মহা

গরের গভীরতা ও অল্প নহে। বঙ্গ সাগরের নিকট অত্যন্ত ভীর। উপকূলের নিকটেও ইহা এক এক স্থানে প্রায় দুই ইল গভীর হইবে।

উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর।—এই দুই মহাসাগরের বিষয় দ্যাপি সম্যকরূপে বিদিত হইতে পারা যায় নাই। এই দুই মহাগরের অধিকাংশই বরফে আচ্ছাদিত সুতরাং উহাদের বিষয় নুসন্ধান করিবার জন্য অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। কেহ কহ অনুমান করিয়া থাকেন যে উত্তর মেরুর নিকটে একটী প্রশস্ত মহাসাগর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু নাবিকেরা র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তথা হইতে মেরুপ্রদেশ ৫০০ মাইলেরও অধিক হইবে। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশীয় প্রধান নাবিকেরা উত্তর মহাসাগরের উপর দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অবিষ্কার করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, পথ এক প্রকার আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু বরফে আচ্ছন্ন বলিয়া উক্ত পথ কখনই কার্য্যকর হইতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না। সুমেরু সাগরের প্রায় চতুর্দ্দিকেই স্থল, কেবল ডেবিস প্রণালী এবং গ্রীনলণ্ড ও নরওয়ে দেশের মধ্যভাগে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত ইহার যোগ আছে, আর বেরিং প্রণালীর নিকট ইহার কিয়দংশে প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত। ইহার সর্ব্বাধিক দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উভয়ই ২৪০০ মাইল, এবং ইহার পরিমাণফল প্রায় ৫০০০০০০ বর্গ মাইল হইবে। দক্ষিণ মহাসাগর উত্তর মহাসাগর অপেক্ষা আরও অধিক অপরিজ্ঞাত। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে দক্ষিণার্দ্ধ অপেক্ষা স্থলভাগ অনেক অধিক বলিয়া সুমেরু মহাসাগরের বরফ অধিকদূর আসিতে পারে না, কিন্তু দক্ষিণ বা কুমেরু মহাসাগরে এরূপ

বাধা না থাকাতে উহার বরফরাশি অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, এমন কি উত্তর মহাসাগরের বরফ অপেক্ষা দক্ষিণ মহাসাগরের বরফ প্রায় ১০ অংশ অধিকদূরে আসিয়া থাকে। এই কারণ প্রযুক্ত দক্ষিণ মহাসাগরের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য নাবিকেরা অদ্যাপি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, গভীরতা প্রভৃতি সকলই অনিশ্চিত রহিয়াছে। বিক্টোরিয়া লাণ্ড নামক স্থানের দক্ষিণে আর কোন স্থলভাগের বিষয় আমরা অবগত নহি, কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে উহার দক্ষিণে দক্ষিণ মেরুর নিকটে একটী মহাদেশ আছে। অদ্যাবধি দক্ষিণ মহাসাগরে যতদূর মনুষ্যের যাতায়াত হইয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ ৮০০ মাইল অপেক্ষাও অধিক দূর হইবে।

এতদ্ভিন্ন ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, হড্‌সন বে, বাল্টিক সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর প্রভৃতি আরও অনেকগুলি বৃহৎ সাগরশাখা প্রায় স্থলভাগদ্বারা পরিবেষ্টিত। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে এই সকল উপসাগর ও হ্রদের অধিকাংশই বহুকাল পূর্ব্বে কোন না কোন মহাসাগরের অংশস্বরূপ ছিল। কালক্রমে ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক শক্তিবশতঃ সমুদ্রের নিম্নস্থ ভূভাগ জলরাশি ভেদপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়াতে অধুনাতন আভ্যন্তরিক উপসাগরসকল সাগরজল হইতে কোনটী আংশিক কোনটী বা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর ও আরল হ্রদ পূর্ব্বে উত্তর মহাসাগরের অংশ ছিল। কালক্রমে উল্লিখিত কারণে উহাদের চতুর্দ্দিকের স্থলভাগ সাগরগর্ভ হইতে

ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়াতে উহারা অধুনাতন আকার ধারণ করিয়াছে।

কাস্পিয়ান সাগর আয়তনে ব্রিটিস দ্বীপসমূহ অপেক্ষাও বৃহৎ। ইহা সাগরসমতল অপেক্ষা প্রায় ৮৫ ফুট নিম্নে অবস্থিত, ইহার গভীরত্বও প্রায় ৩০০০ ফুট, ইহার জলে সীল ও অন্যান্য নানাবিধ সামুদ্রিক জন্তু বাস করে। আবার কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর, ও আরল হ্রদ এই কয়েকটী জলাশয়ের পরিতোবর্ত্তী ভূভাগে শঙ্খশম্বুকাদি সামুদ্রিক জন্তুর দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে বহুকাল পূর্ব্বে উত্তর মহাসাগর কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রজলের বর্ণ ও আস্বাদ।

সমুদ্র হইতে অল্পপরিমাণে জল উত্তোলন করিলে দেখা যায় যে উহার কিছুমাত্র বর্ণ নাই। উহা বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ, কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগে উহার জলরাশি নানাস্থানে নানাবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। উপকূলের নিকট অথবা যেখানে জল অতি অল্প, তথায় উহার বর্ণ সবুজ, কিন্তু যে স্থানে অগাধ জল তথায় উহা সম্পূর্ণরূপে নীলবর্ণ। আবার যেখানকার জল অতিশয় লবণাক্ত তথায় উহার বর্ণ গাঢ় নীল, এই জন্য ভারতমহাসাগরে ও সমুদ্রের যে যে অংশে বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হয়, সর্ব্বত্রই জলের বর্ণ অত্যন্ত নীল হইয়া থাকে। আবার যেখানকার জল অপেক্ষাকৃত অল্প লবণাক্ত, তথায় উহার বর্ণ ঈষৎ সবুজ, এই জন্য উত্তর

মহাসাগরের জল ঈষৎ সবুজের আভাযুক্ত বোধ হয়। ফলতঃ অধস্থ মৃত্তিকাদির যেস্থানে যেরূপ বর্ণ, উপরিস্থ জলের ও তদনুরূপ বর্ণ হইয়া থাকে, কারণ বিশুদ্ধ জলের কিছুমাত্র বর্ণই নাই, কেবল মিশ্রিত পদার্থের বর্ণানুসারে জলের বর্ণ হইয়া থাকে। এই জন্য সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। লোহিত সাগর, কৃষ্ণসাগর, শ্বেত সাগর, পীতসাগর, হরিৎ সাগর, ও সিন্দূর সাগর এগুলি নিরর্থক নাম নহে, জলের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ অনুসারে উল্লিখিত সাগরসমূহের প্রত্যেকের নাম হইয়াছে। হরিৎ সাগর আজোরপুঞ্জের পশ্চিমে অবস্থিত, আর সিন্দূর-সাগর কালিফর্ণিয়া উপসাগরের নামান্তর। আবার সমুদ্রের সকল অংশেই রাত্রিকালে উহার জলরাশি সঞ্চালিত হইলে অতি চমৎকার উজ্জ্বল আভা নয়নগোচর হইয়া থাকে, বোধ হয় যেন প্রসারিত রৌপ্যপাত্রে অসংখ্য হীরকখণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার কারণ কি অদ্যাপি সবিশেষ নিশ্চিত হয় নাই, অনেকে অনুমান করেন সমুদ্রজলে এক প্রকার খদ্যোতের ন্যায় উজ্জ্বল কীট আছে, উহারই দৈহিক ফস্ফরসের আভায় ওরূপ সুন্দর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ জলের যেরূপ কিছুমাত্র বর্ণ নাই, সেইরূপ কিছুমাত্র আস্বাদও নাই। মিশ্রিত পদার্থের গুণেই জলের মধুরতিক্ত, কষায়, তিক্ত, লবণ প্রভৃতি আস্বাদ হইয়া থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বাষ্পাকারে জল উত্থিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, এই জল অনেকাংশে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। তথাপি বায়ুরাশিভেদপূর্ব্বক পতিত হইবার সময় ইহারও সহিত নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত হইয়া ইহার এক প্রকার আস্বাদ উৎপাদন করে। নদী প্রস্রবণ উৎস প্রভৃতির জলে নানাপ্রকার আকরিক পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে

হার নানাবিধ আস্বাদ হইয়া থাকে, কিন্তু সমুদ্রজলের সহিত লনায় কি বৃষ্টির জল, কি নদী প্রস্রবণ প্রভৃতির জল সকলপ্রকার লই অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ ও সুস্বাদ বলিয়া প্রতীয়মান হবে। সমুদ্রের জল যদিও দেখিতে এত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার। উহাতে কোন স্বচ্ছ পদার্থ ফেলিয়া দিলে উহা অনেক দূর নীচে পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তথাপি উহার সহিত এত অধিক পরিমাণে লবণ মিশ্রিত আছে, যে উহার অগাধ অতলস্পর্শ অপরিমেয় জলরাশি একবারে লবণাক্ত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ সমুদ্রের জল সকল স্থানেই এত অধিক তিক্ত ও লবণাক্ত যে উহা মুখে করিতে পারা যায় না। এই ব্যাপার যে কোন বিশিষ্ট স্থানেই লক্ষিত হয় এরূপ নহে, সমুদ্রের সকল অংশের জলই অতিশয় লবণাক্ত বলিয়া মনুষ্যের পক্ষে অব্যবহার্য্য। অধুনা আমাদের দেশে বিলাতী খনিজ লবণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এতদ্দেশীয় সামুদ্রিক লবণের ব্যবহার ছিল। বাঙ্গালা মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে সমুদ্রের জল ধরিয়া জ্বাল দিলে অথবা সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিলে জলপাত্রের তলে লবণ জমা হইয়া যায়। এই লবণ বিশুদ্ধ লবণ নহে, উহার সহিত অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত করিবার প্রথা ছিল। সমগ্র সমুদ্রে এত অধিক লবণ মিশ্রিত আছে যে যদি কোন উপায়ে সমুদ্রের সমগ্র জল বাষ্পে পরিণত করিয়া উহা হইতে শুষ্ক লবণ পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে প্রায় ৭০০০,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ ইউরোপের দ্বিগুণ স্থান এক মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত লবণে আচ্ছাদিত হইতে পারে। সমুদ্রজলের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা নদী প্রস্রবণ বিল খাল প্রভৃতি

যাবতীয় প্রকার বিশুদ্ধ ও লবণশূন্য জল অপেক্ষা অধিক ভারি। যদি একটী বোতলে প্রথমতঃ বিশুদ্ধ জল পূরিয়া ওজন করা যায়, ও পরে সমুদ্রজল পূর্ণ করিয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে বিশুদ্ধজলপূর্ণ অবস্থায় বোতলটীর যত ভার হয়, সমুদ্রজলপূর্ণ করিলে তদপেক্ষা অধিক ভার হইয়া থাকে। যদি কোন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বিশুদ্ধ জল ওজনে ১০০০ হয়, তাহা হইলে ঠিক সেই পরিমাণ সমুদ্রজল ওজনে ১০২৬ হইবে। কিন্তু সমুদ্রের সকল অংশেই সমুদ্রজলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক এইরূপ থাকে না। আটলাণ্টিক মহাসাগরের জল প্রশান্ত মহাসাগরের জল অপেক্ষা অধিক ভারি, আবার আটলাণ্টিকের যে অংশে বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হয়, তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয় বলিয়া তত্রত্য জল যেমন সর্ব্বাপেক্ষা লোনা তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারি হইয়া থাকে। আবার উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরের জল অন্যান্য সাগরের জল অপেক্ষা লঘু, কারণ তথায় অন্যান্য সাগর অপেক্ষা লবণের পরিমাণ অনেক অল্প। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে সমুদ্রের জলে লবণ ও অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকাতেই উহা অন্যান্য জল অপেক্ষা অধিক ভারি হইয়াছে। এই জন্য সমুদ্রের যে অংশে লবণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প, তথায় জলের ভার ও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল যে অন্যান্য জল অপেক্ষা অনেক ভারি তাহার আর একটী সুন্দর প্রমাণ আছে। যদি সমুদ্রের উপরিভাগে পর্য্যাপ্তপরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ বৃষ্টির জল সমুদ্রজলের উপর ভাসিতে থাকে, এমন কি তৎকালে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ পানীয় জল উত্তোলন করিলেও করা যায়। সমুদ্রের জল বৃষ্টির জল অপেক্ষা

ধিক ভারি না হইলে উহা কখনই সমুদ্রের উপর ভাসিতে রিত না, একবারে সমুদ্রের জলের সহিত মিশিয়া যাইত। এই রণে আমেজন নদীর জল উহার মোহানা হইতে সমুদ্রের পর প্রায় ১০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্রজলের সহিত না মিশিয়া থগ্‌ভাবে থাকে এবং তথা হইতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহ রিতে পারা যায়। সমুদ্রের জল অন্যান্য জল অপেক্ষা অধিক রি বলিয়া উহার উপর জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াতের এতদূর বিধা হইয়াছে। অাবার সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলিয়া অন্যান্য লের ন্যায় শীঘ্র জমিয়া যায় না, তাপমানযন্ত্রের পারদ ৩২ অংশ মিলে বিশুদ্ধ জল জমিয়া যায়, কিন্তু সমুদ্রজল জমাইতে রও অধিক শৈত্যের প্রয়োজন, তাপমান ২৮ অংশ পরিমিত হইলে সমুদ্রের জল কখনই জমিয়া যায় না।

সমুদ্রের জল অত্যন্ত লবণাক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সমান নহে। ত্তর সাগরের জল দক্ষিণ সাগরের জল অপেক্ষা অধিক লোনা বং সমুদ্রের যে অংশে বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হয়, তথাকার জল অন্যান্য সকল স্থানের জল অপেক্ষা অধিক লোনা, কারণ এই স্থান হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল বাষ্পাকারে উঠিয়া ায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় ও উহার লবণাংশ নিম্নে পড়িয়া থাকে। এই স্থানটী উত্তর ২০ অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণ ১৭ অক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যে সকল সাগরাংশ স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে বহুসংখ্যক নদী পতিত ওয়াতে উহাদের জল অপেক্ষাকৃত অল্প লবণাক্ত হইয়া থাকে। ান্টিক সাগরের জল অন্যান্য স্থানের জল অপেক্ষা অর্দ্ধেক মাত্রায় লবণ, আবার লোহিতসাগরে একটীও নদী পতিত য় নাই ও তথায় প্রায় কখনই বৃষ্টি হয় না বলিয়া উহার জল

ভয়ানক লোনা। মরুসাগর প্রভৃতির জল এরূপ লবণাক্ত যে উহাতে মৎস্যাদি কোন প্রকার জীবই জীবনধারণ করিতে পারে না, এইরূপ সাগরসমূহের জল কুত্রাপি বাহির হইতে পারে না, বলিয়া উহা কালক্রমে আরও অধিক লবণাক্ত হইতেছে, মহাসাগরের জল ও বোধ হয় অবিকল এইরূপ হইত, কিন্তু ইহাতে অসংখ্য নদী পড়িতেছে ও ইহার অসংখ্য জীববস্তু নিয়ত লবণ ও চূর্ণ গ্রাস করিতেছে বলিয়া উহার লবণাক্ততার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সমুদ্রের উপরিভাগের জল যেরূপ লবণ, গভীর নিম্ন-ভাগের লবণাক্ততা তদপেক্ষা অধিক, কারণ উপরিভাগে নদী ও বৃষ্টির জল পতিত হওয়াতে উহার লবণাক্ততা কিয়দংশে হ্রাস পাইয়া থাকে, এরূপ কোন কারণ না থাকাতে এবং লবণ জল অপেক্ষা ভারি বলিয়া উহা নিম্নভাগে নিমগ্ন হয়, এইজন্য নিম্ন ভাগের জল অনেক অধিক লবণাক্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সমুদ্রের জল এত লবণাক্ত তথাপি কখন কখন কোন কোন স্থানে সমুদ্রের গর্ভ হইতে সুমিষ্ট বিশুদ্ধ জলের উৎস বেগে উত্থিত হইয়া থাকে। হুমবোল্ড নামক প্রসিদ্ধ জর্ম্মন পদার্থবিৎ কিউবা দ্বীপের নিকটে ক্ষাগুয়া উপসাগরের তট হইতে এক ক্রোশ দূরে এই প্রকার উৎস অতি বেগে উত্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

সমুদ্রের জল এরূপ লবণাক্ত ও গুরু হইবার কারণ কি তাহা পূর্ব্বেই এক প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে সমুদ্রের জলে লবণ প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ প্রচুর-পরিমাণে মিশ্রিত আছে, এবং এইজন্যই উহা এইরূপ লবণাক্ত ও গুরু হইয়াছে। কিঞ্চিৎ সমুদ্রের জল একটী কাচপাত্রে রাখিয়া উহা সূর্য্যের উত্তাপে স্থাপিত করিলে জলীয় ভাগ

।াকারে উড়িয়া যায় এবং পাত্রের উপর নানা আকারের লবণাদি পদার্থ পড়িয়া থাকে। এই প্রকারে আমাদের শ পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত করা হইত ইহা পূর্ব্বেই কথিত হই-ছে। সমুদ্র জলে লবণের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে, উহা করা ৩½ হইবে, অর্থাৎ ১০০ মণ জলে ৩।০ মণ লবণ মিশ্রিত ছে। সমুদ্র জলে যে সমস্ত পদার্থ মিশ্রিত আছে, তন্মধ্যে ণ, ক্ষার, পটাস, ম্যাগ্নেসিয়া, চূন, গন্ধক, উদ্ভিজ্জ ও কীট, ই কয়টী প্রধান। ইহাদের মধ্যে লবণের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা ধিক, উহা সমগ্র মিশ্রিত পদার্থের বার আনা রকম হইবে।

এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে উল্লিখিত যে কল পদার্থের সমবায়ে সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় কাথা হইতে ও কিপ্রকারে সমুদ্রে আনীত হইয়া উহার জলের হিত মিশ্রিত হইল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ হে। সৃষ্টির অব্যবহিত পরে সমুদ্রের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না, তবে এইমাত্র বোধ হয় যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সমুদ্রের জল এখনকার ন্যায় লবণাক্ত রহিয়াছে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের অবস্থাদৃষ্টে অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদয় গ্রহই অগ্নিময় ও বাষ্পাকার ছিল, কালক্রমে শীতল হইয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীর বিষয়েও অবিকল এইরূপ বলা যাইতে পারে। পৃথিবী যেমন ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিয়াছে, তেমনি উহার লবণময় বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া সাগরের লবণাম্বু উৎপন্ন করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুমানসিদ্ধ। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ভূগর্ভে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে লবণরাশি নিহিত আছে, নদী নদ উৎস প্রস্রবণ প্রভৃতি যাবতীয় জলাশয়ের জলে অল্প বা

অধিক পরিমাণে এই পার্থিব লবণ মিশ্রিত থাকে, এই জন্য কোন কোন উৎস ও প্রস্রবণাদির জল লবণাক্ত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সমুদ্রই জলের একমাত্র কারণ. সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হয় এবং বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে থাকে এই প্রকারে স্থলভাগের উপর জল আনীত হয়। যদি সমুদ্র হইতে এইরূপে জল না আসিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমুদ্র স্থলভাগ জীব ও তৃণশূন্য মরুভূমি স্বরূপ পড়িয়া থাকিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সমুদ্র হইতে যত জল স্থলভাগে নীত হয়, তাহা একবারে যায় না, উহার কিয়দংশ ভূগর্ভে শুষিয়া যায়, কিয়দংশ নদী হ্রদ প্রভৃতি রূপে পরিণত হইয়া থাকে। ফলতঃ একটী জলবিন্দুর ও বিনাশ নাই, সমুদয় আর্দ্র পদার্থ হইতেই জল আকৃষ্ট হইয়া বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া যায় এবং আবার বৃষ্টিস্বরূপে পতিত হইয়া থাকে। স্থলভাগের যেখানে যতই জল থাকুক না কেন, উহা নদী খাল প্রভৃতিদ্বারা প্রবাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মহাসাগরে উপনীত হয়। সমুদ্র হইতে এইরূপে নিয়তই জল উঠিতেছে ও সূর্য্যাদি দ্বারা সমুদ্রে পুনরানীত হইতেছে. ফলতঃ এই জন্যই সমুদ্রজলের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কি ভূগর্ভস্থ উৎস, কি দূরবাহিনী নদী, কি পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ বরফ, কি অন্যান্য জলাশয়ের জল, সমুদয় জলই, কোন না কোন প্রকারে নিয়তই সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে স্থলভাগে থাকিবার সময় লবণাদি নানাবিধ পার্থিবপদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং ঐ জল সাগরে পতিত হওয়াতে উহার জল এরূপ লবণাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বরফদ্বারা পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য

ধৌত হইয়া কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ও জলের সহিত মিশিয়া নদীদ্বারা সমুদ্রে আনীত হয়, সুতরাং পর্ব্বতের লবণ, ভূগর্ভের লবণ ও অন্যান্য সকল স্থানেরই লবণ নদ্যাদির জলের সহিত ভাসমান হইয়া সাগরে পতিত হয়, এবং উহার লবণাক্ততা সম্পাদন করিয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই নদ্যাদি সমুদ্রে প্রবাহিত হইতেছে, এবং অনুক্ষণ উহাদের স্রোতে প্রবাহিত লবণাদি সাগরজলে আনীত হইতেছে, সুতরাং সাগরের জল যে লবণাক্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের নিম্নে নিমগ্ন স্থলভাগেও প্রচুরপরিমাণে লবণ থাকিতে পারে, এবং প্রবালকীটাদি বহুবিধ সামুদ্রিক জীবের অবয়বেও লবণ বিদ্যমান আছে, অতএব এই সকল কারণেই যে সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নদী প্রভৃতির স্রোতে কেবল লবণ কেন সকল প্রকার পার্থিব পদার্থই ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের জলের সহিত মিশ্রিত হয়। চূণ প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ সংযোগে শঙ্খ শম্বূকাদি সামুদ্রিক জীবের দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই জন্য শাঁখ বা শামুখ পোড়াইলে চূণ উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত পদার্থসমূহ ব্যতীত সমুদ্রের জলে বায়ু ও প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন একপ্রকার পদার্থ বিদ্যমান আছে। যখন সমুদ্রের উপরিভাগে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন উহার জলরাশি তরঙ্গাকারে উত্থিত হয় এবং রাশি রাশি ফেন বায়ুর সহিত শূন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, যে বায়ু ও জলের সংস্রবে ফেন উৎপন্ন হয়। সুতরাং সমুদ্রজলের সহিত যে বায়ু মিশ্রিত আছে তাহা সপ্রমাণ হইল। সমুদ্রজলের সহিত বায়ু মিশ্রিত আছে বটে,

কিন্তু উহার পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে না, উহা অধিক কখন বা অল্প হইয়া থাকে। এই বায়ু অতি অল্প কিন্তু ইহাদ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হয়। স যত প্রকার জীবজন্তু বাস করে উহারা উক্ত বায়ুদ্বারা নি প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিয়া প্রাণধারণ করিয়া থাকে। উহাদের নি সের সহিত যে সমস্ত দূষিত বাষ্প নির্গত হয় তাহাও উক্ত ব দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া যায়। আর প্রাণী ও উদ্ভিজ্জের মৃতদে সমূহের সমবায়ে যে এক প্রকার নূতন পদার্থ নির্ম্মিত হয়, উ দ্বারা আবার নূতন নূতন জীব ও উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রের গভীরতা ও উহার জলের পরিমাণ।

যাবতীয় দ্রব পদার্থের একটী বিশেষ গুণ এই যে উহাদিগকে যেরূপ পাত্রে যেরূপে রাখা যাউক না কেন, উহারা সর্ব্বদাই সমোচ্চভাবে অবস্থিত হইবে। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই কখন না কখন পুষ্করিণীখনন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। পুষ্করিণী খনন করিবার সময় উহার তলভাগে দুই একটী কূপ খনন করা হয়, কিন্তু যখন জলে সমুদয় পুষ্করিণী পূর্ণ হইয়া যায়, তখন নীচে কূপ আছে কি না আর বুঝা যায় না। ইহার কারণ এই যে পুষ্করিণীর জল সমগ্র পুষ্করিণীর উপর সমোচ্চভাবে অবস্থিত হয়। জলের এরূপ গুণ না থাকিলে নিশ্চয়ই কূপের নিকট উহা নিম্নভাবে অবস্থিত হইত, অর্থাৎ আধারের উচ্চতা বা নিম্নতা অনুসারে উপরিস্থ জলের ও উচ্চতা বা নিম্নতা জন্মিত। কিন্তু সমুদয় দ্রব পদার্থের উল্লিখিত গুণ থাকাতে ঐরূপ না হইয়া উহা সর্ব্বত্রই

সমোচ্চভাবে অবস্থিত হয়। এই কারণে নদী হ্রদ সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় জলাশয়ের জল সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সমোচ্চতা রক্ষা করে। নদীর প্রবাহ ক্রমনিম্ন অববাহিকা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরের সহিত সঙ্গত হয়, কিন্তু ইহাতেও সমোচ্চতার ব্যাঘাত জন্মে না। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সাগরের জলসীমা ভূপৃষ্ঠের ন্যায় বিষম অর্থাৎ কোথাও উচ্চ ও কোথাও নীচ এরূপ নহে। উহা সর্ব্বত্রই সমতল। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বায়ু ও স্রোত প্রভৃতি দ্বারা এই নিয়মের ক্ষণিক ব্যত্যয় হইতে দেখা যায়। ভূমণ্ডল নিয়তই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘূর্ণিত হইতেছে, সুতরাং সমুদ্রজল উহার ঠিক বিপরীতদিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। এই জন্য পূর্ব্বাভিমুখে কোন সাগরশাখা অবস্থিত থাকিলে ঐ জল প্রবলবেগে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জলকে সাগরপৃষ্ঠ অপেক্ষা অধিক স্ফীত করিয়া তুলে। যদি পূর্ব্বমুখে অবস্থিত উপসাগরাদির মুখ প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ জল তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সাগরপৃষ্ঠের সমোচ্চতা সম্পাদন করে, কিন্তু উহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলে শীঘ্র জল নিকাশ হইতে পারে না। এই কারণপ্রযুক্ত কৃষ্ণসাগর লোহিতসাগর প্রভৃতির জল সাগরজলসীমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন প্রবল বায়ুবশতঃ তরঙ্গ উত্থিত হইলেও সমোচ্চতার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উহা ক্ষণিকমাত্র। বায়ুর বেগ নিবৃত্ত হইলেই পুনরায় স্বাভাবিক সমোচ্চতা প্রতিনিবৃত্ত হয়।

সাগরের পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ উহার জলসীমা সমোচ্চ বটে, কিন্তু উহার তলভাগ সমতল নহে, উহা স্থলভাগের ন্যায় বিষম অর্থাৎ কোথাও উন্নত কোথাও বা অবনত। ফলতঃ স্থলভাগে যেরূপ

কোথাও বিস্তীর্ণ সমভূমি, কোথাও উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, কোথাও উচ্চ মালভূমি, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, কোথাও কূপ উৎস হ্রদ নদী প্রভৃতি খাত বিদ্যমান আছে, সাগরের তলভাগ ও অবিকল তদ্রূপ পাহাড় পর্ব্বত মালভূমি উপত্যকা অধিত্যকা প্রভৃতিতে খচিত। সাগরের গভীরতানির্দ্ধারণ বিষয়ে একটী সাধারণ নিয় এই যে নিম্নভূমির পার্শ্বস্থ সমুদ্র প্রায় অল্প গভীর হইয়া থাকে আর উন্নত ভূমির পার্শ্বে সমুদ্র অতিশয় গভীর হয়। যে সমুদ্রে উপকূল যে পরিমাণে নিম্ন ও ঢালু, তথাকার জলও সে পরিমাণে অল্প ও ক্রমশঃ গভীর হইতে থাকে, আব যেখানে উপকূল উচ্চ এবং সাগরপৃষ্ঠ হইতে একবারে ঋজুভা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেখানে জল ও অতিশয় গভীর ও একবা অগাধ হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ এই যে কোন কো স্থানে স্থলভাগ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া সাগরের গর্ভে প্রবেশ ক য়াছে, সুতরাং এইরূপ স্থলে উপকূল যেরূপ সমুদ্রের নিম্নে অ কল সেইরূপ ক্রমনিম্ন স্থল অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, জন্য জল ও অনেক দূর পর্য্যন্ত অতি অল্প গভীর হয়। কারণে কোন কোন উপকূল হইতে তিন চারি ক্রোশ পর্য্য জাহাজ আসিতে পারে না, আবার কোথাও বা সমুদ্রতীর হই ২০।২৫ ফুটের মধ্যেই জাহাজ আসিয়া নঙ্গর ফেলিতে পারে ইউরোপ আসিয়া ও আমেরিকার উত্তরাংশে সুদূরবিস্তীর্ণ সম ভূমি ক্রমনিম্ন হইয়া উত্তর মহাসাগরের গর্ভে প্রবেশ করিয়া এই জন্য উত্তর মহাসাগর উহার দক্ষিণ উপকূল হইতে অ দূর পর্য্যন্ত অল্প গভীর, আবার আফ্রিকা ও আমেরিকার দ পাংশ সাগরগর্ভ হইতে একবারে ঋজুভাবে উন্নত হইয়াছে, প্রযুক্ত আমেরিকা ও আফ্রিকার দক্ষিণে আটলাণ্টিক মহাসা

রের যে অংশ রহিয়াছে তাহা অতিশয় গভীর। উত্তমাশা অন্তরীপের নিম্নেই অগাধ জল ইহা নাবিকেরা বিশেষরূপে অবগত আছেন। বাল্টিক সাগরের যে অংশ জর্ম্মণি ও সুইডেনের মধ্যবর্ত্তী তাহা ১২০ ফুট অপেক্ষা অধিক গভীর নহে, কিন্তু উহার উত্তরাংশের উপকূল অতিশয় উচ্চ, অতএব উহার গভীরতাও অত্যন্ত অধিক। ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণস্থ ভূভাগ অতিশয় উচ্চ বলিয়া ভূমধ্যসাগরও অত্যন্ত গভীর হইয়াছে। এই কারণে কৃষ্ণসাগর বিলক্ষণ গভীর। আয়র্লণ্ডের পশ্চিম হইতে নিউফাউণ্ডলণ্ডদ্বীপ পর্য্যন্ত আটলাণ্টিকের নীচে একটী প্রকাণ্ড মালভূমি রহিয়াছে, উহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ১১৭০০ ফুট নিম্নে ৮০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। উহারই উপর দিয়া টেলিগ্রাফের তার চালিত হইয়াছে। আসিয়ার পূর্ব্বকূলের সন্নিহিত সমুদ্রের গভীরতা নিতান্ত অল্প। চীন দেশের দক্ষিণে সমুদ্রের জল কুত্রাপি ৩০০ ফুটের অধিক গভীর নহে, কিন্তু গ্রীনলণ্ডদ্বীপের নিকট ৭২০০ ফুট দীর্ঘ রজ্জুদ্বারাও উত্তর মহাসাগরের তলস্পর্শ করিতে পারা যায় নাই, উত্তমাশা অন্তরীপের সমীপে আটলাণ্টিক মহাসাগরের গভীরতা ১৬০০০ ফুট অপেক্ষাও অধিক হইবে। কিন্তু সেণ্ট হেলেনাদ্বীপের নিকট উহার গভীরতা আরও অধিক। ধবলগিরিনামক হিমালয় পর্ব্বতের একটী প্রধান শৃঙ্গ ২৭৬০০ ফুট উচ্চ, কিন্তু সমুদ্রের কোন কোন অংশ এত গভীর যে উল্লিখিত পর্ব্বতশৃঙ্গটী তথায় নিমগ্ন করিয়া দিলে উহারও উপর প্রায় ৩।৪ শত ফুট জল অবশিষ্ট থাকে। এই সকল পরীক্ষাদ্বারা স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে স্থলভাগের উচ্চতা অপেক্ষা সাগরের গভীরতা আরও অধিক হইবে।

পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়া-

ছেন যে সমুদ্রের গভীরতা গড়ে চারি মাইল, এবং উ
যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা গভীর তাহা প্রায় ৯ মাইল গভীর হইবে
আটলাণ্টিকের গভীরতা গড়ে ৩ মাইল হইতে ৪ মাইল পর্য
হইবে, প্রশান্ত মহাসাগর যদিও স্থানে স্থানে আটলাণ্টিক অপে
অনেক গভীর তথাপি উহার গভীরতার গড় আটলাণ্টিক অপে
অধিক হইবে না। ভারত ও দক্ষিণ মহাসাগর গড়ে ৪ হইতে
মাইল পর্য্যন্ত গভীর হইবে। কিন্তু দক্ষিণ মহাসাগরের গভীর
মেরুরদিকে ক্রমশঃ কম হইয়া গিয়াছে, আর উত্তর মহাসাগ
বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প গভীর। এতদ্ভিন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও
বৃহৎ যে সকল সাগর উপসাগর প্রভৃতি আছে, তৎসমুদয়ে
গভীরতা নানাস্থানে নানাপ্রকার।

সমুদ্রজলের পরিমাণ ও চাপ।—সমুদ্রে কত জল আ
তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু সমুদ্রজলে
কখনই হ্রাসবৃদ্ধি নাই। অপর্য্যাপ্তপরিমাণ জল উহার পৃ
হইতে নিয়তই বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইতেছে বটে
কিন্তু উহা আবার পৃথিবীর সকল অংশ হইতেই নদী প্রভৃতি
দ্বারা সাগরগর্ভে নিরন্তর আনীত হইতেছে, সুতরাং উহার
হ্রাসবৃদ্ধির কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না। যদি সমুদ্রের গভীরত
গড়ে চারি মাইল ধরা যায়, তাহা হইলে উহাতে সমুদয়ে ৫৮৪
কোটি ঘন মাইল জল আছে এরূপ বলা যাইতে পারে। অনেকে
অনুমান করিয়া থাকেন যে সমুদ্রে যত জল আছে, যদি তাহার
উপর উহার চারিভাগের এক ভাগ যোগ করা যায়, তাহা
হইলে সমুদয় পৃথিবী জলে নিমগ্ন হইয়া যায়, কেবল পৃথিবীর
মধ্যে সর্ব্বোচ্চ দুই একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ জাগিয়া থাকে, আর
যদি সমগ্র সমুদ্রজলের চারিভাগের একভাগ কমিয়া যায়, তাহা

হইলে সমুদয় প্রধান প্রধান নদী একবারে শুষ্ক হইয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপসাগরসকল প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে স্থলভাগের উপর আর আবশ্যকপরিমাণে বৃষ্টি পতিত হইতে পারে না, এবং সমস্ত স্থলভাগ অবিলম্বে জীব ও উদ্ভিজ্জশূন্য মরুভূমিস্বরূপ হইয়া উঠে।

সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে জলের উপর উপরিস্থ বায়ুরাশির চাপ পড়িতেছে, আবার জলসীমা হইতে নীচে ক্রমশঃ উপরিস্থ জলের চাপ পড়িতেছে, সমুদ্রগর্ভের যে স্থান যত নিম্ন ও গভীর, উহার উপরিস্থ জলের চাপ ও তদনুসারে অধিক বা অল্প হইয়া থাকে। উক্ত জলের সেরূপ আয়তন ১০০০ ফুট নীচে উপরিস্থ জলরাশির ভারবশতঃ উহা তদপেক্ষা ৩৪০ ভাগের একভাগ কমিয়া যায়, এক মাইল নীচে উপরিস্থ জলের চাপ বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষা প্রায় ১৬০ গুণ অধিক, অর্থাৎ তথায় প্রতিবর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপর জলের চাপ প্রায় ২৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩০মণ হইবে। এই অনুপাত অনুসারে সমুদ্রের কোন্ অংশে উপরিস্থ জলের চাপ কত তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারা যায়।

সমুদ্রের তল সমভূমি নহে, উহা ভূপৃষ্ঠের ন্যায় পর্ব্বতগুহা খালভূমি, সমতল ক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সমুদ্রের জলে স্থলভাগের ন্যায় নানাবিধ জীবজন্তু বাস করিয়া থাকে, উহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য কীটাণু হইতে বৃহদাকার তিমিপর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরগর্ভে যেরূপ বৃহদাকার জন্তু আছে, ভূপৃষ্ঠে সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। ভূপৃষ্ঠে বোধ হয় হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার জন্তু অল্প আছে, কিন্তু সাগরগর্ভে তিমি ও তিমি অপেক্ষাও বৃহৎ জীব বাস করিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে সাগরগর্ভে এই

সকল জীবের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলা যায় না, কি এই সকল জন্তুর মধ্যে অনেক গুলি যে মানবজাতির নানাবি উপকারে আইসে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রের তাপমান।

বায়ুর পরিচ্ছেদে কথিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর যে অ বিষুবরৃত্তের সন্নিহিত, তত্রত্য বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণ, এ এই প্রযুক্ত তত্রত্য স্থলভাগের ও উষ্ণতা অন্যান্য সকল স্থ অপেক্ষা অধিক। আবার স্থলভাগে শীতগ্রীষ্মাদি ঋ বিভিন্নতা অনুসারে শীতাতপের ও ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে স্থলভাগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ অনুমান হই পারে যে স্থলভাগের উপর যে নিয়মে তাপমানের তারত হইয়া থাকে, সমুদ্রেও অবিকল সেই নিয়মেই তাপমানের বি ন্নতা হয়। বস্তুতঃ প্রায় তাহাই ঘটিয়া থাকে। স্থলভাগের ন সাগরপৃষ্ঠেও যথানিয়মে ঋতুভেদ হইতে দেখা যায়। সমু পৃষ্ঠদেশ স্থলভাগের ন্যায় সমানে সূর্য্যের উত্তাপ প্রাপ্ত সুতরাং সমুদ্র পৃষ্ঠেও ঋতুভেদে ও সমুদ্রের প্রধান প্রধান প্রবা গতি অনুসারে তাপমানের তারতম্য হইবারই সম্ভাব বস্তুতঃ সাগরপৃষ্ঠে তাপমানের তারতম্য প্রায়ই স্থলভা ন্যায়। বিষুবরৃত্তের নিকট বায়ুর ন্যায় সাগরজলেরও উ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বিষুবরৃত্ত হইতে উভয় দিকে যতই অ হওয়া যায়, ততই সাগরপৃষ্ঠের তাপমান ক্রমশঃ অল্প হ

থাকে। অবশেষে মেরুসন্নিহিত সাগরে জলের উত্তাপ এত কমিয়া যায় যে উহা চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন থাকে। বিষুবরেখার নিকটস্থ সাগরাংশে জলের তাপমান ৯৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভারতমহাসাগরের তাপমান ৮৮ ডিগ্রী হইতে ৯১ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, লোহিতসাগরের তাপমান প্রায় সর্ব্বদাই ৯৪ ডিগ্রী। আবার বিষুববৃত্ত ত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ সাগরের তাপমান অল্প হইতে থাকে। আয়র্লণ্ডের পশ্চিমাংশবর্ত্তী সাগরের তাপমান ৩৯ ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক হইবে না, বিষুবরেখার নিকট আট্লাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণাংশের তাপমান ৮০ হইতে ৮৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু উহার অপেক্ষাকৃত উত্তরাংশের তাপমান গড়ে ৪৪ হইতে ৫৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশের তাপমান গড়ে ৭০ ও উত্তরাংশের গড়ে ৬৭.৭ ডিগ্রী। আবার মেরুসন্নিহিত সাগরে কোন প্রকার উষ্ণপ্রবাহ নাই বলিয়া উহার তাপমান গড়ে ২৯ বা ৩০ ডিগ্রীর অধিক হইতে পারে না।

স্থলভাগের ন্যায় ঋতু ও স্থানভেদে সাগরজলেরও তাপমান অল্প বা অধিক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সমুদ্রের তাপমান অবিকল স্থলভাগের ন্যায় নহে। জল অতিমন্দ পরিচালক. বায়ু ও ভূমি অপেক্ষা ইহার পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প, অর্থাৎ বায়ু ও ভূমি যেরূপ উত্তাপ শোষণ ও বিকিরণ করে, জল সেরূপ পারে না। এই কারণবশতঃ বায়ু ও স্থল যেমন শীঘ্র উষ্ণ বা শীতল হয় জল কদাচ সেরূপ হয় না। জল, স্থল ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্র উষ্ণ হয় না বটে, কিন্তু একবার উষ্ণ হইলে আর শীঘ্র শীতল হইতে পারে না। জলের এইগুণ থাকাতে

মনুষ্যজাতির অসংখ্য উপকার হয়। সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ভূভাগ দিনের বেলা সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু উহার নিকটস্থ সাগরের জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। সুতরাং দিবসে এই শীতল বায়ু স্থলভাগের দিকে বেগে প্রবাহিত হয় এবং অধিবাসীদিগের উত্তাপজনিত কষ্ট নিবারণ করে। আবার রাত্রিকালে উপকূলভাগ সাগর অপেক্ষা অধিক শীতল হয়, কিন্তু ঐ সময় সাগর হইতে উত্তাপ উপকূলের দিকে সঞ্চারিত হয় বলিয়া অধিবাসীদিগকে শীতের জন্য অধিক কষ্টভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ সমুদ্রের উপর দিয়া যে বায়ু স্থলভাগের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, উহা সমুদ্র জলের তাপমান গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, সুতরাং সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশসমূহে যে ঋতুভেদ হইয়া থাকে, সাগরকে তাহার একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। বিষুববৃত্তের সন্নিহিত ভূভাগ ভয়ানক উষ্ণ, এমন কি সেনিগাল নদীর নিকটস্থ প্রদেশে অতিরিক্ত উষ্ণতা, বিশেষতঃ সুরাসার পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু উহার নিকটবর্ত্তী সাগর হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া তথায় মনুষ্য বসতি করিতে পারিতেছে। এই প্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে স্থলভাগের উপর যেরূপ উত্তাপ অনুভূত হয়, সমুদ্র-পৃষ্ঠে তত দূর হয় না, আবার শীতকালেও ভূভাগে যেরূপ প্রবল শীতের প্রাদুর্ভাব হয়, সাগরপৃষ্ঠে কুত্রাপি সেরূপ হয় না।

উপরে কথিত হইয়াছে যে, বিষুবরেখা হইতে মেরুর অভিমুখে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই সাগরের তাপমান ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে। কিন্তু উত্তর মেরুর সন্নিহিত সাগর অপেক্ষা দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত সাগর অনেক অধিক শীতল। এইরূপ হইবার কারণ এই যে উত্তরাংশে তুষারসমূহ ভূভাগের

প্রতিবন্ধকতাবশতঃ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং তত্রত্য সাগরবারি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে, কিন্তু পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধে এরূপ কোন প্রতিবন্ধক না থাকাতে তত্রত্য বরফরাশি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সাগরজলের শৈত্যবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

উপরে যাহা কথিত হইল তাহা কেবল সাগরপৃষ্ঠের বিষয়েই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সমুদ্রের সীমা হইতে যতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যের উত্তাপ প্রবিষ্ট হইতে পারে, সেই পর্য্যন্তই উল্লিখিত নিয়মে তাপমানের তারতম্য হইয়া থাকে। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফুট নিম্ন স্থান পর্য্যন্ত সূর্য্যের উত্তাপ প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহার নিম্নে আর উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং জলের গতিও নাই। এই কারণে সমুদ্রের উপরিভাগ অপেক্ষা গভীর জলের তাপমান ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে, ফলতঃ সমুদ্রের যে অংশ যত গভীর, তত্রত্য জলের উষ্ণতা ও সেই অনুসারে তত অল্প হইয়া থাকে। বিষুবরেখার নিকট সাগরপৃষ্ঠস্থ জলের তাপমান গড়ে ৮০ ডিগ্রি, এবং এই স্থান হইতে মেরুরদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই কমিতে কমিতে অবশেষে মেরুর নিকট উহার তাপমান গড়ে ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু গভীর জলের তাপমান গড়ে ৩৫ ডিগ্রী। তাপমানযন্ত্র নামাইয়া দিয়া নির্ণীত হইয়াছে যে বিষুবরেখার নিকটস্থ সাগরে ৭২০০ ফুট নীচের জলের তাপমান ৩৫ ডিগ্রী, এবং মেরুর দিকে অগ্রসর হইলে ৪৫০০ ফুট নীচে উল্লিখিত তাপমান দৃষ্ট হইয়াছে। উত্তর আটলাণ্টিকের উপরিভাগে ৫০০ হইতে ৬০০০ ফুট নিম্ন প্রদেশ পর্য্যন্ত তাপমান গড়ে ৪০ ডিগ্রী, উহার নীচে ১৮০০০ ফুট পর্য্যন্ত তাপমান গড়ে ৩৪ ডিগ্রী।

কিন্তু আটলাণ্টিকের দাক্ষিণাংশে জলের উপরিভাগ হইতে ৬০০ ফুট নীচেই তাপমানযন্ত্র ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের গভীর জল গড়ে ৩৫ ডিগ্রী উষ্ণ, কিন্তু আরও নীচের জল বরফের ন্যায় শীতল। উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা এই ফল স্থির হইতেছে, যে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ উহার অন্যান্য সকল অংশ অপেক্ষা উষ্ণ এবং তথা হইতে যে অংশ যত গভীর তত্রত্য জল তদনুসারে ক্রমশঃ অধিক শীতল হইতে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডল ও উভয় সমণ্ডলের অভ্যন্তরেই এই নিয়মের প্রকৃতরূপ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু হিমমণ্ডলে ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। তত্রত্য সাগরজলের উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ অধিক উষ্ণ এবং গভীরতা অনুসারে সেই উষ্ণতার ক্রমিক বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে সুমেরু ও কুমেরু-সাগরে শীতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাদুর্ভাব বলিয়া বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় তত্রত্য ভূভাগের কিয়দংশ বরফে আচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং সাগরের উপরিভাগেও বরফরাশি সঞ্চিত হয়। বরফ জল অপেক্ষা লঘু এই জন্য উহা জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং বরফরাশির মধ্য দিয়া শীত প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব কিয়ৎপরিমাণে বরফ জমিলেই নিম্নস্থ জল উপরিভাগ অপেক্ষা তরল ও উষ্ণ থাকে।

মেরুর সন্নিহিত ভূভাগের তাপমান অত্যন্ত অল্প বলিয়া তত্রত্য পর্ব্বতাদি নিয়তই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। ঐ বরফরাশি প্রায় সর্ব্বদাই নানাকারণে স্থানচ্যুত হইয়া নিকটবর্ত্তী সাগরে পতিত হয় এবং পর্ব্বতাকারে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। ঐ পর্ব্বতাকার বরফরাশির সহিত কখন কখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডও মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ

সকল পর্ব্বতাকার বরফের যতটুকু অংশ জলের উপর জাগিয়া থাকে, তাহার তিন চারি গুণ প্রায় জলের ভিতরে নিমগ্ন থাকে। মেরুদ্বয়ের সন্নিহিত প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক বহুদূর ভাসিয়া আসিলে ঐ সকল স্তূপ সূর্য্য ও সাগরজলের উত্তাপে ক্রমশঃ গলিয়া যায়। ঐ সকল প্রকাণ্ড বরফস্তূপের আঘাত লাগিলে বড় বড় জাহাজও চূর্ণ হইয়া সাগরতলে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মেরুসন্নিহিত সাগরের জল ও শীতকালে বহুদূর পর্য্যন্ত জমিয়া বরফ হইয়া যায়। এইরূপে কখন কখন সাগরের জল মেরু হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বরফে আচ্ছাদিত হইয়া স্থলভাগের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে, এবং উহার উপর দিয়া অনায়াসে পদব্রজে যাতায়াত করা যায়। গ্রীষ্মকালে এই সকল বহুদূরব্যাপ্ত বরফ আবার গলিয়া জল হইয়া যায়। সমুদ্রের জল জমিয়া বরফ হইলে উহাতে আর লবণ থাকে না, জলের লবণাংশ বরফরাশি হইতে পৃথক্কৃত হইয়া নিম্নস্থ জলের সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং উক্তরূপ বরফের জল স্বচ্ছন্দে পান করিতে পারা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র-জলের গতি ও প্রবাহ।

সমুদ্রের জল সর্ব্বদাই চঞ্চল। ইহা কখনই স্থির থাকিতে পারে না। যখন বিশ্বসংসারের চতুর্দ্দিক বায়ুর অভাবে নিস্তব্ধ থাকে, বৃক্ষপত্রসমূহ নিষ্কম্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং আকাশের মেঘরাজি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল থাকে, তখনও সমুদ্রের জল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ তরঙ্গ অথবা উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইতে

থাকে। সমুদ্রের উপকূলে বাস করিলে অনুক্ষণ সমুদ্রজলের ঘোরতর কল্লোল আমাদের কর্ণগোচর হয়। যাঁহারা কখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই কখন না কখন এই জলকোলাহল শুনিয়া থাকিবেন। যখন বায়ুর তাদৃশ বেগ থাকে না, উহা মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন সাগরবারি মন্দমন্থরে অগ্রসর হইতে থাকে, অথবা উহার পৃষ্ঠদেশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ একটীর পর আর একটী উত্থিত হইয়া দর্শকের নয়নপ্রীতিসম্পাদন করে। কিন্তু যৎকালে প্রবল ঝটিকা বা বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হয়, সেই সময় সাগরপৃষ্ঠে ভীষণ তরঙ্গমালা পর্ব্বতাকারে উত্থিত হইয়া সৃষ্টিলোপ করিতে উদ্যত হয়। আমাদের দেশে সন ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসে যখন ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সময় বঙ্গসাগর হইতে একটীমাত্র প্রকাণ্ড তরঙ্গ হুগলী নদীর মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতেই ২৪ পরগণা প্রভৃতির অধিকাংশ একবারে তালগাছসমান জলে প্লাবিত হইয়া যায়।

অন্যান্য যাবতীয় ঘটনার ন্যায় সমুদ্রজলের গতি ও প্রবাহ ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিশ্বসংসারের সকল পদার্থই, সকল ঘটনাই, নিয়মের অধীন। একটী আকস্মিক ঘটনা, একটী সামান্য পরমাণুও নিয়মবহির্ভূত নহে। কোন সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যহ বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ উহার তিন প্রকার গতি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই সমুদ্রের জল সম্পূর্ণরূপে বায়ুর বশবর্ত্তী। যখন বায়ু থাকে না, তখন সাগরপৃষ্ঠ মসৃণ ও নিস্তব্ধ থাকে, কিন্তু বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলেই জল চঞ্চল হইয়া উঠে

ং বায়ুর অল্প বা অধিক বেগ অনুসারে সাগরপৃষ্ঠেও ক্ষুদ্র বা ৎ তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। কখন কখন আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের নিকটস্থ সমুদ্রে বায়ুর সঞ্চার নাই, অথচ প্রবল রঙ্গ উত্থিত হইতেছে, এরূপ স্থলে সহজেই অনুমান করা যায় যে যদিও আমাদের নিকটস্থ সমুদ্রের উপরিভাগে বায়ুর সঞ্চার ই, তথাপি সমুদ্রের কোন দূরবর্ত্তী অংশে প্রবল তরঙ্গ প্রবা- ত হইয়াছে, এবং উহারই বেগ সঞ্চারিত হইয়া আমাদের থস্থ সাগরেও তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে। ইহাকেই সমুদ্রের ভীর প্রবাহ বা তরঙ্গ কহে। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রের তীরে প্রত্যহ নিয়মে দণ্ডায়মান হইয়া অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে ই যে সমুদ্রজলের সঙ্গে নানাপ্রকার ফল পুষ্প পত্রাদি ভাসিয়া সিতেছে, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে সকল ফলপুষ্পাদি আমাদের দেশের উৎপন্ন দ্রব্য নহে, কোন দূর শ হইতে ভাসিয়া আমাদের উপকূলে উপস্থিত হইয়াছে। আয়- আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের পশ্চিম উপকূলে প্রায়ই আমেরি- র উৎপন্ন ফলপুষ্পাদি ভাসিয়া আসিয়া থাকে। আবার বোত- র মুখ কাক দিয়া উত্তমরূপ বন্ধ করিয়া উহার উপর অঙ্কন খিয়া সমুদ্রের এক পার হইতে ভাসাইয়া দিলে কালক্রমে উহা র পারে উপনীত হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার কখনই কাসম্ভূত হইতে পারে না, ইহা বায়ুর কার্য্যও নহে, কারণ ঐ ফলপুষ্পাদি এতদূরে ভাসিতে দেখা যায়, যে বায়ুর গতিতে নই ওরূপ হইতে পারে না, কোন স্থানে বায়ু প্রবাহিত হইলে ার চতুষ্পার্শ্বেই দ্রব্যাদি ভাসিয়া যাইতে পারে, ফলতঃ প্রবল রেও গতি কোন ক্রমেই ২।৩ শত ক্রোশের অধিক হইতে র না। কিন্তু উল্লিখিত পদার্থসমূহ কতদূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া

আইসে তাহা সহজে স্থির করা যায় না; আবার বায়ুর বিপরীত দিকেও কখন কখন ফলপত্রাদি ভাসিয়া আসিতে থাকে। ইহা-দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সাগরজলের মধ্যে স্বাভাবিক স্রোত প্রবাহিত আছে, ঐ সকল স্রোত নিরন্তর উহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইতেছে, বায়ুদ্বারা উহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। এইরূপ আন্তরিক স্রোতেই একদেশীয় দ্রব্যাদি বহুদূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়া দেশান্তরে উপনীত হয়। ইহাকেই সমুদ্রের স্বাভাবিক গতি বা স্রোত কহে। তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই সমুদ্রের জল প্রতিদিন দুইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্ফীত হইয়া উঠে, এবং অনেকক্ষণ ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার নামিয়া পড়ে। যেখানকার উপকূল জল হইতে একবারে সোজা হইয়া উঠিয়াছে, তথায় ক্রমশঃ জল উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, কিন্তু যেখানকার উপকূল ক্রমনিম্ন অথবা সমভূমির ন্যায় চড়া তথায় জল ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চড়া ঢাকিয়া ফেলে। আবার জলসংক্ষোভ কমিবার সময় ঠিক বিপরীত ঘটনা হইতে থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার উপকূলে ক্রমশঃ জল নামিয়া পড়ে, আর শেষোক্তপ্রকার উপকূলে ক্রমশঃ জল পশ্চাতে কমিয়া যায় এবং চড়া জাগিয়া উঠে। জল অগ্রসর হইবার সময় দেখা যায় প্রত্যেক অগ্রগামী ঢেউ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ঢেউ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়, এইরূপে ক্রমশঃ সমুদয় সাগরবারি অগ্রসর হইয়া নিকটবর্ত্তী স্থলভাগকে আক্রমণপূর্ব্বক নিমগ্ন করে। সাগরজল কমিবার সময় ঢেউগুলি ক্রমশঃ অল্পে অল্পে পশ্চাৎ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বে যতদূর অগ্রসর হইতেছিল এক্ষণে তদপেক্ষা কম অগ্রসর হইতে থাকে, এবং এইরূপে ক্রমশঃ সমগ্র সাগর পশ্চাৎ হইয়া যায় ও আবার পূর্ব্বনিমগ্ন ভূভাগ জাগিয়া উঠিতে থাকে।

এই প্রাত্যহিক জলোচ্ছ্বাস বায়ু না থাকিলেও যে সময়ে সংঘটিত য়, প্রবল বায়ু প্রবাহিত, বিপরীতদিকে প্রবাহিত, হইলেও ঠিক সই সময়েই হইয়া থাকে। বায়ুদ্বারা উহার কিছুমাত্র বাধা য় না ও উহার নিয়মিত সময়ের কখন তিলমাত্রও ইতরবিশেষ য় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই প্রাত্যহিক জলক্ষোভ বায়ুদ্বারা সংঘটিত হয়না, ইহার অবশ্য অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে। এই জলক্ষোভকে বেলা বা জোয়ার ভাটা হে। সমুদ্রে জোয়ার হইলে ঐ জল নদীর মুখ দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক নদীতেও জোয়ার উৎপাদন করিয়া থাকে ইহা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সমুদ্রের সর্ব্বসমেত তিনপ্রকার গতি আছে, বায়বীয় গতি, স্বাভাবিকগতি, ও বেলা বা জোয়ার ভাটা। এই তিন প্রকার গতিরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে ও উহাদের কারণও ভিন্ন ভিন্ন। ক্রমে এই গতিত্রয়ের বিশেষ বিবরণ লেখা যাইতেছে।

সমুদ্রের বায়বীয় গতি বা তরঙ্গ।

যাবতীয় তরল পদার্থের একটী বিশেষ গুণ এই যে উহার পরিভাগ সর্ব্বত্রই সমোচ্চভাবে অবস্থিত থাকে, কোন কারণ-বশতঃ উহার কোন অংশ নিম্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ উহার চারি-পার্শ্ব হইতে পদার্থ অগ্রসর হইয়া সমগ্র পদার্থের স্বাভাবিক সমোচ্চতা রক্ষা করিয়া থাকে। বায়ু দ্বারা সমুদ্রজলের কোন অংশ উৎক্ষিপ্ত বা কোন পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইলে উক্ত নিয়মে তাহার পশ্চাতের জল তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়। ইহাতেই তরঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকে। একখানি থালা বা অন্য কোন পদার্থের উপর জল রাখিয়া উহার একপার্শ্বে ফুৎকার দিলে ঐ জল অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে

অপর পার্শ্বের দিকে অগ্রসর হয়, ইহা ইচ্ছা করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। অবিকল এই প্রকারেই সমুদ্রপৃষ্ঠেও তরঙ্গের উৎপত্তি। জাহাজের মাস্তুল অথবা অন্য কোন উচ্চস্থান হইতে নিরীক্ষণ করিলে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়, তরঙ্গগুলি পরস্পর পশ্চাদ্বর্ত্তী সমান্তর রেখাতে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তরঙ্গ উত্থিত হইবার সময় সমুদ্রজলের উপরিভাগ মাত্র আন্দোলিত হয়, অতিশয় প্রবল ঝটিকার সময়েও জলের উপরিভাগ হইতে ৬০ হাতের নিম্নে উক্ত আন্দোলনের চিহ্নও লক্ষিত হয় না। ধান্যাদি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের উপর বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে গাছগুলির উপরিভাগমাত্র বায়ুর সহিত অগ্রসর হইয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করে, কিন্তু উহার নিম্নভাগ অবিচলিত থাকে। সমুদ্রের উপর বায়ু প্রবাহিত হইলে এই প্রকারেই তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ জলের উপরিভাগ কিয়দ্দূর নিম্ন পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়া থাকে, উহার নিম্নে আর বায়ুবেগ প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং উহা শস্যক্ষেত্রের মূলদেশের ন্যায় অবিচলিত থাকে।

সমুদ্রের কোন অংশ বায়ুদ্বারা আলোড়িত হইলে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, বায়ুপ্রবাহ নিবৃত্ত হইলে আবার উহা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু প্রবল তুফানের পর জল স্থির হইতে অনেক সময় লাগিয়া থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে জলের আন্দোলন ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বহুদূরপর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয়, এবং যেখানে আদৌ বায়ু প্রবাহিত হয় নাই তথায়ও তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। গঙ্গা বা অন্য নদীর মধ্যস্থল দিয়া ষ্টীমার চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আমরা দেখিতে পাই, যে বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ আসিয়া নদীর কূলে আঘাত করিয়াছে, তরঙ্গগুলি যত স্থলের দিকে অগ্রসর হয়, ততই

গ্রামের আকার ও বেগবৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং পরিশেষে ঐ কল তরঙ্গ অতিবেগে তটের উপর আঘাত করে, এবং তটের প্রতিঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়। কলের জাহাজ যেখান দিয়া গিয়াছে, তথা হইতে বহুদূর পর্যান্ত জলের আন্দোলন সঞ্চারিত হয়, এবং অনেকক্ষণ পর্যান্ত আন্দোলিত থাকিয়া ক্রমশঃ সমগ্র নদী আবার শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে। নদীর উপর দিয়া জাহাজ যাইলে যেরূপ ব্যাপার হয়, সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলেও অবিকল তাহাই ঘটিয়া থাকে, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে সমুদ্রের তরঙ্গগুলি নদীর অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইয়া থাকে। যেখানে সমুদ্রের জল অতিশয় গভীর তথাকার তরঙ্গ তাদৃশ ভয়ানক হয়না, তথায় প্রবল তরঙ্গের সময়েও জলরাশি উচ্চ ও নীচ হইয়া গড়াইতে গড়াইতে অগ্রসর হইতে থাকে, ঝড়ের সময় জাহাজ ঐ গড়েনের উপর দিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং একবার গড়েনের সহিত নীচে নামিয়া পড়ে এবং অন্য স্থান হইতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়, আবার গড়েনের সহিত উর্দ্ধে উঠে এবং পুনর্ব্বার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এইরূপ গড়েন তরঙ্গে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, ইহা নদীর উপর সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল প্রকাণ্ড গড়েন ঢেউ যতই উপকূল অথবা চড়ার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই প্রবল ও বৃহদাকার হইয়া বৃহদাকার জলীয় প্রাচীরের ন্যায় দৌড়িতে থাকে, এবং অবশেষে প্রবলবেগে তটের উপর আঘাত করিয়া তটকে চূর্ণীকৃত করে এবং তটের প্রতিঘাতে আপনারাও চূর্ণ হইয়া যায়। অগ্রসর হইবার সময় এই সকল তরঙ্গের উপরিভাগ যেরূপ বেগে ধাবিত হয়, নিম্নভাগে তলের ঘর্ষণবশতঃ তাদৃশ বেগ থাকে না, সুতরাং উপরিভাগগুলি

তরঙ্গের অবয়ব ছাড়াইয়া অগ্রসর হয় এবং ঘোরতর শব্দ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, ভাঙ্গিবার সময় বায়ুসংযোগে রাশি রাশি ফেন উত্থিত হইতে থাকে। ইহাকেই ঢেউ ভাঙ্গা কহে, ঢেউ ভাঙ্গিবার সময় উহার উপর জাহাজ প্রভৃতি পড়িলে একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। নদীর উপর ক্ষুদ্রাকারে এইরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, এবং কতশত দুর্ভাগ্য নৌকা আরোহিসমেত নিমগ্ন হইয়া যায়। সুন্দরবন উড়িষ্যা মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের উপকূল অতিশয় উচ্চ ও অনেক স্থলে প্রস্তরময়, সুতরাং এইরূপ তরঙ্গ তথায় প্রবলবেগে আঘাত করিয়া থাকে, এই জন্য মান্দ্রাজ প্রভৃতি উপকূল দিয়া জাহাজ যাতায়াত করা অসম্ভব। তথায় একপ্রকার তক্তা ও বেতের নির্ম্মিত নৌকা ভিন্ন আর কিছুই অগ্রসর হইতে পারে না। উল্লিখিত কারণে করমণ্ডল উপকূলের কুত্রাপি ভাল বন্দর দৃষ্ট হয় না।

বায়ুর বেগ অনুসারে তরঙ্গসকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইয়া থাকে। মন্দ মন্দ বায়ুসঞ্চারের সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ অল্প অল্প আন্দোলিত হয়, এবং বায়ুর বেগবৃদ্ধি হইলে ক্রমশঃ ভীষণ উত্তুঙ্গ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। যদি বায়ু জলপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরভাবে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে জল অল্পপরিমাণে আন্দোলিত হয়, কিন্তু জলপৃষ্ঠ বায়ুপ্রবাহদ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে আহত হইলে জল প্রচণ্ডবেগে আলোড়িত হইয়া প্রবল তরঙ্গ উত্থাপন করে। ফলতঃ বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রের জলসীমা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণ যে পরিমাণে আয়ত হয়, তরঙ্গের উচ্চতাও সেই পরিমাণে অল্প বা অধিক হইয়া থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপের সমীপে তরঙ্গ যেরূপ উচ্চ হইয়া থাকে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই সেরূপ হয় না, তথায় উত্তর পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে কখন কখন ৪০।৪৫ ফুট

উচ্চ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে, এই কারণে পূর্ব্বে এই অন্তরীপের নাম ঝটিকা অন্তরীপ ছিল। হরন্ অন্তরীপে ৩২ ফুট উচ্চ তরঙ্গ দেখা যায়। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে তরঙ্গসমূহ ২০ হইতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত উন্নত হয়, এবং ইংলিস-চ্যানেল প্রভৃতি উপসাগরের তরঙ্গসমূহ ৮।১০ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। ভারত মহাসাগরের অন্যান্য অংশে ও বঙ্গসাগরেও প্রবল তরঙ্গ লক্ষিত হয়। আবার মেরুসন্নিহিত সাগরে সর্ব্বদাই বরফরাশি ভাসিতে থাকে বলিয়া প্রায় কখনই প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় না। বিস্কে উপসাগরের উপর আটলাণ্টিক মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গের আঘাতে ও প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই ভয়ানক তুফান হয়।

তরঙ্গসমূহ অতিশয় প্রবল বেগে উপকূলস্থ তটে আঘাত করিয়া থাকে। ২০ ফুট উচ্চ তরঙ্গ প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপর প্রায় ২৮ মণ ভারের সহিত পতিত হয়। তরঙ্গের গতিবেগ ও নিতান্ত অল্প নহে, ১০০ ফুট প্রশস্ত তরঙ্গ ১০০ ফুট গভীর জলের উপর দিয়া প্রতি ঘণ্টায় ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করে। এই পরিমাণ অপেক্ষা তরঙ্গের পরিমাণ ও জলের গভীরতা ১০ গুণ বাড়িলে উহার বেগ ঘণ্টায় ৪৮ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, উভয় পরিমাণ ১০০ গুণ বাড়িলে তরঙ্গের গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৫৪ মাইল পর্য্যন্ত হয়, ফলতঃ উহার গতি সচরাচর ঘণ্টায় ৮।১০ ক্রোশের অধিক নহে। কিন্তু প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইলে বোধ হয়, উহার গতি আরও বাড়িয়া উঠিতে পারে। এইরূপ প্রবল তরঙ্গের আঘাতে স্থলভাগ ভগ্ন হইয়া যায়, এবং সমুদ্রের প্রসরবৃদ্ধি হইতে থাকে, আবার উহার সহিত মৃত্তিকা পঙ্ক প্রস্তর প্রভৃতি ভাসিয়া আসাতে ভূভাগের বৃদ্ধিও সম্পাদিত হয়।

সমুদ্রজলের স্রোত।—বায়ু ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হই ঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং বায়ুর সঞ্চার নিবৃত্ত হইলে তর অগাধ জলে বিলীন হইয়া যায়। তরঙ্গের ন্যায় স্রোত দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুর পরিচ্ছেদে বর্ণিত যে সূর্য্যের উত্তাপবশতঃ কোন স্থানের বায়ুরাশি উষ্ণ উঠিলে উহা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং উহা অধিকার করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে অন্যান্য বায়ুরাশি অভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই প্রকারে বাণি মৌসুম প্রভৃতির সংঘটন হয়। এক্ষণে বুঝিতে হইবে দ্রের যে অংশের উপর দিয়া উল্লিখিত বায়ুপ্রবাহ প্রবাহি তথায় বায়ুর বেগবশতঃ সমুদ্রের জল ও বায়ুর সহিত গন্তব্য পথে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ে উৎপত্তি হয়। স্রোত তিন প্রকারঃ—নিত্য, অনিত্য ও সাম জলের তাপমান ও গুরুত্বের পরিবর্ত্তবশতঃ নিত্য স্রোত হয়। সাময়িক স্রোতও উক্ত কারণেই উৎপন্ন হয় বটে, উহা বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরেই সাময়িক স্রোতের অধিকতর প্রা দেখা যায়। অনিত্য স্রোত জোয়ারের গতির প্রকার, ভাগ ও সাগরতলের আকৃতি, এবং মেরুর বরফস্তূপের প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কার নিবৃত্তি অথবা পরিবর্ত্ত হইলে আবার এই প্রকার স্রোতে পরিবর্ত্ত অথবা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্রোত প্রবা হইয়া থাকে। এই সকল স্রোত প্রায়ই ৫০০ ফুট জলের নী প্রবাহিত হয় না, সুতরাং ৫০০ ফুটের নীচের জল স্রোে

গতিদ্বারা চালিত হয় না। সমুদ্রের কোন্ অংশে কিরূপ স্রোত প্রবাহিত হয়, নিম্নে তৎসমুদয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। সমুদ্রের যে অংশে বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হয়, তত্রত্য জলের উপরিভাগ উহার বেগে চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং বাণিজ্য-বায়ুপ্রবাহের সহিত পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তরার্দ্ধ উভয় দিক হইতেই বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে নিরত গতিবশতঃ বায়ুপ্রবাহের ন্যায় জলপ্রবাহের ও গতিপথের পরিবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ উত্তর দিকের জলপ্রবাহ ঠিক দক্ষিণমুখে না আসিয়া উত্তরপূর্ব্ব দিক হইতে দক্ষিণ পশ্চিম অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে, এবং দক্ষিণ দিকের প্রবাহ ও উক্ত কারণে ঠিক উত্তরমুখে না যাইয়া দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে উত্তরপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়। বিষুবরেখার নিকট উপস্থিত হইয়া এই দুই স্বতন্ত্র প্রবাহ পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, এবং সঙ্গমস্থল হইতে একাকার বৃহৎ স্রোতোরূপে পশ্চিমাভিমুখে অর্থাৎ পৃথিবীর গতির বিপরীতদিকে নিয়তই অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রকারে এই যুক্ত প্রবাহ ক্রমশঃ আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক পৃথিবীর অপর পার্শ্বে উপনীত হয়। ইহাকেই বিষুবস্রোত কহে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর বিষুবস্রোতের গভীরতা প্রায় ৩০০ মাইল ও বেগ সমস্ত দিনে ১৮ মাইল মাত্র। যদি এই সুমহৎ স্রোতের অভিমুখে কোন মহাদেশ দ্বীপ প্রভৃতি স্থলভাগ না থাকিত, অর্থাৎ যদি কোন প্রকারে উহার গতিপ্রতিরোধ না হইত, তাহা হইলে উহা অপ্রতিহতভাবে পৃথিবীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে উপনীত হইতে পারিত। কিন্তু উহার পথে ভূভাগের বাধা থাকাতে কার্য্যতঃ ওরূপ হইতে পায় না। এই জন্য

বিষুবস্রোত আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক উত্ত দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গমস্থলে উপনীত হয়. এবং তথায় তং ভূভাগের প্রতিঘাতে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, উভয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতর স্রোতটী দক্ষিণবাহী হইয়া ব্রাজিল উ লের নিম্নদিয়া লাপ্লাটা নদীর মুখ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। ইহাকে ব্রাজিলীয় স্রোত কহে। লাপ্লাটা হইতে ইহা আবার পূর্ব্বাভি ধাবমান হইয়া আটলাণ্টিক অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তরাভি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনর্ব পশ্চিমাভিমুখ মহাস্রোতের সহিত মিলিত হয়। আর বৃহ স্রোতটী দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়া ক্রমশঃ কা সাগর ও মেক্সিকো উপসাগরে উপনীত হয়, এবং ফ্লোরি প্রণালী দিয়া প্রবলবেগে বহির্গত হইয়া ইউনাইটেড ষ্টে পার্শ্ব দিয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই উ সাগরীয় স্রোত নামে প্রসিদ্ধ। ইউনাইটেড ষ্টেটের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রাকার শীতল প্রবাহ উত্তর মেরুর দি হইতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমুখে আসিতে থাকে। এ শীতল প্রবাহের পার্শ্ব দিয়া উপসাগরীয় প্রবাহ উত্তরাভিমু ধাবিত হয়। এই স্থানে উহার জল অতিশয় উষ্ণ, এম কি অনেক স্থলে উহার তাপমান ৮০ ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক হইবে। উহার বেগও ভয়ানক, এই স্থানে উ প্রতিদিন ৭০ হইতে ১২০ মাইল পর্য্যন্ত স্থান অতিক্র করিয়া থাকে। উপসাগরীয় প্রবাহ এইরূপে কিছুদূর উত্তরাভি মুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত শীতল হইতে থাকে, এবং পরিশেষে উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এ মুখে প্রবাহিত হইবার সময় আবার ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়

যায়। এক ভাগ ক্রমাগত উত্তর পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া ব্রিটিস দ্বীপ ও নরওয়ের উপকূলে উপস্থিত হয়, এবং অপর ভাগ দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া আজোরপুঞ্জের নিকট দিয়া পুনর্ব্বার বাণিজ্যবায়ুর পথে পতিত হয়, এবং আবার পশ্চিমাভিমুখ প্রধান স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া আটলাণ্টিক অতিক্রম করিয়া থাকে। উপসাগরীয় স্রোতের পার্শ্বে বহুদূর-বিস্তৃত সাগরের কিয়দংশে কোন প্রকার স্রোতই দৃষ্ট হয় না, সুতরাং স্থির জল বলিয়া উহার উপর সামুদ্রিক তৃণগুল্মাদি জন্মিয়া থাকে। এই সাগরাংশকে সার্গাসা সাগর কহে। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে প্রায় কুত্রাপি বৃহদাকার দ্বীপ নাই, এই জন্য বিষুবস্রোত তথায় অবাধে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। আমেরিরিকার পশ্চিম উপকূল হইতে নির্গত হইয়া উহা পশ্চিমাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম-পূর্ব্বক আসিয়াখণ্ডের পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়, এবং মালয়দ্বীপশ্রেণীর প্রতিঘাতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এক ভাগ উষ্ণস্রোত নদীর ন্যায় বেগে অগ্রসর হইয়া আসিয়ার সমস্ত পূর্ব্ব উপকূল ধৌত করিতে থাকে। এই স্রোতটীকে জাপানীয় স্রোত কহে। আর অপর অংশটী দক্ষিণ পশ্চিমে ধাবিত হইয়া ক্রমশঃ ভারতমহাসাগরে উপস্থিত হয় এবং তত্রত্য পশ্চিমাভিমুখ বিষুবস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

আবার বিষুবস্রোতের জল স্থানচ্যুত হইয়া পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে, ঐ স্থান অধিকার করিবার জন্য পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ উভয় ভাগ হইতেই বায়ুপ্রবাহ অনবরত অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সমুদয় সাগর-বারিই স্থির না থাকিয়া অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশ প্রশস্ত বলিয়া দক্ষিণ মেরুদেশ হইতে একটী প্রকাণ্ড স্রোত উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হই দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রবেশ করিতেছে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ অতিশয় অপ্রশস্ত বলিয়া দক্ষি মহাসাগরের জল উত্তরমুখে ধাবিত হইয়া বেরিং প্রণালী দি প্রবেশ করিতে পারে না, আর উত্তর মহাসাগরের জল ও প্রণালী দ্বারা দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইতে পারে না। কি আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশ বিলক্ষণ প্রশস্ত বলিয়া উ মহাসাগরের স্রোত অনায়াসে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হই পারে। এইরূপ একটী স্রোত গ্রীনলণ্ডের পূর্ব্বধার দিয়া প্রবাহি হয়, এবং আর একটী দক্ষিণাভিমুখে উপসাগরীয় স্রোতের প দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বিষুবরেখার নিকটস্থ সাগ জল সূর্য্যের উত্তাপে অতিশয় উষ্ণ ও তরল হইয়া ঊর্দ্ধে উঠি থাকে, এবং ইহার স্থান অধিকার করিবার জন্য মেরু হইতে শীতল জলের স্রোত অনবরত বিষুবরেখার দিকে অগ্র হয়। ঐ স্রোত জলসীমা হইতে বহুদূর নিম্নে অবস্থিত। প্রকারের অধস্থ স্রোত কোন প্রকারে প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন বিষুবরেখার নিকটস্থ সাগরের বহুদূর নিম্ন দেশের অতি শীতল জলদৃষ্টে অনুমান হয় যে মেরুদেশীয় জল স্রোতোরূ তথায় উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা অন্যকারণে তত্রত্য জল অত শীতল হইতে পারিত না।

নিম্নে প্রধান প্রধান স্রোতগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্র হইতেছে।

[১] দক্ষিণ মহাসাগরীয় স্রোত ক্রমশঃ উত্তর-পূর্ব্বাভিমু

ধাবিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশে উপনীত হয়, তথায় তত্রত্য ভূভাগের প্রতিঘাতে উহা দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বহিয়া মেরুদেশপর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, এবং তথা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বিষুবস্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। এই মিলিত স্রোত ৩৫০০ মাইল প্রশস্ত কটিবন্ধ অর্থাৎ সমগ্র গ্রীষ্মমণ্ডল অতিক্রমপূর্ব্বক অবশেষে আসিয়ার পূর্ব্ব উপকূলে উপনীত হয়, এবং তথা হইতে দুই ভাগ হইয়া এক ভাগ উত্তরমুখে ধাবিত হয়, আর এক ভাগ অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলণ্ড প্রভৃতি অতিক্রমপূর্ব্বক ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয়।

(২) ভারত মহাসাগরের বিষুবস্রোত ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইয়া আফ্রিকার নিকট উপস্থিত হয়, এবং তথায় উত্তমাশা অন্তরীপের প্রতিঘাতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহার গতি প্রতিদিন ৫০ মাইল। জাহাজসকল এই স্রোত ধরিয়া আফ্রিকার দক্ষিণ হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও তথা হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হয়।

[৩] আফ্রিকার দক্ষিণাংশের বিষুব স্রোত উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়া সেণ্টরোক অন্তরীপের ৩০০।৪০০ ক্রোশ অন্তরে প্রধান বিষুবস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক ভাগ ব্রাজিলের দিকে ও অপর ভাগ গায়ানা হইয়া কারিব ও মেক্সিকো উপসাগরে উপনীত হইতেছে।

(৪) প্রসিদ্ধ উপসাগরীয় স্রোত ফ্লরিডার খাড়ি হইতে নির্গত হইয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডপর্য্যন্ত উত্তরমুখে ধাবিত হয়। এই স্থান হইতে পূর্ব্ব-উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহার এক ভাগ ইউরোপের পশ্চিমাংশে উপস্থিত হয়, আর অপর ভাগ দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়া বিষুবস্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই

প্রকাণ্ড সামুদ্রিক নদী মেক্সিকো উপসাগর হইতে আজোর পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ মাইল দীর্ঘ, ইহার বিস্তারও অল্প ন উহা গড়ে প্রায় ১২০ মাইল হইবে। ইহার বর্ণ গাঢ় নীল, জন্য ইহাকে সমুদ্রের অপর অংশের জল হইতে সহজেই পৃ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) উত্তর মহাসাগরীয় স্রোত। দক্ষিণ মহাসাগরের ন উত্তর মহাসাগর হইতেও একটী প্রকাণ্ড স্রোত দক্ষিণাভি প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই স্রোত আবার গ্রীণলণ্ড দ্বীপ ক্ষিণ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া নিউফাউণ্ডলং নিকট উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয় এবং দুই ভ বিভক্ত হইয়া এক ভাগ কারিবসাগরে প্রবেশ করে ও অ ভাগ ইউনাইটেড ষ্টেটের উপকূল দিয়া প্রবাহিত হয়। স্রোতের সহিত মেরুদেশ হইতে বরফরাশি ভাসিয়া আসে বা লাব্রেডর প্রভৃতি স্থানে উৎকট শীত উপস্থিত হয়।

এই সকল স্রোতের দ্বারা আমাদের সমূহ উপকার সা হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা সমুদ্রজলের সমতা রক্ষা অর্থাৎ সমুদ্রের কুত্রাপি অধিক ও কুত্রাপি অল্প জল থাকিতে না। সমুদ্রের সকল স্থানের জলই যে সমভাবে লবণাক্ত এই সকলই তাহার প্রধান কারণ। ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্ব সমশীতোষ্ণতা রক্ষা হইয়া থাকে, এবং সমুদ্রপথে যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা হয়।

ভারত মহাসাগরে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইয়া থা শীতের ছয়মাস কাল উত্তর পূর্ব্ব হইতে প্রবল বায়ু প্রবা হইতে থাকে, এইজন্য এই ছয় মাস কাল তথায় উত্তর পূর্ব্ব হই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবল স্রোত বহিতে থাকে, আবার য

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ভারত মহাসারের উপর দিয়া উর্দ্ধরপূর্ব্ব অভিমুখে বায়ু বহিতে থাকে তখন ঐ দিকে স্রোত ও প্রবাহিত হয়।

বেলা বা জোয়ার ভাটা।—উপরে সমুদ্রজলের যে দুই প্রকাব গতির বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্ভিন্ন উহার আরও এক প্রকার গতি আছে। উল্লিখিত দুই প্রকার গতিই বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ক্ষণিক বায়ুপ্রবাহদ্বারা তরঙ্গের, ও নির্দ্দিষ্ট চিরস্থায়ী বায়ুপ্রবাহদ্বারা স্রোতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু নিম্নে যে প্রকার গতির বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে তাহার সহিত বায়ুর কিছু-মাত্র সম্পর্ক নাই। কলিকাতায় বাস করিলে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে দিবারাত্রির মধ্যে কলিকাতার নিম্নস্থ নদীর জল দুইবার স্ফীত হইয়া উঠে। দিবসে এক বার ও রাত্রিতে একবার এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। জল প্রতিবার স্ফীত অবস্থায় প্রায় ৬ ঘণ্টা কাল অবস্থিত থাকে, আর ছয় ঘণ্টা কাল আবার নামিয়া পড়ে ও সেইরূপ অবস্থাতেই থাকে। অতএব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টাকাল জলের স্ফীত অবস্থা ও আর ১২ ঘণ্টা কাল উহার স্বাভাবিক অস্ফীত অবস্থা। আমরা আরও দেখিতে পাই যে এইরূপ জলস্ফীতি দিন রাত্রির মধ্যে যখন তখন উপস্থিত হয় না, উহা নির্দ্দিষ্ট সময়েই হইয়া থাকে। দশমীর দিন প্রাতঃকালে ৬ টার সময় জল ফাঁপিয়া উঠে, পরদিন ৬ টা ৫৪ মিনিটে ঐরূপ হয়, আবার তার পর দিন ৭ টা ৪৮ মিনিটে ঐরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিদিন ৫৪ মিনিট করিয়া সময়ের অগ্রপশ্চাৎ হইয়া থাকে। আমরা আরও দেখিতে পাই, যে এই নৈসর্গিক ঘটনার সহিত বায়ুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, বায়ু থাকুক আর নাই থাকুক, প্রতিদিন নির্দ্ধারিত সময়ে

উল্লিখিত জলসংক্ষোভ অবশ্যই হইবে, উহা কোন প্রকা নিবৃত্ত হইবার নহে। এইরূপ জলস্ফীতিকে জোয়ার কহে, এ জলের স্বাভাবিক নিম্ন অবস্থা ও জোয়ারের পর ক্রম জল কমিয়া যাওয়াকে ভাটা কহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে নদীর জল কি কারণে প্রতিদিন নির্দ্ধারিত সময়ে স্ফী হইয়া উঠে, কি কারণেই বা ৫।৬ ঘণ্টা কাল স্ফীত অবস্থ থাকিয়া পুনর্ব্বার নামিয়া পড়ে। এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান ক অতিশয় সহজ। কলিকাতা হইতে ৫০।৬০ ক্রোশ দক্ষিণে গম করিলেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মা হইয়া দুই চারি দিন পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পা যে প্রতিদিন অর্থাৎ দিন রাত্রির মধ্যে দুইবার করিয়া সমুদ্রে জল স্ফীত হইয়া উঠে,এবং ৫।৬ ঘণ্টাকাল ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার নামিয়া পড়ে। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে এই প্রকার জলোচ্ছ্বাস বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হয় না, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে দিবস কিছুমাত্র বায়ুর সঞ্চার থাকে না, সে দিবস ও যেরূপ জল স্ফীত হইয়া উঠে, যে দিবস প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, এমন কি জল যে দিকে অগ্রসর হয় বায়ু তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, সে দিবস ও অবিকল সেইরূপে জল স্ফীত হইয়া উঠে, কোন কারণেই উহার নিবৃত্তি হয় না। সমুদ্রের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশেই যে উক্তরূপ ঘটনা হইয়া থাকে এরূপ নহে, উহার যে অংশেই যাওয়া যাউক না কেন সর্ব্বত্রই প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্তরূপ জলোচ্ছ্বাস দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকেই সমুদ্রের বেলা অর্থাৎ জোয়ার ভাটা কহে। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সমুদ্রে জোয়ার হইলে ঐ জোয়ারের জল নদীর মুখ দিয়া বেগে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ

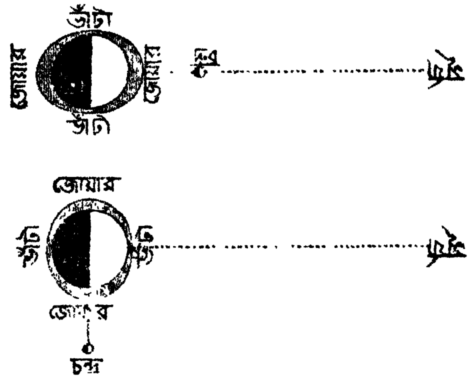
করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই গঙ্গাপ্রভৃতি নদীতে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্টসময়ে জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে। সমুদ্রে প্রতিদিন যথাসময়ে জোয়ার ও ভাটা হইয়া থাকে, ইহা আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু কি কারণে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা সহজে বুঝা যায় না। আমরা অবগত আছি যে সৌর-জগতের যাবতীয় পরমাণু পরস্পর আকর্ষণ করিয়া থাকে, পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ হইতে ফল ভূতলে পতিত হয়, পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই আমরা উহার পৃষ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছি। পৃথিবী যেরূপ উহার পৃষ্ঠস্থ পদার্থসমূহকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ সৌরজগতের প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহাদি অন্যকে নিজ কেন্দ্রের দিকে নিয়তই আকর্ষণ করিতেছে, ইহা-কেই মাধ্যাকর্ষণ কহে। মাধ্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে ও পৃথিবীদ্বারা নিজেও আকৃষ্ট হইতেছে। সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্র এবং আকারেও যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহাদি অপেক্ষা বৃহৎ, এই জন্য অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের আকর্ষণ অতিশয় প্রবল। চন্দ্র একটী উপগ্রহ, ইহা পৃথি-বীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র যদিও সূর্য্য বা পৃথিবী অপেক্ষা পরিমাণে অনেক ক্ষুদ্র, কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীর প্রতি উহার আকর্ষণ ও প্রভূত। ফলতঃ চন্দ্র অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া উহার আকর্ষণ সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষাও অধিক। যদি চন্দ্রের আকর্ষণ ১০০ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের আকর্ষণ ৩৮ মাত্র হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবীর স্থল ও জলভাগ উভয়ই সমান-রূপে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু স্থলভাগ কঠিন ও দৃঢ় বলিয়া বিচলিত হয় না, সুতরাং উহার উপর চন্দ্রাদির আকর্ষণবশতঃ কোন

প্রকার পরিবর্ত্ত সংঘটিত হয় না, কাজেই উক্ত আকর্ষণ আমরা অনুভব করিতেও পারি না, কিন্তু জলভাগ তরল বলিয়া উক্ত আকর্ষণকে প্রতিহত করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, সুতরাং স্থানভ্রষ্ট হইয়া উর্দ্ধে স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সমুদ্রের জোয়ার বা বেলা কহে। পৃথিবীর যে পৃষ্ঠ চন্দ্র ও সূর্য্যের অভিমুখে অবস্থিত, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া উহারই উপরিস্থ জলভাগ উর্দ্ধগতিবশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু পৃথিবীর যে অংশ সূর্য্য ও চন্দ্রের বিপরীতদিকে অবস্থিত, উহা সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী, সুতরাং তথায় উহাদের আকর্ষণ ও অত্যল্পমাত্র, কিন্তু কোন গোলাকার-দ্রবপদার্থের এক ভাগ উর্দ্ধে আকৃষ্ট হইলে, অপর ভাগ শিথিল হইয়া নিম্নের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। এই কারণপ্রযুক্ত যখন পৃথিবীর এক ভাগ চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়াতে তত্রত্য সাগরপৃষ্ঠে জোয়ার উপস্থিত হয়, ঠিক সেই সময়েই অপরভাগস্থ সমুদ্রের জল শিথিল হইয়া নিম্নে ঝুলিয়া পড়ে, অর্থাৎ স্ফীত হইয়া উঠে। সুতরাং পৃথিবীর যে ভাগ চন্দ্রের অভিমুখ ও যে ভাগ উহার বিপরীতদিকে অবস্থিত, উভয় স্থানেই এক সময়ে জোয়ার উপস্থিত হয়। আবার যে যে স্থানে জোয়ার উপস্থিত হয়, তাহাদের পার্শ্বদ্বয়ের জলভাগ সেই জোয়ারের স্থানে সরিয়া যাওয়াতে ঐ দুই পার্শ্বে ভাটা উপস্থিত হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থানেই দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা উপস্থিত হইয়া থাকে।

যদি পৃথিবী স্থির থাকিত ও সম্পূর্ণরূপে জলদ্বারা আবৃত হইত, তাহা হইলে সাগরের জল সমভাবে কেবল স্ফীত হইয়া উঠিত। কিন্তু পৃথিবী স্থির নহে, ইহা নিরন্তর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে

মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রও স্থির নহে, ইহাও মণ্ডলাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। চন্দ্র ২৭ দিন কয়েক ঘণ্টা সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, অতএব পৃথিবীর একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে যত সময় লাগে, তন্মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীকে ১৩ বার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী এক অহোরাত্রে একবার আপন মেরুদণ্ডকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই উভয়ের গতিবশতঃ আমাদের বোধ হয় চন্দ্র প্রায় ২৫ ঘণ্টা সময়ে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে একবার পৃথিবীমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই কারণপ্রযুক্ত সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না, উহা স্ফীত হইবার পর একটী প্রকাণ্ড তরঙ্গের ন্যায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান হয়, অর্থাৎ চন্দ্রের প্রতীয়মান পথের অনুগমন করিয়া থাকে, এবং ২৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট সময়ে একবার সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। পৃথিবীর গতিবশতঃ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থান ২৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ব্যবধানে এক এক বার চন্দ্রমণ্ডলের অভিমুখীন হয়, আবার ক্রমশঃ চন্দ্রের বিপরীত দিকে পতিত হয়। যখন যেস্থান চন্দ্রের অভিমুখে অবস্থিত থাকে, তখন তথায় জোয়ার হয়, আবার যখন উহা পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় তখন ও পূর্ব্বোক্ত কারণে তথায় জোয়ার উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অহোরাত্রের মধ্যে পৃথিবীর সকল অংশেই দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হইয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টায় সমগ্র অহোরাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্র ২৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট সময়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য প্রতিদিন ৫৪ মিনিট ব্যবধানে জোয়ার হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে দিন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেলা ৬ টার সময় জোয়ার

হয়, তথায় পরদিন ৬ টা ৫৪ মিনিটের পর জোয়ার হইয়া থাকে। এই কারণেই আবার দিন ও রাত্রির জোয়ারের মধ্যে ও ২০।২৫ মিনিট সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে।



জোয়ার ভাটা।

চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উভয়ের আকর্ষণবেগ সমান নহে, সূর্য্য অতিশয় বৃহদাকার হইলেও অত্যন্ত দূরে অবস্থিত বলিয়া উহার আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক অল্প। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক। যদি চন্দ্রের আকর্ষণ না থাকিত, তাহা হইলেও কেবল সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার উৎপন্ন হইতে পারিত, কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণে জোয়ারের তারতম্য হইয়া থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই দুই দিবস চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়, সুতরাং ঐ দুই দিবস উভয়ের শক্তি সমবেত হইয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্য অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই দুই দিবস জোয়ারের বেগ

র্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া থাকে। ইহাকেই কটাল কহে। টালের পর ক্রমশঃ পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই নিজ নিজ পথে অগ্র-র হইতে থাকে এবং এইরূপ অগ্রসর হইতে হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণ ভয় অষ্টমীর দিবসেই সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পর সমকোণ করিয়া দস্থিত হয়, এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীকে আকর্ষণ রিতে থাকে, ইহার ফলস্বরূপ ঐ দুই দিবস চন্দ্রের কর্ষণশক্তি প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়া যায়, এবং দাপেক্ষা জোয়ারের তেজ অল্প প্রবল হইয়া থাকে। ইহাকেই া জোয়ার কহে। পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পর ক্রমশঃ জোয়া-র বেগ কমিতে আরম্ভ হয়, আর অষ্টমীর পর পূর্ণিমা বা াবস্যা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ পূর্ণিমা ও াবস্যায় বৃদ্ধির চরম সীমা, আর অষ্টমীতে হ্রাসের চরম সীমা।

কিন্তু বৎসরের মধ্যে সকল সময়েই যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ন জোয়ারের সমানরূপে বৃদ্ধি হয় এরূপ নহে। পৃথিবী ও া উভয়েরই ভ্রমণপথ সম্পূর্ণরূপে গোলাকার নহে, ডিম্বকে াবলম্বদিকে ছেদ করিলে ছেদমুখের যেরূপ আকার হয়, দয় গ্রহ উপগ্রহের ভ্রমণপথ ও অবিকল সেই আকারের, ই জন্য সূর্য্য ও চন্দ্র সকল সময়ে পৃথিবী হইতে সমান দূরে স্থিতি করে না, সময়ে সময়ে তাহাদিগের দূরত্বের তারতম্য খা থাকে। যখন চন্দ্র পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয় সেই ই সময়েই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন জোয়ারের অত্যন্ত াদুর্ভাব হয়। ইহাকেই তেজ কটাল কহে। আর যখন চন্দ্র থিবী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত থাকে, তখন অমাবস্যা ও র্ণিমাতেও জোয়ারের তাদৃশ তেজ হয় না। এইজন্য ইহাকে া কটাল কহে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে ভূমণ্ডলের দক্ষিণার্দ্ধে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ অধিক, আর উত্তরার্দ্ধে জল অপেক্ষা স্থলের ভাগ অধিক, এমন কি, তত্রত্য মহাসাগর কয়টীকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহাসাগর বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর যে ভাগ চন্দ্রের অধিকতর নিকটস্থ, তথায় জোয়ার অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডল পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা চন্দ্রের নিকটস্থ বলিয়া এই স্থানেই জোয়ারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাদুর্ভাব, আর গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে উভয় দিকে যতই মেরুর অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই চন্দ্রের আকর্ষণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, সুতরাং জোয়ারের তেজও ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া যায়। যদি ভূমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে জলময় হইত, তাহা হইলে জোয়ার একটী অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিত। কিন্তু পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে স্থলের ভাগ অধিক ও উহার আকারও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জোয়ারের প্রবাহ নানাস্থানে নানা প্রকার বাধা পাইয়া থাকে, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দিকের অভিমুখে ধাবিত হয়। দক্ষিণ মহাসাগরে এইরূপ বাধা প্রায় নাই বলিয়া তত্রত্য জল অধিকপরিমাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সুতরাং এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম জোয়ারের আরম্ভ হয়। দক্ষিণ মহাসাগরে জোয়ার আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ ভারত মহাসাগর আটলাণ্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ধাবিত হয়। ভারত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরে জোয়ারের গতি উভয় মুখেই হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত ট্যাসমেনিয়া দ্বীপে রাত্রি ঠিক দুই প্রহরের সময় জোয়ার উপস্থিত হয়, এই জোয়ার ১২ ঘণ্টার

ধ্য সিংহল এবং প্রায় ১৩ ঘণ্টায় উত্তমাশা অন্তরীপে উপনীত । ইহা সিংহল হইতে উত্তরমুখে ধাবিত হইয়া বঙ্গ উপসাগরে পঁহুছিত হয়, এবং মেঘনা হুগলী প্রভৃতি নদীর ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক তথায় জোয়ার উৎপন্ন করে। ট্যাসমেনিয়া হইতে ১ ঘণ্টায় উত্তমাশায় উপস্থিত হইয়া আরও ১২ ঘণ্টার মধ্যে উকাউণ্ডলণ্ডের নিকট পৌঁছে, তথা হইতে আবার ১২ ঘণ্টার স্কটলণ্ডের উত্তরে আবারডিন নগরের নিকট উপনীত হয়, থা হইতে আরও ১২ ঘণ্টায় মধ্যে উহা টেমস্ নদীর মোহানায় উপস্থিত হয়, এবং প্রথম জোয়ার আরম্ভ হইবার পর তৃতীয় বসের প্রাতঃকালে লণ্ডন সেতুর নিকট পৌঁছিয়া থাকে। ইহা রা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে একটী জোয়ারের সমস্ত থিবী পরিভ্রমণ করিতে যত সময় লাগে, তন্মধ্যে তিন চারিবার তন জোয়ার উপস্থিত হয়।

সমুদ্রের যে অংশ অতিশয় প্রশস্ত ও গভীর, ও যেথানে দ্বীপাদির তাদৃশ বাধা নাই, তথায় জোয়ারের তরঙ্গ ভয়ানক বেগে ধাবমান হয়। দক্ষিণ মহাসাগরে ইহা প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, আটলাণ্টিক মহাসাগরে ইহা ঘণ্টায় ৫০০ মাইলের ও অধিক পথ অতিক্রম করে, কিন্তু উত্তর মহাসাগরে জল অপেক্ষাকৃত অল্প ও ভূমির বাধা প্রচুর বলিয়া ইহা প্রতি ঘণ্টায় ৫০ মাইল অপেক্ষা অধিক যাইতে পারে না। আফ্রিকার দক্ষিণ হইতে ইউরোপের দক্ষিণপশ্চিম পর্য্যন্ত জোয়ার উপস্থিত হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪।১৫ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে জল অল্প ও সর্ব্বত্রই ভূমির বাধা বলিয়া জোয়ারের বেগ অনেক কমিয়া যায়। আয়রলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হইয়া তথাকার প্রতিঘাতে উহা

দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, এক অংশ আয়রলণ্ড ও স্কটলণ্ডের পশ্চিম পার্শ্ব অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হয়, এইরূপে সমগ্র ব্রিটিসদ্বীপ ১৯ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রদক্ষিণ করিয়া উভয় তরঙ্গ একত্রিত হইয়া টেমস্ নদীর মোহ না দিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে গভীর ও প্রশস্ত সাগরাংশে জোয়ারের প্রবাহ ভয়ানক বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে. এমন কি কোথাও কোথাও প্রতি ঘণ্টায় ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত উহার গতি হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগে জোয়ার এত অধিক বেগে প্রবাহিত হইলেও, তৎকালে উহার উপর ভাসমান জাহাজ অথবা জলীয় পক্ষী প্রভৃতি সেই বেগে অগ্রসর হয় না, বিনষ্টও হয় না, ইহার কারণ কি? এইরূপ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন নহে। অন্যান্য যাবতীয় তরঙ্গের ন্যায় জোয়ারের তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার সময়েও সমুদ্রের উপরিভাগমাত্র আন্দোলিত হয়, নিম্নভাগ অবিচলিত থাকে। ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইলে যেরূপ ধানগাছের অগ্রভাগমাত্র বায়ুর বেগে নত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়, নিম্নভাগ অবিচলিত থাকে, সেইরূপ জোয়ারের সময়েও সমুদ্রের জল কেবল হেলিয়া পড়ে এইমাত্র, সমুদয় জলের গতি হয় না। সমগ্র জলরাশি জোয়ারের সময় যদি উল্লিখিত বেগের সহিত অগ্রসর হইত, তাহা হইলে জাহাজ প্রভৃতি কখনই ওরূপ বেগ সহ্য করিতে পারিত না। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে যে যেখানে জোয়ার অতি ভয়ানক বেগে অগ্রসর হয়, তথায় সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়া কেবল বেগটীমাত্র সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এবং জাহাজাদি উহার

সহিত একবার উর্দ্ধে উঠিতে থাকে আবার নামিয়া পড়ে, বিশেষ অগ্রসর হয় না। কিন্তু সমুদ্রের যে অংশে জল অগভীর ও সেখানে পার্শ্বস্থ স্থলভাগ ও নিম্নে নিমগ্ন চড়া প্রভৃতির বাধা আছে, তথায় ঐ সকল বাধার ঘর্ষণে জোয়ারতরঙ্গের বেগের হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু উহা উক্তপ্রকার বাধার আধিক্য বা ন্যূনতা অনুসারে অধিক বা অল্প উন্নত হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে অগ্রসর হইতে থাকে। এইজন্য সঙ্কীর্ণ ও অগভীর সাগরাংশে জোয়ারের সময় জাহাজাদির বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা।

সমুদ্রের প্রশস্ত ও গভীর অংশে কখনো জোয়ারের সময়েও জলপ্রবাহ তাদৃশ উচ্চ হইয়া উঠে না, কেবল ক্রমাগত ৬ ঘণ্টা-কাল জল স্ফীত হইয়া উঠে, আবার ৬ ঘণ্টাকাল নামিয়া পড়ে, আবার উঠে, আবার নামিয়া পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগর অতিশয় গভীর ও প্রশস্ত বলিয়া তত্রত্য জল জোয়ারের সময় গড়ে এক ফুট অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠে না, কিন্তু আটলাণ্টিক মহাসাগরে সেণ্টহেলেনা দ্বীপের নিকট উহা তিন ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রের যে অংশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও যাহার জলের নিম্নে চড়া আছে, তথায় জোয়ারের তরঙ্গ অনেক দূর উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরে জোয়ারতরঙ্গের উন্নতি গড়ে ১।২ ফুট হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহাসাগরে ৫।৬ ফুট। আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগরে গড়ে ৮।১০ ফুট হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল সাগরশাখার মুখ প্রশস্ত, অথচ অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, তথায় জোয়ারের তরঙ্গ প্রশস্ত মুখ দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক সঙ্কীর্ণ অভ্যন্তর ভাগে যথেষ্ট স্থান পায় না বলিয়া অতিশয় উচ্চ হইয়া উঠে। এইজন্য বঙ্গসাগর, ফণ্ডী উপসাগর, ব্রিষ্টল চ্যানেল,

সলওয়ে ফর্থ প্রভৃতি স্থানে উহা কখন কখন ৩০। ৪০ হইতে ৭০।৮০।১০০ ফুট পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া উঠে।

ভাটার সময় নদীর জল নির্গত হইয়া মোহানা দিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এইরূপে ভাটার জল সমুদ্রের অভিমুখে আসিবার সময় কখন কখন সমুদ্রে জোয়ার হয়, এবং ঐ তরঙ্গ নদীর মোহানা দিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এইরূপ হইলে উভয় প্রবাহ পরস্পর অভিমুখীন ও প্রতিহত হইয়া জলময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, এবং সেই জলরাশি সহজেই নদীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উহার একপার্শ্ব দিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হয়। ইহাকেই বাণ কহিয়া থাকে। এই বাণের তরঙ্গ ১০ ফুট হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে, এবং ইহা দ্বারা জীবজন্তু নৌকা প্রভৃতির ভয়ানক অমঙ্গল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইউরোপের পশ্চিমাংশে এল্‌ব, ওয়েসর, সীন, ও গারোন এই কয়টা নদীতে বাণ হয়, সীন নদীর মোহানায় বাণের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৬ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ও উহা ৬ হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া যায়। আমাদের দেশে কেবল হুগলী ও মেঘনা নদীতেই বাণ হইয়া থাকে, উহা কখন কখন ৬ হইতে ৭।৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে সেবরন্ নদীতে বাণ হয়, আর দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজন নদীতেও বাণ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য নদীতে বাণের প্রভাব দৃষ্ট হয় না। অগভীর জলে ও চড়ার উপর বাণের অতিশয় উপদ্রব হইয়া থাকে, কিন্তু গভীর জলে উহার প্রভাব ততদূর অনুভূত হয় না, হুগলী ও মেঘনা নদীর যে যে অংশ অপেক্ষাকৃত অগভীর, তথায় বাণের দৌরাত্ম্যে অনেক সময়ে অনেক নৌকা মারা পড়িয়া থাকে। এইজন্য বাণ আসিলেই

মাঝিরা নিজ নিজ নৌকা গভীর জলে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

বাল্‌টিক সাগর, ভূমধ্য সাগর প্রভৃতি যে সকল উপসাগরের মুখ অপ্রশস্ত ও জোয়ারপ্রবাহের অভিমুখে স্থাপিত নহে, তথায় জোয়ার প্রায়ই অনুভূত হয় না, এবং তাহারা বড় বড় মহাসাগরের সহিত তুলনায় অতিশয় অল্পায়তন বলিয়া তাহাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জোয়ারেরও প্রাদুর্ভাব নাই। এই কারণে কৃষ্ণসাগরে কাম্পীয়ানে জোয়ারের কোন লক্ষণই অনুভূত হয় না।

স্থলভাগের বিশেষ বিশেষ আকার অনুসারে কখন কখন কোন কোন স্থানে জোয়ারের নিয়ম সম্পূর্ণরূপে বিপরীত হইয়া যায়, কোথাও দিন রাত্রির মধ্যে ৩।৪ বার জোয়ার দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও বা একবারও জোয়ার হয় না। দক্ষিণসাগরে কোন কোন দ্বীপের নিকট বেলা দুই প্রহর ও রাত্রি দুই প্রহরের সময় জোয়ার হইয়া থাকে।

অন্যান্য তরঙ্গের ন্যায় জোয়ারের তরঙ্গেও দেশাদির উপকূল ভগ্ন হইয়া যায়, এবং ঐ সকল উপকরণ স্থানান্তরে নীত হইয়া নূতন নূতন দ্বীপাদির সূত্রপাত করিয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্থল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্থলভাগের সাধারণ বিবরণ—মহাদেশ ও দ্বীপ। ১।

বায়ু ও জল পৃথিবীপৃষ্ঠের আবরণস্বরূপ। এই জন্য ঐ দুইটী বিষয় নিঃশেষ করিয়া সংপ্রতি স্থলভাগের বিষয় হইতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে যত স্থল আছে তাহার পরিমাণ ৫২ কোটি বর্গ মাইল হইবে। ভূপৃষ্ঠে জলের ভাগ স্থল অ প্রায় তিন গুণ অধিক। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত ক ছেন যে সৃষ্টির আদিম অবস্থায় সমুদয় ভূমণ্ডল এক মাত্র জ আচ্ছাদিত ছিল, কালক্রমে ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক শক্তিও জলনিমগ্ন স্থলভাগ সাগরপৃষ্ঠ ভেদপূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত মহাদেশ দ্বীপ উপদ্বীপাদিরূপে পরিণত হইয়াছে। অতি ও কালে সমগ্র পৃথিবী যে জলময় ছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান ক আমরা তাহার প্রমাণ পাইতে পারি। পৃথিবীর যে কো খনন করিলে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির নিম্নভাগে জলজন্তুর দে দেখিতে পাওয়া যায়, হিমালয় ও আল্পস্ পর্ব্বতের গগ শৃঙ্গের উপরেও জলজন্তুসমূহের কঙ্কালপ্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ঐ সমস্ত সামুদ্রিক দেহাবশেষ, অন্য কোন প্রকার জীবের নহে। পৃথিবী স্থানেই এইরূপ ঘটনা নিরন্তর প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএ

প্রতীয়মান হইতেছে, যে পৃথিবীর সকল অংশেই যখন এইরূপ সামুদ্রিক জীবজন্তুর মৃতাবশেষ পাওয়া যায়, তখন অবশ্যই কোন না কোন কালে সমগ্র পৃথিবীই সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল, পরে ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক শক্তির প্রভাব ও অন্যান্য কারণে উহার কিয়দংশ সমুদ্রবারি ভেদপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া দেশ মহাদেশাদিরূপে মনুষ্যের আবাসভূমিস্বরূপ হইয়াছে, আর যে অংশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার উপর মহাসাগরাদি জলভাগ অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে।

সম্মুখে ভূমণ্ডলের মানচিত্র অথবা কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত গোলক সংস্থাপিত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে জল ও স্থলের বিবরণ অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা দুইটী সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দেখিতে পাই, ভূমিখণ্ডদ্বয়ের চতুর্দ্দিকেই অপারসাগর আমাদের নয়নগোচর হয়, আবার সাগরের মধ্যস্থলেও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ ভূমিখণ্ড আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। যে দুইটী বিশাল ভূমিখণ্ডের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহাদের একটীর নাম, প্রাচীন ও অপরটীর নাম নূতন মহাদ্বীপ। আর যে সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড সাগরের উপরিভাগে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে উহাদিগের নাম দ্বীপ। আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্বদিকে যে সুবিশাল ভূভাগ রহিয়াছে তাহাকে প্রাচীন মহাদ্বীপ ও উহার পশ্চিমদিকে যে ভূভাগ রহিয়াছে তাহাকে নূতন মহাদ্বীপ কহে। প্রাচীন মহাদ্বীপ আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন অংশে বিভক্ত, ইহাদের প্রত্যেকটীকে এক একটী মহাদেশ কহে। আসিয়া ও ইউরোপ একই মহাদেশ, কেবল উভয়ের মধ্যে কিয়দংশে একটী পর্ব্বতের ব্যবধান আছে, আর কিয়দংশ সাগরশাখাদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

এই উভয় ভূভাগই বিষুববৃত্তের উত্তরে অবস্থিত ও পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ। আফ্রিকাখণ্ডের দুই ভাগ বিষুববৃত্তের উত্তরে, ও এক ভাগ উহার দক্ষিণে অবস্থিত, এবং উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। আসিয়া খণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ ও তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীন ও নূতন মহাদ্বীপ এই উভয়ের মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। এইগুলি পূর্ব্বকালে বোধ হয় একই ভূমি-খণ্ড ছিল, কালক্রমে কোন নৈসর্গিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়া ও তৎসন্নিহিত দ্বীপাদিকে একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। নূতন-মহাদ্বীপের মধ্যে দুইটী মহাদেশ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এই দুইটী পানেমানামক যোজকদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহারা উত্তর মেরু হইতে প্রায় দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে বিষুবরৃত্তের উত্তরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৫০০০০০ বর্গক্রোশ ও দক্ষিণে প্রায় ৩৩,৭৫০০০ বর্গক্রোশ ভূমি আছে। সুতরাং পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধ অপেক্ষা উত্তরার্দ্ধে স্থল প্রায় তিন গুণ অধিক।

স্থলভাগের অধিকাংশ পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে অবস্থিত, পৃথিবীর ঐ অংশেই উহার বিস্তৃতিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উত্তরার্দ্ধ অপেক্ষা দক্ষিণার্দ্ধে স্থলের পরিমাণ অনেক অল্প বটে, কিন্তু দক্ষিণার্দ্ধেও কয়েকটী প্রকাণ্ড ভূখণ্ড যেন উত্তরার্দ্ধের অঙ্গস্বরূপ লম্বমান রহিয়াছে। অতএব সমগ্র স্থলভাগকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই দুই স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাচীন মহাদ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধে যথাক্রমে আফ্রিকার কিয়দংশ ও অষ্ট্রেলেসিয়া অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া ও তৎসন্নিহিত দ্বীপশ্রেণী, আর নূতন মহাদ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধে দক্ষিণ আমেরিকা। সমগ্র স্থলভাগের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহা

দের উত্তরভাগ প্রশস্ত অভগ্ন ও পরস্পরসম্বদ্ধ, কিন্তু দক্ষিণ ভাগ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া অবশেষে প্রায় ত্রিকোণের ন্যায় আকারে সূচ্যগ্রবৎ হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে যত উপদ্বীপ আছে সমুদয়গুলিই প্রায় উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে লম্বমান রহিয়াছে, কেবল মধ্য আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী য়ুকেটান, ইউরোপের অন্তর্গত জটলণ্ড, ও আর দুই চারিটী উপদ্বীপ এই নিয়মের অনুবর্ত্তী নহে, ইহারা দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে উত্থিত হইয়াছে। যে সকল উপদ্বীপ দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিত, তৎসমুদয় প্রায়ই উন্নত ও পাহাড়ময়, আর অন্যান্য সমুদয়গুলিই প্রায় নিম্ন ও বালুকাময় হইয়া থাকে। প্রায় সমুদয় উপদ্বীপেরই দক্ষিণপূর্ব্বে একটী বা একটী দ্বীপ অথবা দ্বীপশ্রেণী দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয় উহারা পূর্ব্বকালে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে টেরা-ডেল-ফিউগো, আফ্রিকার দক্ষিণে মাডাগস্কর, ফ্লরিডার দক্ষিণে কতকগুলি দ্বীপশ্রেণী, ইটালির দক্ষিণে সিসিলি, ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে ট্যাসমেনিয়া।

আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই অর্দ্ধের পরস্পর তুলনা করিলে প্রতীত হইবে যে পূর্ব্বার্দ্ধে পশ্চিমার্দ্ধ অপেক্ষা স্থলভাগ ২½ গুণ অধিক। আবার উত্তর সমমণ্ডলে স্থলভাগ যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অন্য কুত্রাপি সেরূপ নহে, আসিয়া ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উৎকৃষ্ট অংশ উত্তর সমমণ্ডলে অবস্থিত। এই ভূভাগেই মনুষ্যজাতি সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা সমধিক উন্নতিসাধন করিয়াছে। সমুদয় স্থলভাগের প্রায় অর্দ্ধাংশই এই মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। গ্রীষ্মমণ্ডলে যত স্থল আছে সমুদয় একত্র করিলে সমগ্র

স্থলভাগের এক তৃতীয়াংশও হইবে না। উত্তর হিমমণ্ড
গ্রীণলণ্ড প্রভৃতি কয়কটী দ্বীপ ও দেশ আছে কিন্তু দক্ষি
হিমমণ্ডলে অদ্যাপি কোন বিশিষ্ট স্থলভাগ আবিষ্কৃত হয় না।
বিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড প্রভৃতি যে দুই একটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়া
তৎসমুদয় চিরকাল বরফে আবৃত থাকে বলিয়া উহাদিগ
অতিক্রমপূর্ব্বক অগ্রসর হওয়া যায় না।

দ্বীপ—যে কয়টী প্রধান প্রধান ভূমিখণ্ডের বিষয় উল্লিখি
হইল, তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর আরও বহুসংখ
ভূখণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সাগরবেষ্টিত ভূখণ্ডসমূহের সাধা
নাম দ্বীপ। ভূ-গর্ভের যে শক্তিপ্রভাবে ইউরোপ আসিয়া প্রভৃ
মহাদেশসকল সাগরগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বী
গুলিও অবিকল সেই শক্তিবশতই সাগরের অগাধজলভেদপূর্ব্ব
ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, ফলতঃ কারণাংশে দ্বীপ ও মহাদেশসকলে
মধ্যে কোন প্রকার বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। সাগরের গর্ভ সর্ব্ব
সম্পূর্ণ সমতল নহে, স্থলভাগের ন্যায় উহারও কোন কোন অং
গভীর, কোন কোন অংশে অত্যুচ্চ পর্ব্বত, আবার কোথাও
বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ সাগরপৃষ্ঠস্থ দ্বী
সমূহ উহার অভ্যন্তরে নিমগ্ন পর্ব্বতের শিখরস্বরূপ। যে পর্ব্ব
সাগরের তলভাগ হইতে যত উচ্চ, উহার শিখরস্থ দ্বীপগুলি
তদনুসারে সাগরজলের সীমা হইতে অল্প বা অধিক উচ্চ হই
থাকে। আবার সাগরলীন পর্ব্বত সকলেরও আকৃতি নানাপ্রকা
উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র ও অসংশ্লিষ্ট আর কতকগু
শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রসারিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির অধিকাং
প্রস্তরময় এবং তৎসমুদয়ের অভ্যন্তরে প্রায়ই পর্ব্বত নদী প্রস্রবণা
লক্ষিত হয় না। কিন্তু বৃহদাকার দ্বীপসকল প্রায় মহাদেশের সদৃ

তথায় পর্ব্বত, নদী, উৎস প্রভৃতি নানাবিধ নৈসর্গিক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

দ্বীপসমূহের আকার প্রকারাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উহাদিগকে সর্ব্বশুদ্ধ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মহাদেশীয় দ্বীপ, সাগরীয় দ্বীপ, ও প্রবালকীটজ দ্বীপ।

মহাদেশীয় দ্বীপসমূহের আকৃতি ও উপকরণ প্রভৃতি তৎসন্নিহিত মহাদেশের ন্যায়, সুতরাং স্পষ্টই অনুমান হয় যে অতি প্রাচীনকালে এই সকল দ্বীপ সন্নিহিত ভূভাগের সহিত সংলগ্ন ছিল, পরে কালক্রমে কোন নৈসর্গিক কারণনিবন্ধন উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বস্থ অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ সিংহল, ইটালির দক্ষিণস্থ সিসিলি প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান।

সাগরীয় দ্বীপসমূহের আকৃতি অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র, উহাদিগের উপকরণ ও ভিন্নপ্রকার, এবং উহারা সচরাচর মহাদেশ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই ভূ-গর্ভস্থ অগ্নির উৎপাতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি আবার প্রবালকীটদ্বারা নির্ম্মিত। আসেন্‌সন সেণ্টহেলেনা প্রভৃতি দ্বীপ সাগরগর্ভস্থ অগ্নির উৎপাতে উৎপন্ন, আর মালদ্বীপ লাক্কাদ্বীপ ও প্রশান্তমহাসাগরীয় বহুসংখ্যক দ্বীপশ্রেণী প্রবালকীটদ্বারা উৎপাদিত। ইহাদের নির্ম্মাণপ্রণালীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়! প্রবালকীট অতিশয় ক্ষুদ্র কীট, ইহাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি নাই, কিন্তু ঈশ্বরের কি অপার মহিমা, ইহারা কোটি কোটি একত্র হইয়া বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের ন্যায় অনুক্ষণ মনুষ্যাদির জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেছে। সমুদ্রের যে সকল অংশের গভীরতা ১৫০ ফুট হইতে ১৮০

ফুট পর্য্যন্ত,প্রবালকীটসমূহ এইরূপ স্থানেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে। নিমস্থ ভূমি হইতে ইহারা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং এইরূপে ক্রমশঃ জলসীমাভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহাদিগের শরীর হইতে দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার শুক্লরস নির্গত হইতে থাকে, এই রস ক্রমশঃ কঠিন হইয়া তাহাদিগের গাত্রের আবরণস্বরূপ হয়, তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে তৎসমুদয় একত্র মিলিত হইয়া প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইয়া উঠে, তৎপরে আবার অন্যান্য জীবিত কীট তাহার উপর অবস্থিত হইয়া উল্লিখিতপ্রকারে নির্ম্মাণ করিতে থাকে, সুতরাং এই প্রকারে অসংখ্য প্রবালকীটের শরীর একত্র স্তূপাকার হইয়া প্রবালদ্বীপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে যখন সমগ্র দ্বীপ এত উচ্চ হইয়া উঠে যে ভাটার সময়ও তাহার উপর আর জল থাকে না, তদবধি আর কোন প্রবালকীট তাহার উপর আরোহণ করে না, এই স্থানেই তাহাদের কার্য্য শেষ হইয়া যায়, পরে জোয়ারের সময় শঙ্খ, শম্বূক, প্রবাল, বালুকাদি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, এই সমুদয় আবার তরঙ্গের বেগে ভগ্ন ও মিশ্রিত হইয়া স্তূপাকার হইয়া প্রস্তরের ন্যায় হয়, পরে সেই শিলাভূমি সূর্য্য কিরণে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। জোয়ারের সময় সেই সমুদয় খণ্ড ইতস্ততঃ চালিত ও বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে যে সকল ছিদ্র থাকে, তৎসমুদায় নানাবিধ সামুদ্রিক দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া এবং তাহার উপর মৃত্তিকাদি পতিত হইয়া উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি উৎপন্ন হয়। তখন নারিকেল তাল প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষের বীজ তরঙ্গের সহিত ভাসমান হইয়া তথায় আনীত অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং

ক্রমে সমগ্র দ্বীপ নবীন বৃক্ষতৃণলতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। দ্বীপের এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রমশঃ উহার উপর পক্ষী প্রভৃতি বাস করিতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে উহা মনুষ্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা, ঐ সকল দ্বীপ উৎপন্ন হইবার পর তত্রত্য ভূমি খনন করিলে সুস্বাদু মধুর জল পাওয়া যায়, প্রবালের সহযোগে সমুদ্রজলের লবণ পৃথক্কৃত হইয়া যায়, এবং তথায় বিশুদ্ধ জলের অভাব থাকে না, সুতরাং কালসহকারে মনুষ্য সেই কীটনির্ম্মিত দ্বীপকে সুখের আবাসভূমি করিয়া তুলে। প্রবালদ্বীপ নানা-বিধ আকারের হইয়া থাকে, কতকগুলি কেবল স্তূপাকার, কতক-গুলি অঙ্গুরীয়ের ন্যায়, সুতরাং ইহাদের ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই সমুদ্র, আবার কতকগুলি বা অঙ্গুরীয়ের মধ্যে স্তূপাকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ এই প্রকারে উৎপন্ন, ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটী প্রবালদ্বীপ।

প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপের যে প্রকার প্রাচুর্য্য, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশেষ অনুধাবন করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে প্রশান্ত মহাসাগরের অভ্যন্তরে একটী মাত্র সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকা হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং ইহারই শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র সাগরকে পর্ব্বতময় করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যাবতীয় দ্বীপ এই পর্ব্বতশ্রেণীর কোন না কোন শিখর।

ভারত মহাসাগরেও এইরূপ জলমগ্ন পর্ব্বতের অপ্রতুল নাই। মাডাগস্কর হইতে বোর্ন্বো দ্বীপ পর্য্যন্ত এইরূপ একটী দ্বীপ-

শ্রেণী উত্তরাভিমুখে বিষুবরেখাপর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে আর মলবার উপকূল হইতে একটী পর্ব্বতশ্রেণী বিষুবরেখার দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, এই শ্রেণীর শিখরে মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ। ভারতমহাসাগরের দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে সিংহল মাডাগস্কর মহাদেশীয় এবং বোরবোঁ মরিসস প্রভৃতি সাগরীয় দ্বীপ।

উত্তর মহাসাগরে মহাদেশীয় দ্বীপের মধ্যে গ্রীণলণ্ড সর্ব্বপ্রধান। এই প্রকাণ্ড দ্বীপ নিয়তই তুষারাবৃত থাকে, ইহার কোন কোন অংশে তুষারের গভীরতা ১০০০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এখানে সাগরীয় দ্বীপেরও অসদ্ভাব নাই। এই জাতীয় দ্বীপসমূহের মধ্যে আইসলণ্ডদ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উত্তর মহাসাগরে স্পিটজ্‌বর্জ্জন্‌ নামে আর একটী প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে ইহারও অধিকাংশ নিয়তই তুষারে আবৃত। এই দ্বীপ ও লাপলণ্ড প্রভৃতি স্থানে ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিন। রাত্রিকালে তথায় অরোঁরা বরিয়ালিস নামে এক প্রকার আলোক উদ্ভূত হইয়া থাকে, উহারই সাহায্যে তত্রত্য অধিবাসীরা কাজ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়।

দক্ষিণ মহাসাগরের অধিকাংশই নিরন্তর বরফে আচ্ছন্ন ও ভয়ানক শীতল, এই জন্য তথায় অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। এই কারণে ইহার অধিকাংশই অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। অত্রত্য দ্বীপসমূহের মধ্যে নিউজিলণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত বিক্টোরিয়াদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শীতের প্রাদুর্ভাবে প্রায় কোন প্রকার উদ্ভিজ্জই জন্মিতে পারে না।

উপকূল।—পৃথিবীর সকল অংশের উপকূল একপ্রকার নহে। কোন কোন স্থানের উপকূল অধিক উচ্চ নহে, বহুদূর

[?]তে ক্রমনিম্ন হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছে, কোথাও বা [স]মুদ্রতীর জলসীমা হইতে একবারে লম্বভাবে উত্থিত হইয়াছে। [সচ]রাচর এই প্রকার উপকূলের অব্যবহিত নিম্নে প্রায়ই গভীর [জ]ল, সুতরাং এইরূপ উপকূলে জাহাজ প্রভৃতি অনায়াসেই ভূমির [অ]তি নিকটে উপস্থিত হইয়া নঙ্গর করিতে পারে। আর যে [স]কল উপকূল ক্রমনিম্ন, তথায় অনেকদূর পর্য্যন্ত সাগরের জল [অ]গভীর ও ক্রমনিম্ন, সুতরাং এরূপ স্থলে জাহাজ প্রভৃতি কথ[ন]ই ভূমির নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। আবার ক্রমনিম্ন [উ]পকূলগুলি প্রায় বালুকা পঙ্ক প্রভৃতি কোমল উপকরণে সংঘ[টি]ত, কিন্তু একবারে উচ্চ উপকূল সকল কঠিন মৃত্তিকা ও [প্র]স্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে ভূপৃষ্ঠ একটী অখণ্ড [সম]ভূমি নহে, ইহার কোন কোন অংশ গভীর, তথায় বৃষ্টির জল [উচ্চ]স্থান হইতে গড়াইয়া পড়াতে নদী হ্রদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, কোন কোন অংশ সমভূমি, তথায় বৃষ্টির জল পতিত হইয়া [ভূ]মিকে শস্যশালিনী করিতেছে, কোন অংশ বালুকাময় মরুভূমি, [ত]থায় কোন প্রকার জীব ও উদ্ভিজ্জের বসতি নাই, কোন [কো]ন অংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এই উচ্চতার আধিক্য বা অল্পতা [অ]নুসারে পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে, আবার [কো]থাও বা উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ মেঘমণ্ডল ভেদপূর্ব্বক আকাশে [উ]ত্থিত হইয়াছে এবং চিরনীহারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ফলতঃ [স]মগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলে উহার আকারগত কতপ্রকার [বৈ]চিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কি কারণে [ও] কিপ্রকারে ধরিত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ [ক]রিয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করা সুকঠিন। পর পর পরিচ্ছেদে

যথাক্রমে পর্ব্বত নদী প্রভৃতির বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূভাগের উৎপত্তি, উপকরণ, আকার ও গঠনপ্রণালী।

ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অশেষবিধ ভিন্ন আকার ও অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মনে মনে স্বতই এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে যে এই অসীমবিশ্বরাজ্য কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? ইহা কিপ্রকার উপকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে? আমরা এক্ষণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাই, উহা কি আবহমান কাল এইরূপেই রহিয়াছে? সৃষ্টির সময়ে উহার যেখানে যে পর্ব্বত, যেখানে যে নদী, যেখানে যে সমুদ্র অবস্থিত ছিল, তৎসমুদয় কি অদ্যাপি অবিকল সেই স্থানে, সেই আকারেই অবস্থিত রহিয়াছে, না কালবশতঃ উহাদের পরিবর্ত্ত হইয়াছে? যদি পরিবর্ত্তই হইয়া থাকে, সৃষ্টির সময় পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা, কিরূপ আকার ছিল, কিরূপেই বা উহার পরিবর্ত্ত হইয়া অধুনাতন আকার সংঘটিত হইয়াছে? কিরূপে উহার পর্ব্বত, নদী, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, প্রস্রবণ, উৎস, প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া উহার আধুনিক অবস্থা সংঘটিত করিয়াছে? আমরা ভূপৃষ্ঠে অধুনা যে সকল জীবজন্তু দেখিতে পাই, সেই সকল জাতীয় জীবজন্তু কি চিরকালই পৃথিবীতে বাস করিয়া আসিতেছে, না ক্রমশঃ একজাতীয় জন্তুর বিনাশ ও অপরজাতীয় জন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে? মনুষ্য সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান জীব, এই জীব কি সৃষ্টির সময় হইতে আবহমান কাল পৃথিবীতে রাজত্ব

:রিতেছে, না সৃষ্টির সময় মনুষ্যের উৎপত্তি হয় নাই, উহারা ালক্রমে কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে? এই সকল প্রশ্ন ামাদের হৃদয়ে অনেক সময় উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের মাধান ও উত্তর প্রদান করা সহজ ব্যাপার নহে। আমরা তিবৃত্তের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে থিবীর কিরূপ অবয়বসংস্থান ছিল, তথায় কি কিরূপ জীবের সতি ছিল ইত্যাদি বিষয় কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারি বটে, কন্তু অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর কিরূপ আকার ছিল, পরে মশঃ কি প্রকারে নানাবিধ পরিবর্ত্ত হইয়া উহার আধুনিক াকার সংঘটিত হইল, সর্ব্বপ্রথম কিরূপ জীবের সৃষ্টি হয়, পরেই ।ক্রমশঃ কি কি প্রকার জীব উৎপন্ন হয়, এ সকল বিষয় ানিবার জন্য কোন ইতিবৃত্ত নাই, সুতরাং এই বিষয়ের সকল থ্য নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ও 'হ্য অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে য়, কিন্তু এরূপ অনুসন্ধানাদিদ্বারা আমরা প্রায়ই অভ্রান্ত ।দ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করিয়া-ছেন যে সৃষ্টির সময় পৃথিবী অগ্নিময় গলিত পদার্থ ছিল, ও উহার তুর্দ্দিকে বাষ্পরাশি উড্ডীয়মান ছিল। কোন লৌহময় গোলক গ্নিবৎ উত্তপ্ত হইবার পর উহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থাপিত রিয়া রাখিলে ক্রমশঃ উহার উত্তাপ বহির্গত হইতে থাকে, বং উহাও ক্রমশঃ শীতল হইয়া আইসে, উহার উপরিভাগ থমতঃ শীতল হয় কিন্তু অভ্যন্তরভাগ উষ্ণ থাকে, পরে, ভ্যন্তরভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায়। সৃষ্টির পর হইতে ধুনাতন কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর অবস্থা ও অবিকল ঐরূপ হই-

তেছে। উত্তপ্ত অয়োগোলকের ন্যায় পৃথিবীর ও আভ্যন্তরিক উত্তাপ ক্রমশঃ বহির্গত হইতেছে, এই জন্য উহার উপরিভাগ প্রথমতঃ শীতল হইয়া জীবজন্তুর আবাসভূমিস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অদ্যাপি উষ্ণ রহিয়াছে, এমন কি বহুদূর নিম্নে অদ্যাপি গলিত পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। অধুনা পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ এত দূর কমিয়া গিয়াছে যে যদি অল্প সময়ের নিমিত্ত ও পৃথিবী সূর্য্যের উত্তাপ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে অবিলম্বেই উহার পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই বরফে আচ্ছাদিত হইয়া উঠে এবং সমুদয় জীবজন্তু উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার কালক্রমে এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে পৃথিবীর অবশিষ্ট উত্তাপ টুকুও বিলুপ্ত হইবে ও উহা সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া যাইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন যে সূর্য্য অদ্যাপি উল্লিখিত প্রকারে উত্তপ্ত ও গলিত পদার্থ রহিয়াছে।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যাওয়াতে উহা ক্রমশঃ যতই শীতল হইয়াছে, ততই আবার উহার দ্রবত্ব ঘুচিয়া গিয়া উহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উহার অধুনাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিমকালে পৃথিবীর উক্তরূপ অবস্থা ছিল ইহা অনুধ্যান করিলে কি প্রকারে সমুদ্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহাও এক প্রকার বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পৃথিবী যৎকালে উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, সেই সময় নানাবিধ পদার্থের বাষ্পরাশি উহার চতুর্দ্দিকে উড্ডীয়মান ছিল, এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে যতই পৃথিবীর উত্তাপ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হওয়াতে উহা শীতল হইতে লাগিল ততই উহার উপরিস্থ বাষ্পরাশি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া

স্ব স্ব প্রকৃতিতে উপস্থিত হইতে লাগিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে ঐ সময় অন্যান্য পদার্থের ন্যায় পৃথিবীর উপরিস্থ জলীয় বাষ্পরাশিও ঘনীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হইয়াছিল। ফলতঃ তৎকালে উত্তাপের ক্রমিক হ্রাস হওয়াতে জলীয় পরমাণুসমূহ পরস্পরসংঘাতে ঘনীভূত হইয়া জলরূপে ভূপৃষ্ঠের উপর পতিত হইতে থাকে, এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঐ জলরাশি ভূপৃষ্ঠের উপর সংলগ্ন হওয়াতে সমগ্র পৃথিবী অগাধ জলে প্লাবিত হইয়া যায়। ঐ অগাধ জলরাশিই সমুদ্ররূপে পরিণত হয়, এবং ঐ অগাধ সমুদ্রে প্রথমতঃ মৎস্যাদি জলজন্তুর উদ্ভব হয়। পরে ক্রমশঃ ভূগর্ভের উত্তাপ আরও কমিতে থাকিলে উহার কিয়দংশ কুঞ্চিত হইয়া যায়, ও কিয়দংশ স্ফীত হইয়া জলভেদপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। কোন গোলাকার ফল নীরস ও শুষ্ক হইতে থাকিলে উহার পৃষ্ঠদেশের কিয়দংশ স্ফীত হইয়া থাকে, ইহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। পৃথিবীর দ্রবভাব অপগত হইয়া কঠিনসংযোগ হইবার সময় উহার আন্তরিক উত্তাপের নিয়ত ব্যয়বশতঃ অবিকল সেই ভাবে উহার পৃষ্ঠদেশের কিয়দংশ উন্নমিত হইয়া উঠে, কিয়দংশ উন্নমিত হইলেই আবার কাজে কাজেই কিয়দংশ কুঞ্চিত হইয়া নিম্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে অংশ জলভেদপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে তাহাই স্থল হইয়াছে, ও যে ভাগ কুঞ্চিত হইয়া নিম্ন হইয়াছে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে (অর্থাৎ জল নিম্নগ বলিয়া) তথায় সমুদয় জল একত্র হওয়াতে উহাই ক্রমশঃ মহাসাগর সাগর উপসাগর প্রভৃতিরূপে সংঘটিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর কিয়দংশ উন্নমিত হইয়া স্থলরূপে পরিণত হইল বটে, কিন্তু পার্শ্বস্থ জলরাশির প্রভাবে উহার নিয়তই ক্ষয়

পাইতে লাগিল। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই জলদ্বারা ভূমির ক্ষয় হইয়া থাকে, অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্থলভাগের প্রথম উদ্ভবের পর হইতে উহা নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যদি পৃথিবীর কোন আন্তরিক শক্তির প্রভাবে ঐ নিয়ত ক্ষতির নিয়ত পূরণ না হইত, তাহা হইলে সৃষ্টির পর অল্প দিনের মধ্যেই আবার সমগ্র স্থলভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি স্থলভাগের ক্ষয় হওয়াতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না, কারণ যেমন কোন স্থানে ক্ষয় হইতেছে, সেইরূপ আবার অপর কোন স্থানে নূতন ভূমির উদ্ভব হইতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ এই:—প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীতে ক্ষয় ও উৎপত্তি একত্রই সংঘটিত হইয়া থাকে। একটী অপরটীর নিয়ত সহচর, ফলতঃ প্রকৃতপ্রস্তাবে জগতের একটী পরমাণুর ও ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ নাই, আমরা যাহাকে ক্ষয় অথবা বিনাশ বলিয়া থাকি, উহার অর্থ রূপ বা অবস্থার পরিবর্ত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলে আমরা কহিয়া থাকি যে মৃত্যুর পর শরীর পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মৃত্যুর পর দেহের উপকরণসমূহ ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া মূল পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া যায়। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া পরে বিনষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ রূপান্তরপরিগ্রহ করিতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে সকল পদার্থ বিদ্যমান ছিল, তাহাদের পরমাণুসমূহ কোন না কোন আকারে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদের শরীরে হয় ত রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠির, যীশুখ্রীষ্ট বা মহম্মদ, কালিদাস বা সেক্সপিয়র, ইহাঁদের শরীরের উপ-

করণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় পৃথিবীপৃষ্ঠের ও নিয়ত এইরূপে আকারপরিবর্ত্ত হইতেছে।

পৃথিবীর কিরূপ আন্তরিক শক্তির প্রভাবে সাগরপয়োধি-প্লাবিত ভূভাগ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, এক্ষণে তাহার বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে অতিশয় উষ্ণ তাহার নানাপ্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণ ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত এই দুইটীই প্রধান। যদি পৃথিবীর তলভাগ উপরিভাগের ন্যায় শীতল হইত, তাহা হইলে উৎস হইতে বিনিঃসৃত জল কখনই উষ্ণ হইতে পারিত না, ও পর্ব্বতের গহ্বর হইতে আগ্নেয় পদার্থের ও উৎক্ষেপ হইত না। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে ভূগর্ভের এই আভ্যন্তরিক উত্তাপই উহার উৎক্ষেপের কারণ। সৃষ্টির পর যখন ভূভাগ অগাধ সাগরজলে বিলীন ছিল, তখন এই আভ্যন্তরিক উত্তাপবশতই উহার কিয়দংশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর আন্তরিক উত্তাপ ক্রমশই অল্প হইতেছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে আভ্যন্তরিক উত্তাপবশতঃ ভূভাগের উৎক্ষেপ সাধিত হইতেছে। পৃথিবীর এই একটী গুণ আছে যে উহা উহার নির্ম্মাপক যাবতীয় পরমাণুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। মাধ্যাকর্ষণই পদার্থসমূহের গুরুত্ব অর্থাৎ ভার উৎপাদন করে, এই জন্যই ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। যে পদার্থ যেরূপ বেগে নিম্নে পতিত হয়, তাহার সেই নিম্নগ বেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য ঊর্দ্ধদিকে যতটুকু বেগ প্রদান করিতে হয়, তাহাকেই উহার ভার কহা যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায়, ততই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাববৃদ্ধি হইতে থাকে। এই জন্য পৃথিবীর

পৃষ্ঠদেশে যে পদার্থের যত ভার, উহাকে ভূমিভেদপূর্ব্বক অনেক দূর নিম্নে নামাইয়া দিলে উহার ভারের তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড পদার্থ, সুতরাং ইহার সর্ব্বত্র মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, তাহার সমষ্টি করিলে অতি ভয়ানক ভার পৃথিবীকে উহার কেন্দ্রের দিকে অবনত করিতেছে এরূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে যদি এই দুর্ভর ভার প্রতিরোধ করিবার জন্য ভূগর্ভে কোন বিরুদ্ধ শক্তির প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে অল্প-কালের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যাইত ও উহার আয়-তনের অনেক হ্রাস হইত। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপই এই অনিষ্টনিবারণের নিদান। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সমগ্র পৃথিবীকে রসাতলের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু উহার আন্তরিক উত্তাপ ভূগর্ভকে নিয়ত প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নিষ্ফল করিতেছে। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে যদি মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপবশতঃ সমগ্র পৃথিবী গলিয়া তরল হইয়া যাইত। পরস্পর উভয় শক্তি নিয়তই পর-স্পরের প্রতিরোধ করিতেছে বলিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ মোটের উপর সমভাবেই অবস্থিত হইতেছে। যখন উল্লিখিত উভয় শক্তির মধ্যে একের প্রসরবৃদ্ধি হয়, তখনই ভূপৃষ্ঠে উহার কার্য্য হইতে থাকে। যদি ভূগর্ভের এক স্থানের উত্তাপ কোন কারণে অল্প হইয়া যায়, তাহা হইলে অপর স্থানের উত্তাপ প্রবলবেগে ঐ উত্তাপবিরহিত স্থানের অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমতা রক্ষা করে। যখন এইরূপ কাণ্ড উপস্থিত হয়, সেই সময় ভূগর্ভ উত্তাপের গতিবশতঃ কম্পিত হইতে থাকে, ও আমরা ভূমিকম্প অনুভব

করি। কখন কখন ভূমিকম্পের প্রভাব এত দূর বৃদ্ধি হয়, যে উপরিস্থ ভূপৃষ্ঠ উহার বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, ও ঐ গহ্বরের মুখ দিয়া প্রবলবেগে আগ্নেয় পদার্থসমূহ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই অগ্ন্যুৎপাত কহে। অনবরত এইরূপ কাণ্ড ঘটিতে থাকিলে কোন স্থানের ভূভাগ ক্রমশঃ উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে উন্নত হইয়া উঠে, কিন্তু অনেক সময় ভূমিকম্পের বেগ আমরা একবারে অনুভব করিতে পারি না, উহা নিঃশব্দে সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্তু এই নিঃশব্দ-সঞ্চার ভূমিকম্পদ্বারা অনেক স্থলে অধঃস্থ ভূভাগ ক্রমশঃ অল্পে অল্পে উন্নত হইয়া থাকে, আমরা হঠাৎ উহা অনুভব করিতে পারি না। ফলতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপই যে ভূমির উপচয়ের একটী প্রধান কারণ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আগ্নেয়গিরি যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যান্য যাবতীয় প্রকার পর্ব্বতশ্রেণীও অবিকল সেই প্রকারেই উৎপন্ন হয়। মনে কর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে নিম্নে অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা কঙ্কর বালুকা প্রভৃতির স্তর উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত আছে, ঐ সকল স্তরের মধ্যে কতকগুলি বা কোমল আর কতকগুলি বা কঠিন। যে সকল স্তর কঠিন তাহাদের নাম প্রস্তর। সুতরাং প্রস্তরসমূহ বালুকা পঙ্ক কঙ্কর প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণে নির্ম্মিত। এই সকল স্তরের নীচে কঠিনতর প্রস্তর অবস্থিত। কিন্তু এই সকল প্রস্তর স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত নহে, উহারা এক ও অভিন্ন জড়পদার্থের রাশিস্বরূপ। এই কঠিনতর প্রস্তরের নিম্নে সুবর্ণ রৌপ্যাদি ধাতব পদার্থ বিদ্যমান, তাহার ও নিম্নে বোধ হয় উক্ত পদার্থসমূহ প্রায় তরলভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এক্ষণে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ বশতঃ এই সকল পার্থিব উপকরণের কিরূপ পরিবর্ত্ত হয় তাহার

বিষয় বিবেচনা কর। উত্তাপদ্বারা সকল পদার্থের আয়তনবৃদ্ধি হয়, এবং উত্তাপের অভাব হইলে আবার ঐ আয়তনের সঙ্কোচ হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উত্তাপদ্বারা যেরূপ অন্যান্য পদার্থের আয়তনবৃদ্ধি হয়, ভূগর্ভের আন্তরিক উত্তাপদ্বারা সমগ্র ভূমণ্ডলের আয়তন ও সেইরূপে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আবার ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে উত্তাপের অভাব হইলে আবার পদার্থসমূহের আয়তনের হ্রাস ও আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই দুইটী বিষয় সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে কিরূপে পর্ব্বতের উৎপত্তি হয় তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। মনে কর কোন কারণে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের হ্রাস হইল। এরূপ হইলে পৃথিবীর যে অংশের আভ্যন্তরিক উত্তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইল, তাহার অব্যবহিত উপরিস্থ ভূভাগের আয়তন অবশ্যই পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে। এইরূপ হইলেই যে ভূভাগ পূর্ব্বে অধিক স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাকে অগত্যা পূর্ব্বোপেক্ষা অল্প স্থান অধিকার করিয়া সঙ্কুচিত হইতে হইবে। কাজে কাজেই এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে ঘটনাস্থলের ভূভাগ সঙ্কুচিত হইয়া উহার কিয়দংশ উচ্চ ও কিয়দংশ নিম্ন হইয়া যাইবে। যেরূপ বেগে উল্লিখিত কাণ্ডটী সংঘটিত হইয়া থাকে, তদনুসারে ভূমিখণ্ডের উন্নতি ও অধোগতি সাধিত হয়। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এই প্রকারে কোন ভূভাগ অতিশয় উচ্চ হইলে উহাই পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা উক্ত হইল তদ্দ্বারা ভূমির উপচয়েরই কারণ ও প্রকার নির্ণীত হইতেছে। কিন্তু উপচয়ের ন্যায় সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই নানা প্রকারে নিয়তই ভূমির অপচয়ও সাধিত হই-

তেছে। জলই এই অপচয়ের প্রধান কারণ। সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ সর্ব্বদাই উপকূলের তীরে প্রবলবেগে আঘাত করিয়া থাকে। যে সকল উপকূল বালুকা অথবা কর্দ্দমময় তৎসমুদয় অল্প আঘাতেই চূর্ণ হইয়া যায়, এবং তথায় সমুদ্রগহ্বরের ক্রমাগত প্রসারবৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু যে সকল উপকূল প্রস্তরময় তৎসমুদয় ও উন্মত্ত সাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। প্রস্তর যতই কেন কঠিন হউক না, সর্ব্বদা জলের আঘাত লাগিলে উহার অবয়বের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র উৎপন্ন হয়। নিয়ত জলের আঘাতে ও ঘর্ষণে ঐ সকল ছিদ্র ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, এবং ক্রমাগত এইরূপ হইতে থাকিলে অবিলম্বে ঐ প্রস্তরময় উপকূল ও ভগ্ন হইয়া জলসাৎ হইয়া থাকে। এইরূপে সমুদ্রের উপকূলে যে ভূমির কত পরিমাণ প্রতিবৎসর সমুদ্রের উদরসাৎ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল ভূমির অংশ সাগরতরঙ্গের সহিত ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পরে সাগরের অতলস্পর্শ গর্ভে বিশ্রাম লাভ করে। কিন্তু সাগরজলের অত্যাচার সমুদ্রের উপকূলেই নিয়মিত, উপকূল হইতে অধিক দূরে সাগরের উপদ্রবের নামমাত্র নাই, কিন্তু ভূভাগের সর্ব্বত্রই নিয়ত ভূমির ক্ষয় সাধিত হইতেছে। বৃষ্টির জল এই ক্ষয়ের একমাত্র কারণ। প্রবল বৃষ্টির পর আমরা দেখিতে পাই, বৃষ্টির জল কর্দ্দম বালুকা প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত ও কলুষিত হইয়া গড়াইয়া যাইতেছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বৃষ্টির জলের সহিত ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাদি শিথিল হইয়া স্থানভ্রষ্ট হয়। বৃষ্টির জল গড়াইয়া ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে ধাবমান হয়, এবং নদী, বিল, খাল, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে পতিত হয়। উহার যে অংশ নদী প্রভৃতি

স্রোতের জলে পতিত হয়, তাহা নদীর স্রোতের সহিত সমুদ্রো অভিমুখে ধাবিত হয়। সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে নদী স্রোতের সহিত ভাসিয়া ভূমির কিয়দংশ অনুক্ষণ সাগরে পতিত হইতেছে ও এই প্রকারে ভূমির ক্ষয় হইতেছে। আবার কেবল ইহাই নহে। বৃষ্টির যে ভাগ পর্ব্বতের উপর পতিত হয়, উহা বৃষ্টির আকারেই হউক, আর বরফের আকারেই হউক, যেরূপে পতিত হউক না কেন, শীঘ্র জমিয়া কঠিন হয়, এবং পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশসকলকে আচ্ছাদিত করে। পৃথিবীর মধ্যে যাবতী পর্ব্বত আছে, প্রায় সমুদয়েরই শিখরদেশ এইরূপ চিরনীহারে আচ্ছাদিত। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপে এই সকল বরফ গলিয়া উপত্যকা দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিম্নভূমিতে উপস্থিত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ প্রকাণ্ড স্রোত প্রবাহিত হইয়া নদী উৎপাদন করে। আবার কখন কখন প্রকাণ্ড বরফের স্তূপ ভগ্ন হইয়া বা ক্রমশঃ গড়াইয়া নিম্নভূমিতে উপস্থিত হয়, এবং নদীর বেগবৃদ্ধি করিয়া থাকে। বরফের ঘর্ষণে অতি কঠিন প্রস্তর ও ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। আবার বৃষ্টির জলের সহিত আঙ্গারিক অম্ল নামে এক প্রকার পদার্থ নিয়তই পর্ব্বতের উপর পতিত হইয়া থাকে। উহা উপরিস্থ বায়ুরাশি হইতে বৃষ্টির জলে সংক্রামিত হয়। ঐ অম্লের অসাধারণ গুণ এই যে উহা যাহার উপর পতিত হয়, সেই পদার্থই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদ্বারা পর্ব্বতের অনেক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র সংঘটিত হইয়া থাকে। ঐ সকল ছিদ্রদ্বারা বৃষ্টির জল পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ শীতের আধিক্যবশতঃ জমিয়া যায়। জমিয়া যাইলেই আবার উহাদের আয়তনবৃদ্ধি হয় ও উহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করিবার জন্য

বলপ্রয়োগ করে। উপরিস্থ শিলাখণ্ডসকল উক্ত বলের প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ফাটিয়া যায়। এইরূপ ফাটল উৎপন্ন হইলে উহার ভিতর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে জল প্রবেশ করে এবং উল্লিখিত প্রক্রিয়া অধিক স্থান ব্যাপিয়া সংঘটিত হইতে থাকে। সুতরাং এইরূপে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল ভগ্ন হইয়া নিম্নে পতিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নদীর স্রোতে পতিত হয়, এবং চূর্ণীকৃত হইয়া বালুকার আকারে পরিণত হয়, ও স্রোতে ভাসিয়া সমুদ্রে নীত হইয়া থাকে। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমরা ভূপৃষ্ঠে বালুকা পঙ্ক কর্দ্দম কঙ্কর প্রভৃতি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, সমুদয়ই কোন না কোন সময়ে পর্ব্বতের অবয়বস্বরূপ ছিল, নানা কারণে ক্ষয়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। পর্ব্বতের পরমাণু নদীর বেগের সহিত সাগরের অভিমুখে নীত হয় বটে, কিন্তু সমুদয়ই প্রকৃতপ্রস্তাবে সাগরপর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, নদীবেগের যেমন হ্রাস হইতে থাকে তেমনই কিছু কিছু অংশ নদীর তলে অথবা পার্শ্বে পতিত হইয়া নিশ্চল হইয়া যায়। এই জন্য নদীর মধ্যে প্রায়ই চর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এবং নদীর উভয় কূল উহার পার্শ্বদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উচ্চ হইয়া উঠে। বেগের হ্রাস হইলে নদীর তলে মৃত্তিকা প্রভৃতি জমিতে আরম্ভ হয়, এবং উহার ক্রমশই উপচয় হইতে থাকে, এইরূপে উপচয় হইতে হইতে ক্রমশঃ উহা জলভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং চররূপে পরিণত হইতে থাকে। আবার নদীর মোহানা অর্থাৎ সাগরসঙ্গমস্থলে সমুদ্রতরঙ্গের প্রবলতাবশতঃ নদীর বেগ অতিশয় অল্প হইয়া যায় অথবা একবারে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য নদীর

মুখে প্রায়ই চড়া পড়িয়া থাকে, ঐ সকল চড়া ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে কালসহকারে বৃহৎ বৃহৎ দেশ উৎপন্ন করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই ভূগর্ভের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্প বুঝিতে পারা যায় যে উহা বহুকাল পূর্ব্বে সাগরের জলে বিলী ছিল। কালক্রমে গঙ্গার স্রোতোদ্বারা আনীত মৃত্তিকাদি দ্বার উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভূমি ক্ষতি ও বৃদ্ধি উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে। যেমন একদিকে নদীর বেগ বৃষ্টির জল বরফস্তূপ প্রভৃতি দ্বারা নিয়তই পর্ব্বতাদি ক্ষয় সাধিত হইতেছে, তেমনই অপরদিকে পৃথিবীর আন্তরি শক্তিপ্রভাবে সমুদ্রগর্ভস্থ ভূভাগ উৎক্ষিপ্ত হইয়া নূতন ভূমি সৃষ্টি করিতেছে। পর্ব্বতের যে সকল অংশ নদীবেগে সঞ্চালি হইয়া সমুদ্রের গর্ভে বিশ্রামলাভ করে উহাই আবার কালক্রমে উন্নীয়মান হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের উপকরণস্বরূপ হইয়া উঠে।

উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সৃষ্টির পর পৃথিবীর যেরূপ আকার ছিল, এক্ষণে আর অবিক সেরূপ নাই। অবিরত নূতন নূতন ক্ষয় ও উৎপত্তি দ্বারা নিয় উহার আকারপরিবর্ত্ত হইতেছে। আবার এই সকল পরিবর্ত্ত নূতন আরম্ভ হইয়াছে তাহাও নহে, সৃষ্টির অব্যবহিত পরে ভূভাগের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়া আবহমান কাল এইরূপে ক্ষ ও উৎপত্তি যুগপৎ চলিয়া আসিতেছে। অতএব বোধ হয় সৃষ্টি পর পৃথিবীর আন্তরিক উত্তাপের ক্রমিক হ্রাসবশতঃ যে সব প্রধান ভূভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল, নিয়ত ক্ষয়বশতঃ কোন্ কা তৎসমুদয় রসাতলে বিলীন হইয়াছে তাহার স্থিরনিশ্চয় নাই তবে এই মাত্র নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, যে অধুনা প্রধান প্রধান ভূভাগগুলি প্রাচীন কালের প্রধান প্রধান ভূ

গের অবস্থিতিস্থানেই উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে যেমন ভূভাগের ক্ষয় হইতেছে, সেইরূপ উহার সহিত নিয়ত উৎক্ষেপ ও বৃদ্ধিও সাধিত হইতেছে। সুতরাং অধুনাতন প্রধান ভূভাগগুলি যে পূর্ব্বের প্রধান ভূভাগগুলির উপরেই সংঘটিত হইয়াছে, ইহারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে সকল প্রকাণ্ড ভূধর অদ্য ভূভাগের মেরুদণ্ডস্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে, নিয়ত ক্ষয়ের বিষয় বিবেচনা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐ সকল উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গও কালক্রমে মহাসাগরের গর্ভে লীন হইবে এবং সাগরতরঙ্গে পরিচালিত হইয়া নূতন নূতন ভূমির উৎপত্তিবিষয়ে সহায়তা করিবে। আমরা যে হিমালয় ও আল্প পর্ব্বতের এত গর্ব্ব করিয়া থাকি, কখন না কখন এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন ইহারা নামশেষ হইয়া প্রাচীন ইতিবৃত্তের বিষয়ীভূত হইয়া যাইবে। এইরূপ ব্যাপারের বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে হিমালয় প্রভৃতি যে সকল পর্ব্বত অতিশয় উন্নত, উহারা উহাদের অপেক্ষা অল্পোচ্চ পর্ব্বত অপেক্ষা আধুনিক, আর যে সকল পর্ব্বতের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অল্প, উহারা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত পর্ব্বত অপেক্ষা অধিক প্রাচীন, নিয়ত ক্ষয় হওয়াতে কালক্রমে ক্ষুদ্রাকার হইয়া গিয়াছে। এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে বিন্ধ্যপর্ব্বত হিমালয় অপেক্ষা অধিক দিনের পদার্থ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর উপকরণ—আন্তরিক শক্তি।

পৃথিবীতে সামান্যতঃ জল ও স্থল এই দুইটী প্রধান পদার্থ

দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীর স্থলভাগ কি কি উপকরণে নির্ম্মিত এবং ঐ সকল উপকরণ কিপ্রকারে মিলিত ও উপর্য্যধোভাবে সংস্থাপিত হইয়া পৃথিবীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে এই সকল বিষ স্পষ্টরূপে অবগত হইলে পর্ব্বতাদির স্বরূপ ও উৎপত্তিপ্রকার বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে স্থল বলিতে কেবা সমুদ্র হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থিত আমাদের আবাসভূমিমা বুঝিলে চলিবে না। সমুদ্রের অধোভাগে যে স্থল আছে, স্থলশব্দে তাহাও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্থলভাগের কিয়দংশ জলী আবরণে আবৃত থাকাতে সমুদ্র, আর কিয়দংশ অনাবৃত থাকাতে মনুষ্যাদির আবাসভূমি হইয়াছে, বস্তুতঃ উভয়ত্রই স্থল অবস্থি রহিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

আমরা পৃথিবীর যে কোন অংশে বাস করি না কেন, স ত্রই ভূমির সর্ব্বোপরিভাগে প্রথমতঃ উদ্ভিজ্জের অবস্থান দেখি পাওয়া যায়। আমরা ভূপৃষ্ঠে কোথাও বা ঘাস ও অন্যা তৃণ, কোথাও বা বিশাল অরণ্য, এবং কোথাও বা ক্ষুদ্র ঝোপ দেখিতে পাই। পৃথিবীর যে অংশ সম্পূর্ণরূপে সিকতা মরুভূমি, অথবা কঠিন প্রস্তরের আবরণে আবৃত, তথায় বে প্রকার উদ্ভিজ্জের শিকড় দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে পারে না ব কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ স্থলেও উদ্ভিজ্জের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ একান্ত অস নাই।

পৃথিবীর যে কোন স্থান খনন করিলে আমরা দেখিতে যে ভূগর্ভে নানাবিধ মৃত্তিকা ও প্রস্তর প্রভৃতি স্তরে স্তরে সা রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই উদ্ভিজ্জের স্তর সর্ব্বোপরি অবস্থিত। সর্ব্বোপরিস্থ উদ্ভিজ্জস্তর উৎখাত করিলে তাহার নিম্নে মৃ

দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই মৃণ্ময় ভূমিতেই উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জগণ এই মৃত্তিকাস্তর ভেদপূর্ব্বক নিজ নিজ মূলসমূহ গভীর মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশিত করে, এবং ঐ মূলসমূহ-দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণপূর্ব্বক নিজ নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে উদ্ভিজ্জের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অর্থাৎ শাখাপ্রশাখা প্রভৃতি সমুদয়ই এইরূপে পার্থিব উপকরণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই উপরিস্থ মৃত্তিকাস্তর পৃথিবীর নানাস্থানে নানা বর্ণ, নানা উপকরণ ও প্রাকৃতির দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা অপেক্ষাকৃত কঠিন ধূসরবর্ণ মৃত্তিকা, কোথাও বা কোমল কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণীভূত এঁটিয়াল মৃত্তিকা, কোথাও বা পিঙ্গল বা পীতবর্ণ বালুকা, আবার কোথাও বা প্রস্তরের কুচি অর্থাৎ কাঁকর। কিন্তু এই উপরিস্থ মৃত্তিকাস্তর যেরূপ আকারের হউক না কেন, উহাদের আকার দেখিলে এই সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্রই অনুভূত হইয়া থাকে যে, উহারা কোন বৃহত্তর প্রস্তরের ভগ্নাবশেষমাত্র। এতদ্ভিন্ন ভূগর্ভে অশেষ বিধ কীট বাস করে, ইহারাও অনবরত মৃত্তিকা খনন করিয়া থাকে, অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই সকল কারণে মৃত্তিকার নিম্নতর অংশসকল কালক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে।

মৃত্তিকাশব্দটী সাধারণ নাম মাত্র। এই মৃত্তিকা নানাবিধ উপকরণে নির্ম্মিত। বালুকা কর্দ্দম ও পঙ্ক অবশ্যই মৃত্তিকার প্রধান উপকরণ, কিন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার সহিত প্রভূতপরিমাণে জীব ও উদ্ভিজ্জদেহের অবশেষ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জীব ও উদ্ভিজ্জদেহের অবশিষ্টাংশ জীবিত উদ্ভিজ্জ-শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে উহাই ভূমির উর্ব্বরতাগুণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। কোন স্থানের

মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর বৃক্ষলতাদি জন্মিতে বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কারণ অগ্নিদ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রি প্রাণী ও উদ্ভিজ্জদেহের অবশিষ্টাংশ দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

এই সর্ব্বোপরিস্থ মৃত্তিকার গভীরতা বড় অধিক হইবে না সচরাচর ইহা তিন চারি ফুট গভীর হইয়া থাকে। কিং প্রস্তরের উপরিভাগে ইহা এক ইঞ্চি অপেক্ষাও অল্প গভী দেখা যায়। আবার উর্ব্বর শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে ইহার গভীরত কয়েক গজ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সর্ব্বোপরিস্থ মৃত্তিকা অব্যবহিত নীচের মৃত্তিকাকে অন্তর্মৃত্তিকা বা উপমৃত্তিব কহে। ইহার উপকরণ অবিকল সর্ব্বোপরিস্থ মৃত্তিকার ন্যায় তবে প্রভেদ এই যে নীচের মৃত্তিকার উপকরণসমূহ অপেক্ষ কৃত স্থূল ও ইহাতে প্রাণী ও উদ্ভিজ্জাবয়বের অবশেষ অপেক্ষ কৃত অল্পপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বোপরিস্থ মৃত্তিকাস্তর ও তন্নিম্নস্থ উপমৃত্তিকাস্তর এ উভয়ের নীচে প্রস্তর কর্দ্দম অথবা অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ অব স্থিত থাকে। এই সকল অধস্থ পদার্থ ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত হইয় উর্দ্ধস্থ মৃত্তিকাস্তর উৎপাদন করে। জল শৈত্য উত্তাপ প্রভৃতি কয়েকটী প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর পর্ব্বতাদি চূর্ণীকৃত হইয় বালুকারাশি প্রভৃতিতে পরিণত হইতেছে, ও বালুকারাশি প্রভৃতি পরস্পর সংহত হইয়া নূতন নূতন প্রস্তর সংঘটিত করিতেছে অধিকাংশ প্রস্তরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহ জেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, যে উহারা প্রাচীনতর প্রস্তর সমূহের ভগ্নাবশেষ হইতে সংঘটিত হইয়াছে। সৈকত প্রস্তর আর কিছুই নহে, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার সমবায়মাত্র স্লেট, কর্দ্দম অথবা পঙ্ক হইতে উৎপন্ন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা

যাইতেছে যে, যে সকল উপকরণ হইতে উল্লিখিত প্রস্তরগুলির উদ্ভব হইয়াছে উহারা কোন না কোন কালে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তরান্তরের অবয়বস্বরূপ ছিল। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রস্তর বিনষ্ট হওয়াতে উহাদের অবয়বসমূহ জলস্রোতে বারম্বার ইতস্তত: পরিচালিত হইয়া বালুকা কঙ্কর ও পঙ্ক প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের প্রস্তরসমূহকে জলজন্য বা বারুণ প্রস্তর এই নাম দেওয়া যাইতে পারে।

সচরাচর এই বারুণ প্রস্তর ভূগর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণীও এই প্রকার প্রস্তরের পরিণামমাত্র ইহাও সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুদূরবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের অব্যবহিত নিম্নেও এই প্রস্তরের সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বারুণ প্রস্তরের একটী বিশেষ গুণ এই যে ইহারা নিয়তই স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি অবস্থিত থাকে। এই সকল স্তরের ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। কোনটী এক ইঞ্চি অপেক্ষাও পাতলা, আবার কোনটী কয়েক ফুট পুরু এরূপ সর্ব্বদাই দেখা যায়। এই সকল প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত আর এক প্রকার প্রস্তর সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সমুদয় উদ্ভিজ্জ অথবা প্রাণিজ পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন। উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন প্রস্তরের মধ্যে পাথরিয়া কয়লা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। চূর্ণদ প্রস্তর চক প্রভৃতি প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের কঠিন ত্বকের নষ্টাবশেষ মাত্র। এই প্রকার চূর্ণদ প্রভৃতি প্রস্তর সৈকতাদির ন্যায় উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের উপকরণস্বরূপেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিমালয় আল্পস প্রভৃতি প্রধান প্রধান পর্ব্বতগুলির অধিকাংশই এই প্রকার প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। স্তরীভূত প্রস্তর ব্যতীত আরও এক প্রকার প্রস্তর

সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে ক্রিষ্টালাইন বা স্ফাটিক এ কহে। এই প্রস্তর স্তরীভূত প্রস্তরের ন্যায় প্রস্তরার বিনষ্টাবশেষ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহারা সম্পূর্ণরূপে স্ব প্রায়ই শ্রেণীবদ্ধরূপে অথবা স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। স্থলে এই প্রকার প্রস্তর স্তরীভূত প্রস্তরের নিম্নে অব দেখা যায়। কিন্তু অনেক স্থলে আবার উহারা স্তরী প্রস্তরভেদপূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের মধ্য প্রায় এই ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রস্তরকে আ প্রস্তর কহে। এই জাতীয় প্রস্তরের মধ্যে গ্রাণিট সর্ব্বপ্রধান

উপরে যাহা কথিত হইল তৎসমুদয় পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ, সুত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বহুদূর নিম্নে কিরূপ পদার্থ আ তৎসমুদয় আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কয়লা প্রভৃতি উত্তোলন করিবার জন্য আমরা খনি খনন করিয়া থা কিন্তু খনি যতই কেন গভীর হউক না, কখনই এক মাইল অ ক্ষা অধিক গভীর হইতে পারে না। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের সহিত সামান্য দূরত্বের তুলনা করিলে উহা ব্যাসার্দ্ধের $\frac{1}{৩৯৫৬}$ অংশ হইবে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে ভূগর্ভের নি প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করা উন্মত্তের কার্য্যের ন্যায়। কি অনুমানদ্বারা আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের বিষয় অব বুঝিতে পারি। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ভূগর্ভে যতই অব করা যায়, ততই উত্তাপের আধিক্য হইয়া থাকে। খনি, উষ্ণ উৎস এবং আগ্নেয় পর্ব্বত এই কয়টী পদার্থের এ মনোনিবেশ করিলে পৃথিবীর এই আন্তরিক উত্তাপের নি সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের যেরূপ উষ্ণ। কূপ বা খনি খনন করিলে দেখা যায়, যে উ

অধোভাগের বায়ু তদপেক্ষা অধিক উষ্ণ, এবং কূপাদির গভীরতা ত বাড়িতে থাকে, নিম্নস্থ বায়ুর উত্তাপও ততই বাড়িতে থাকে। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী মাঞ্চেষ্টর নগরে একটী পাথুরিয়া কয়লার খনি খনন করা হইয়াছিল। ঐ খনি প্রায় ২১৫১ ফুট গভীর হয়। খনির নিম্নস্থ প্রদেশের তাপমান পরীক্ষা করাতে তাহার পরিমাণ ফারণীটের তাপমানযন্ত্রের প্রায় ৭৫ অংশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু খনির ঊর্দ্ধস্থ প্রদেশের তাপমান ৫১ অংশ মাত্র ছিল। গভীর খনির অভ্যন্তর হইতে যে জল উত্থিত হয়, উহা প্রায়ই উপরিস্থ জল অপেক্ষা অনেক উষ্ণ হইয়া থাকে। কিছু দিন হইল পারিস নগরীর সান্নিধ্যে গ্রেণেলনামক স্থানে একটী কূপ নিখাত হয়। অদ্যাপি ঐ কূপ হইতে যে জল উঠিয়া থাকে, তাহার তাপমান প্রায় ৮১.৭ অংশপরিমিত। এইরূপ ঘটনা যে পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে অনুসন্ধান করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে ভূগর্ভের গভীরতা যতই অধিক হইতে থাকে, উহার তাপমান প্রত্যেক ৬০ ফুটে এক ডিগ্রি করিয়া বাড়িয়া থাকে। যখন ভূগর্ভের গভীরতার বৃদ্ধি অনুসারে আন্তরিক তাপের এত অধিক বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হয় যে ভূগর্ভের কিঞ্চিৎ অধিক গভীর স্থানে লইয়া গেলে অতি কঠিন পদার্থও অতিরিক্ত তাপবশতঃ গলনোন্মুখ হইয়া উঠে। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১২০০০ ফুট নিম্ন স্থানে লইয়া গেলে জল ভূগর্ভের স্বাভাবিক উত্তাপবশতঃ ফুটিতে থাকে, আবার আরও নীচে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১২ ক্রোশ নিম্নে উহা গলিত সুবর্ণের ন্যায় উষ্ণ হইয়া উঠে।

পৃথিবীর অনেক স্থানেই উষ্ণ উৎস দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্নেয় পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশসমূহে ভূগর্ভস্থ জল প্রায় সর্ব্বদাই ফুটিতে থাকে। হেক্‌লা পর্ব্বতের সন্নিহিত উষ্ণ প্রস্রবণসমূহের জল এত উষ্ণ, যে উহাদের তাপমান ন্যূনাধিক ২৬১ ডিগ্রী হইবে। এতদ্ভিন্ন যে সকল দেশে আগ্নেয় গিরি নাই, তৎসমুদয়ের মধ্যেও স্থানে স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমাদের দেশের নিকটে কুত্রাপি আগ্নেয় পর্ব্বত দেখা যায় না। কিন্তু মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে নিরন্তর অত্যুষ্ণ জল নির্গত হইতেছে, ইহা বোধ হয় অনেক বাঙ্গালীই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অনেক স্থানে আগ্নেয় পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বিসুবিয়স, হেক্‌লা, কোটাপাক্‌সী প্রভৃতি অনেকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বতের বিষয় অবগত আছি।

এক্ষণে নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হইতেছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ উহার পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষা অপরিমিতরূপে উষ্ণ। কিন্তু ভূগর্ভের অধিক দূর নিম্নপ্রদেশ দ্রব কি কঠিন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গলিত পদার্থময়, কেবল উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে কিছু দূর নিম্নপর্য্যন্ত কঠিন আবরণে আবৃত। অনেকে আবার বলেন যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ অবধি উহার কেন্দ্রপর্য্যন্ত সমুদয়ই কঠিন পদার্থময়, নতুবা পৃথিবী কখনই এত প্রবলবেগে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে পারিত না। ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার ধ্রুব নিশ্চয় করা সুকঠিন। এক দিকে যেমন অপরিমিত উষ্ণতা বলিয়া পদার্থমাত্রেরই দ্রব হইবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে, তেমনি

অপর দিকে ভূগর্ভের ক্রমিক উপচীয়মান মাধ্যাকর্ষণবশতঃ পদার্থসমূহের দ্রব হইবার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ও রহিয়াছে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, যে পদার্থ যে পরিমাণ উত্তাপে দ্রব হইতে পারে, যদি ঐ পদার্থের উপর গুরুতর চাপ অর্থাৎ ভার অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে গলাইবার জন্য তদপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে ভূগর্ভের আন্তরিক উত্তাপবশতঃ যদিও উহার অন্তরবয়ব গলিয়া দ্রব হইতে পারে যথার্থ বটে, কিন্তু পৃথিবীর উর্দ্ধস্থ অবয়বের গুরুতর ভারবশতঃ উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে দ্রব অবস্থায় পরিণত হইতে পারিতেছে না। ফলতঃ এই দুইটী পরস্পরবিরোধী কারণের যুগপৎ সমান কার্য্যবশতঃ ভূগর্ভ দ্রব না হইয়া কঠিন অবস্থায় রহিয়াছে, বরং ইহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া অনুমান হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গুরুতর উষ্ণতা দেখিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহার গভীরতম প্রদেশ সুবর্ণ লৌহাদি ধাতুদ্বারা গঠিত। ফলতঃ ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত পদার্থসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বহুবিধ ধাতব পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বত।

ভূপৃষ্ঠ যেরূপ আয়তনে বিশাল, সেইরূপ ইহার আকৃতিও নানাস্থানে নানাপ্রকার। ইহার সর্ব্বত্র সমতলক্ষেত্র নহে। সমুদ্রজল প্রায় সমগ্র স্থলভাগ অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত। স্থল-

ভাগের মধ্যে কোথাও সুদূরবিস্তীর্ণ সমতল ভূমি কোমল শাদ্বল বা হরিৎ অথবা পরিণামরমণীয় শস্যসম্পত্তিতে পরিশোভিত রহিয়াছে, কোথাও বালুকা বা প্রস্তরময় মরুভূমি নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও বা ইহাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমি জল বা কর্দ্দমময় হইয়া রহিয়াছে, কোথাও উন্নত মালভূমির উপর গ্রামনগরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোথাও বা এক একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ন্যায় গগনমার্গে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, আবার কোথাও বা বহুদূরবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী পৃথিবীর মেরুদণ্ডের ন্যায় এক দেশ হইতে দেশদেশান্তরে গমন করিয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে নানাস্থানে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহ বহুদূর উত্থিত হইয়া যেন সূর্য্যমণ্ডলকে চুম্বন করিতেছে। ফলতঃ পৃথিবীর নানা অবয়বের মধ্যে যখন আমরা যেটীর বিষয় বিবেচনা করি, তখন সেইটীই অতি আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমাদের দেশে অনেকেই কখন না কখন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পর্ব্বত দেখিয়া থাকিবেন। পর্ব্বতশ্রেণী সৃষ্টির মধ্যে একটী অদ্ভুত পদার্থ। পর্ব্বত কাহাকে কহে, সামান্যাকারে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয়, যে ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক বিশাল উন্নতিকে পর্ব্বত কহে। কি কারণে এই উন্নতি সংঘটিত হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে একপ্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সচরাচর ভূপৃষ্ঠ সাগরসমতল হইতে ১০০০ ফুট উচ্চ হইলে উহাকে পর্ব্বত কহে, আর নিম্নতর ভূমিকে পাহাড়শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু এই প্রভেদটী পারিভাষিক প্রভেদমাত্র। ফলতঃ পাহাড় ও পর্ব্বত এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। পর্ব্বতসমূহ প্রায়ই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীতে সংঘটিত হয়, কিন্তু পাহাড়

সর্ব্বত্রই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। পর্ব্বতের সর্ব্বত্রই প্রায় আগ্নেয় প্রস্তর, কিন্তু পাহাড় যে দেশে অবস্থিত উহাতে তত্রত্য স্তরীভূত অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রস্তরই অধিক। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বত ও পাহাড় উভয়ের মধ্যে আরও নানাবিধ প্রভেদ লক্ষিত হয়।

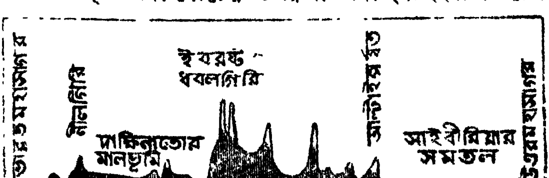
যাঁহারা হিমালয়, পশ্চিম ঘাট, গারোপর্ব্বত, খসিয়া পাহাড়, জয়ন্তী পাহাড়, অথবা রাজমহলের পাহাড় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পর্ব্বত কাহাকে কহে তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পর্ব্বতসমূহের অধিকাংশই শ্রেণীর আকারে নিবদ্ধ, কোথাও কোথাও বা এক একটী বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত একমাত্র শৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। এইগুলি প্রায়ই আগ্নেয় পর্ব্বত। নিউজীলণ্ড দ্বীপের অন্তর্গত এগ্‌মণ্ট পর্ব্বত ও কানেরী দ্বীপের অন্তর্গত টেনিরিফ এই জাতীয় পর্ব্বতের প্রধান দৃষ্টান্ত। ইহারা অন্যান্য পর্ব্বত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সচরাচর প্রায় সকল পর্ব্বতই শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। প্রায়ই কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী সমান্তরভাবে অবস্থিত হয়। ইহাদের মধ্যস্থল অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি। ইহাকে উপত্যকা কহে। উপত্যকা পর্ব্বতসমূহের প্রণালীস্বরূপ। উপত্যকাদ্বারা পর্ব্বতসমূহের অতিরিক্ত জল নিকাশ হইয়া নদী প্রভৃতি দ্বারা সাগরে পতিত হয়। উল্লিখিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীগুলি মূলাবচ্ছেদে পরস্পরসংযুক্ত। এই প্রকারে অবস্থিত পর্ব্বতকে পর্ব্বতশ্রেণী কহে। পরস্পরসংযুক্ত পর্ব্বতশ্রেণীসমূহের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীটীই সর্ব্বপ্রধান। উহার উন্নতি ও অন্যান্যগুলি অপেক্ষা অধিক। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতের সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাহাড় থাকে। এগুলিকে প্রত্যন্ত পর্ব্বত কহে। বস্তুতঃ পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী পরস্পরসংযুক্ত। বিশেষ

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে একটী অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী পৃথিবীর সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছে। ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে পর্ব্বতশ্রেণীসকল যে কেবল পরস্পর সমান্তরভাবে অবস্থিতি করিতেছে এরূপ নহে, কিন্তু সমুদয় প্রধান পর্ব্বতই সমকালে উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহাদের উপকরণসামগ্রীও অভিন্ন। সমান্তর পর্ব্বতশ্রেণীসমূহ পরস্পর বহুদূরে অবস্থিত হইলেও তাহাদের অবয়বসংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাদিগকে একই পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলিয়া বোধ হয়। অষ্ট্রেলিয়ার কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলে যদি যুগপৎ সমগ্র পৃথিবী আমাদের নেত্রপথে পতিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম যে একই অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতাম যে এক বৃহৎ পর্ব্বতপ্রাচীর হরন্ অন্তরীপের নিকট হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা পরিভ্রমণপূর্ব্বক বেরিং প্রণালীর নিম্ন দিয়া সমুদ্র পার হইয়া কামস্কাট্কা দ্বীপে উপনীত হইয়াছে। পরে তথা হইতে ক্রমশঃ আসিয়ার মধ্য ভাগ পর্য্যটনপূর্ব্বক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার এক ভাগ ইউরোপ ও অপর ভাগ আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে এক প্রধান পর্ব্বতশ্রেণীর শাখা প্রশাখা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে।

সমুদয় পর্ব্বতেরই এক পার্শ্ব প্রায় ঋজুভাবে উন্নত, সুতরাং দুরারোহ, ও অপর পার্শ্ব ক্রমনিম্ন অর্থাৎ ঢালু, সুতরাং সুগম হইয়া থাকে। পর্ব্বতের যে পার্শ্ব ক্রমনিম্ন তথায় উহার আকার ও নানাবিধ। উহার অনেক স্থলে সুন্দর উদ্ভিজ্জপূর্ণ ক্ষেত্র

দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অনেক স্থলে মনুষ্যের বসতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে পার্শ্ব বন্ধুর তথায় কেবল শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ লক্ষিত হয়, এবং অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই বন্ধুর পার্শ্ব দিয়া পর্ব্বতে উঠিবার সময় একটী উন্নত শৃঙ্গ দেখিয়া হঠাৎ বোধ হয় যে ঐ স্থানে পর্ব্বতের উন্নতির চরমসীমা হইয়াছে, কিন্তু কিয়দ্দূর উঠিবার পর পূর্ব্বদৃষ্ট শৃঙ্গটী অপর একটী উচ্চতর শৃঙ্গের পাদদেশমাত্র বোধ হয়। এইরূপে উপর্য্যুপরি বহুসংখ্যক শৃঙ্গ অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের দক্ষিণভাগ ঋজুভাবে উন্নত, সুতরাং অত্যন্ত দুর্গম ও উত্তর ভাগ ক্রমনিম্ন সুতরাং সুগম। এই দিকে তিব্বৎদেশ অবস্থিত। ইউরোপের অন্তর্গত আল্পস্ পর্ব্বতের ও উত্তরভাগ ক্রমনিম্ন এবং দক্ষিণভাগ ঋজুভাবে উন্নত। ফলতঃ পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বতেরই এইরূপ অবস্থা। পর্ব্বতসমূহের অবস্থানবিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়মের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

(১) সমুদয় মহাদেশই মহাসাগরের তীর হইতে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে উন্নত হইতে হইতে অভ্যন্তরে একস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। এই উন্নতি উক্ত মহাদেশের পর্ব্বতশ্রেণী। নদীসমূহের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই নিয়মটীর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আসিয়াখণ্ডের উল্লিখিত উন্নতি হিমালয়শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে হিমালয়ের দক্ষিণস্থ গঙ্গাপ্রভৃতি নদী মোটের উপর দক্ষিণবাহিনী হইয়া সাগরের সহিত



সঙ্গত হইয়াছে। আর উহার উত্তরে অবস্থিত নদীগুলি উত্তরবাহিনী হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(২) পর্ব্বতসমূহ মহাদেশের মেরুদণ্ড বা অাদণ্ডস্বরূপ। এই সর্ব্বাধিক উন্নতির অক্ষদণ্ড মহাদেশের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত হয় না, উহা মহাদেশসমূহের এক পার্শ্বে অবস্থিত হয়। এই জন্য কোন পর্ব্বতশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে যে দুই স্বতন্ত্র ক্রমনিম্ন বিস্তৃত ভূখণ্ড অবস্থিত থাকে, উহাদের পরিসর ও ক্রমনিম্নতা কখনই পরস্পর সমান হয় না। এক দিকেরটী দীর্ঘ ও উহার অবনতি মৃদু, এবং অপর দিকেরটী হ্রস্ব ও উহার অবনতি ও অতটবৎ হইয়া থাকে। প্রাচীন মহাদ্বীপের দীর্ঘতর ক্রমনিম্নভাগটী পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরাংশে অবস্থিত ও নূতন মহাদ্বীপেরটী তত্রত্য পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত প্রায় ২৬০০ মাইল, কিন্তু হিমালয় হইতে ভারতবর্ষের সমভূমি ৪০০ মাইলের অধিক হইবে না। আল্পস্ পর্ব্বত হইতে বাল্টিক সাগর পর্য্যন্ত ৪৫০ মাইল, কিন্তু তথা হইতে দক্ষিণ দিকে ইটালিদেশের সমভূমি পর্য্যন্ত ১০০ মাইলের অধিক নহে। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত রকিপর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর-পর্য্যন্ত ১৬০০ মাইল, কিন্তু তথা হইতে পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত উহার অর্দ্ধেক মাত্র। আবার দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আণ্ডিস পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিকে আমেজন নদীর মোহানাপর্য্যন্ত ১৮৫০ মাইল, কিন্তু পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত ১০০ মাইলের অধিক হইবে না।

(৩) পর্ব্বতশ্রেণীসকল যে মহাদেশ দেশ দ্বীপ বা উপদ্বীপে অবস্থিত, তাহার দৈর্ঘ্য অনুসারে বিস্তৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মহাদেশের যেদিকে দৈর্ঘ্য, উহাতে অবস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীর দৈর্ঘ্যও অবিকল সেই দিকে। অতএব কোন মহাদেশে অবস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীর অবস্থানপ্রকার নিশ্চিত হইলে ঐ মহাদেশের দৈর্ঘ্যও অনায়াসেই নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই পর্ব্বতশ্রেণী মহাদেশের পৃষ্ঠদণ্ডস্বরূপ। যেরূপ জীবদেহের পৃষ্ঠদণ্ড উহার অবয়ববিভাগের নিয়ামক। তদ্রূপ পর্ব্বতশ্রেণীও মহাদেশের অবয়ববিভাগের নিয়ামক। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রকারেরা পর্ব্বতকে ভূধরশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পৃষ্ঠদণ্ড হইতে যেরূপ পঞ্জরের অস্থিসকল শাখা প্রশাখারূপে নির্গত হয়, তদ্রূপ প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অনেক শাখাপর্ব্বত প্রধান শ্রেণীর লম্বের দিকে প্রসৃত হইয়া থাকে। এই সকল শাখাশ্রেণী হইতে অন্যান্য পর্ব্বত ও উপদ্বীপের নির্ম্মাণ হয়। প্রাচীন মহাদ্বীপ পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ, ইহার পর্ব্বতশ্রেণীও

তদনুরূপ। সেণ্ট বিনসেণ্ট অন্তরীপ হইতে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত একটী অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে এবং পিরিনিস আল্পস বলকান প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্ব্বতশ্রেণীসমূহ ও এই প্রধান শ্রেণীর বিস্তারমাত্র। নূতন মহাদ্বীপ উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ সুতরাং আণ্ডিস রকি প্রভৃতি আমেরিকার প্রধান প্রধান পর্ব্বতশ্রেণীও তদনুরূপ।

মহাদেশসমূহের দক্ষিণাংশ উত্তরাংশ অপেক্ষা উচ্চ এবং মহাদেশাদির দক্ষিণ দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী উন্নতির চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। উত্তর মেরু-প্রদেশ সন্নিহিত ভূভাগ অত্যন্ত নিম্ন ও সম্পূর্ণরূপে সমতল, আর ইহা হইতে দক্ষিণাভিমুখে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ভূভাগের উন্নতি ও বন্ধুরতা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মহাদ্বীপের সর্ব্বোচ্চ স্থান হিমালয়পর্ব্বতস্থ এবরেষ্ট বা গৌরীশৃঙ্গনামক শিখর। ইহা কর্কটক্রান্তির সন্নিহিত। আর নূতন মহাদ্বীপের সর্ব্বোচ্চস্থান চিলিদেশে অবস্থিত একন্‌কাগুয়া নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ। ইহা মকরক্রান্তি হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে। একটী প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে দেশের উন্নতি অনুসারে উহার তাপমানের হ্রাস হইয়া থাকে। এই জন্য পরমেশ্বর উত্তরমেরুসন্নিহিত ভূভাগকে এত নিম্ন করিয়াছেন, কারণ এই নিম্নতাদ্বারা তথায় শীতের প্রাবল্যের অনেক হ্রাস হয়। আবার দক্ষিণ ভাগের উচ্চতাহেতুক তথায় উত্তাপের অনেক হ্রস্বতা হইয়া থাকে। যদি ভূভাগের উচ্চতা এই নিয়মে সংঘটিত না হইত, যদি পৃথিবীর উত্তরাংশ তাহার দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উচ্চ হইত, যদি মেরুর দিকে ক্রমশঃ ভূভাগের উন্নতি হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর উত্তরাংশে অবস্থিত ইউরোপ উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি কেবল অবিচ্ছিন্ন তুষাররাশিতে আবৃত থাকিত, উহাতে জনালয় বা সভ্যতার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইত না।

পর্ব্বতের উপকরণ ও উৎপত্তিপ্রকার।

অনেকানেক পর্ব্বতশ্রেণীর গঠন বা অবয়বসন্নিবেশের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সমস্ত পর্ব্বতই এককালে সাগরগর্ভে সংঘটিত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠস্থ প্রায় সমুদয় পর্ব্বতের উৎপত্তি যে সমুদ্র বা হ্রদ প্রভৃতির গর্ভে হইয়াছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ

পাওয়া যায়। ভূমির নষ্টাবয়ব সকল সমুদ্রগর্ভে বিস্তৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তর উৎপাদন করে। সাগরগর্ভে ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি একটী স্তরের উপর আর একটী স্তর নিপতিত হইয়া উন্নত হইতে থাকে। কখন বা সিকতাময় স্তর, কখন বা কর্দ্দমের স্তর, কখন বা চুন প্রভৃতি দ্রব্যের স্তর এইরূপে উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া থাকে। কালক্রমে ঐ সকল স্তর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতরূপে পরিণত হয়, এবং সাগরের জলরাশি ভেদ-পূর্ব্বক উত্থিত হইতে থাকে। কখন কখন সমুদ্রের অধস্থ ভূভাগের স্বাভাবিক স্তরগুলিই উন্নত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করে। অনেক পর্ব্বতের গঠন দেখিলে বোধ হয় যেন বৃহৎ বৃহৎ শিলাপট্টসকল কেহ উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল পর্ব্বত বারুণ বা স্তরীভূত পর্ব্বত নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই এইরূপ জলজ পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে অতি প্রাচীন কালে সমগ্র পৃথিবী না হউক উহার অধিকাংশ ভাগ জলমগ্ন ছিল। আমরা প্রায় সকল পর্ব্বতের অন্তর্গত প্রস্তরমধ্যে শঙ্খ শুক্তি শম্বূক ও অন্যান্য নানাবিধ জল-জন্তুর শরীরের নষ্টাবশেষ অস্থি প্রভৃতি দেখিতে পাই। হিমা-লয়ের গগনভেদী শৃঙ্গের উপরেও মৎস্যাদির কঙ্কাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা সাগরগর্ভে যে সকল জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত অস্থি প্রভৃতি উহাদের অস্থি প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ-রূপে বিভিন্ন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বর্ত্তমান পর্ব্বতশ্রেণী সকল অতি প্রাচীন কালে সাগরগর্ভে সংঘটিত হইয়া ছিল। এমন কি তৎকালে বর্ত্তমান কালের জীবজন্তুসমূহের মধ্যে কোনটীই বিদ্যমান ছিল না। পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন

প্রকার জীবদ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এক্ষণে সেই সকল জাতীয় জীব একবারে বিলুপ্ত ও অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সকল বিকৃত কঙ্কালশেষ দর্শন করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে মনুষ্যজাতি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অর্বাচীন অধিবাসী। মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা নূতন অধিবাসী যথার্থ বটে, কিন্তু এই মনুষ্যই যে পৃথিবীতে কত কাল পূর্ব্বে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরনিশ্চয় নাই। এক জাতীয় জীবসমূহের পর আর এক জাতীয় জীবসমূহের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহাদের উচ্ছেদ হইলে আবার অপরজাতীয় জীবসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপ ক্রমাগত জীবধারার পর কালক্রমে মনুষ্য এই ধরাতলে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একজাতীয় জীবসমূহ যতকাল উপস্থিত থাকিবার পর অপরজাতীয় জীবের উদ্ভব হইয়াছে, ঐ তাবৎ কাল ভূবিদ্যার পুরাবৃত্তে এক একটা পরম মহৎ যুগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক উত্তাপবশতঃ উহার অন্তর্নিহিত স্তরসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। অগ্নির উত্তাপে স্তরগুলি যে কেবল উর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে এরূপ নহে, ঐ উত্তাপবশতঃ অনেক স্থলে উহাদের আকারের ও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইয়াছে। তাপপ্রভাবে উহাদের পরমাণুসমষ্টি বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার নূতনপ্রকারে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারের প্রস্তরগুলিকে মেটামরফিক্ বা পরিবর্ত্তসম্ভূত প্রস্তর কহে। ইহা বারুণ প্রস্তরেরই রূপান্তর মাত্র। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতের অবয়বে আরও দুই প্রকার প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এই উভয়বিধ প্রস্তর ও অগ্নিবিকৃত। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ এত অধিক, যে তথায় প্রস্তর ধাতু

প্রভৃতি কঠিনতম পদার্থসকল দ্রবভাবে অবস্থিতি করে। আ পর্ব্বতসমূহের উপরিভাগে যে গভীর হ্রদাকার গহ্বর লক্ষিত ঐ গহ্বরদ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ দ্রব পদার্থসকল ভূপৃষ্ঠে আনী হয়। উপরে আনীত হইবার পর কালসহকারে উহা শীতল হই অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্তর্গত মধ্যপ্রদে অনেক স্থলে ও নর্ম্মদানদীর গর্ভে এইরূপ প্রস্তর প্রচুরপরিমা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাকে আগ্নেয়গিরিজ প্রস্তর কহে চতুর্থপ্রকার প্রস্তরও অগ্নির প্রভাবে বিকৃতাকার হইয়া বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়। আগ্নেয়গিরিজ প্রস্তর যেমন অ পর্ব্বতের উপর দৃষ্ট হয়, ইহা সেরূপ হয় না। প্রথমতঃ পৃথিবী অভ্যন্তরস্থ দ্রবীভূত প্রস্তর আগ্নেয় গিরির ছিদ্রদ্বারা বহির্ভা নীত না হইয়া কোন সন্নিহিত অদ্ধগলিত স্তরের মধ্যে প্রবি হইয়া যায়। ঐ উপরিস্থ পর্ব্বত সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হই কেবল মৃদুভাব ধারণ করে বলিয়াই দ্রবীভূত প্রস্তর উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কালক্রমে ঐ অন্তঃপ্রবিষ্ট পর্ব্বতদ্রব শীতলতা প্রা হইয়া বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে। এইরূপ প্রস্তর গুলিকে গ্রাণিট কহে। উপরে যে সকল প্রস্তর ও অন্যান্য সামগ্রী বিষয় কথিত হইল ঐ সমুদয়ই সকল পর্ব্বতের উপকরণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অগ্নি প্রভাবে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, এবং ঐ ভূমিকম্পের প্রভা সমুদ্রাদির গর্ভে স্থিতীয়মান পর্ব্বতসমূহের উন্নমন হইয়া থাকে ভূগর্ভের আন্তরিক উত্তাপদ্বারা উহার অন্তর্গত দ্রব্যাদি গলিত স্ফীত হইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যা কর্ষণবশতঃ উহা সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কি কখন কখন ঐ আন্তরিক শক্তি মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে প্রতিহ

করিয়া প্রবল হইয়া উঠে, সেই সময় ভূমিকম্পাদি ও ভূভাগের উন্নমন হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ সামান্য কারণে হিমালয়াদি আকাশভেদী পর্ব্বতের সংঘটন হওয়া অসম্ভব। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে পর্ব্বতাদি অতিশয় উচ্চ আকার ধারণ করিবার পক্ষে আর একটী প্রবল কারণ আছে। সেই প্রবল কারণটী কি তাহা নির্ণীত হইলে পর্ব্বতের সংঘটন প্রণালী স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কি প্রকারে পর্ব্বতশ্রেণীসমূহের সংঘটন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে পর্ব্বতের আভ্যন্তরিক আকার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। যে স্থলে পর্ব্বত কাটিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই স্থল কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলে আমরা পর্ব্বতের অভ্যন্তরভাগের প্রকৃত আকার সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই যে উহার কোন কোন স্থলে বৃহদাকার শিলাপট্টসমূহ উপর্য্যুপরি এরূপ ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে, যে দেখিবামাত্র আমরা



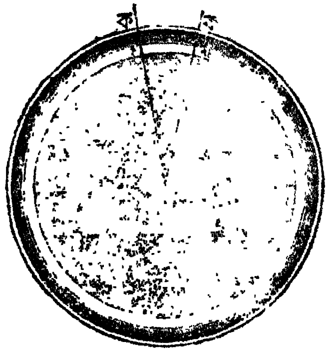
একটী হিমালয় পর্ব্বতের কিয়দংশের প্রতিরূপ।

বুঝিতে পারি যে অতি প্রাচীনকালে স্তরগুলি উক্তপ্রকারে একটীর উপর আর একটী সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরেই আবার আমরা দেখিতে পাই যে প্রস্তরপট্টগুলির সন্নিবেশ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাহারা কোন স্থানে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, কোথাও বা একটীর পার্শ্বে আর একটী লম্বভাবে দণ্ডায়মান

রহিয়াছে, কোন স্থানে বা শিলাপট্টগুলি প্রথমদৃষ্ট স্থলের ন্যায় একটীর উপর আর একটী শয়ান রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের আকার পূর্ব্বোক্ত স্থলের শিলাপট্টগুলির ন্যায় ঋজু ও আয়ত নহে। কিন্তু এক একটী শিলাপট্ট ঊর্দ্ধকোটি ধনুর ন্যায় একটীর উপর আর একটী বক্রভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কোথাও বা তাহারা অধঃকোটি ধনুর ন্যায় অবস্থিত দৃষ্ট হয়। কোন স্থলে বা ঈষৎ তির্য্যক্, কোথাও বা লম্বভাবে দণ্ডায়মান, কোথাও বা বিপরীতদিকে তিরশ্চীন অর্থাৎ হেলানো লক্ষিত হইয়া থাকে।

শিলাপট্টসমূহের এইরূপ বিসদৃশ অদ্ভুতাকারসন্নিবেশের কারণ কি? যখন পর্ব্বতাদির সংঘটক স্তরগুলি সাগরগর্ভে বিলীন ছিল, তখন অবশ্যই উহারা ঋজু ও আয়তভাবে সংঘটিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু সমুদ্রগর্ভে নিঃশব্দে সংঘটিত স্তরগুলি যখন উন্নমিত হইয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়াছে তখন কি প্রকারে উহাদের এরূপ অদ্ভুত বিকৃতাকার হইল। অবশ্যই পৃথিবীর কোন একটী শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে শিলাপট্টসমূহের উক্তরূপ আকারপরিবর্ত্ত হইতে পারে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণপ্রভাবেই পর্ব্বতসমূহের আভ্যন্তরিক আকার এতদূর পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণপ্রভাবে পৃথিবী উহার উপকরণীভূত যাবতীয় পরমাণুকে অতি প্রবলবেগে উহার কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। মনে কর, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কোন কারণবশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। মনে কর, ঐ সঙ্কুচিত অভ্যন্তরভাগের উপরিভাগে ভূপৃষ্ঠ এক গোলাকার আবরণের ন্যায় অবস্থিত। সুতরাং অভ্যন্তর সঙ্কুচিত হওয়াতে উহার উপরিস্থ দৃঢ় আবরণটী নিরালম্ব

শূন্যে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবীকে করাত করিয়া অর্দ্ধাঅর্দ্ধি কাটিলে ছেদমুখের যেরূপ আকার হইতে পারে, মনে কর নিম্নস্থ চিত্রটী তাহারই প্রতিকৃতি। মনে কর ক ক উপরিস্থ কঠিন আবরণ, ও খ খ উহার অধস্থ সঙ্কুচিত ভাগ। মনে কর নিম্নস্থ খ খ স্তরটী এখনও ঘনীভাব ধারণ করে নাই, কিন্তু ক্রমশঃ করিতেছে। আবার মনে কর, যেন নিম্নস্থ খ খ অংশের সঙ্কোচ-



বশতঃ ক ক ও খ খ এই দুই অংশের মধ্যে একটী অবকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। মনে কর নিম্নস্থ ভাগটীই সঙ্কুচিত হইয়াছে, কিন্তু উপরিস্থ কঠিন ত্বক পূর্ব্বাবস্থই রহিয়াছে। এরূপ হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে উপরিস্থ কঠিন আবরণটী সম্পূর্ণরূপে নিরালম্ব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণবশতঃ কোন পদার্থই নিরালম্বভাবে শূন্যে অবস্থিত থাকিতে পারে না। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে পৃথিবীর উল্লিখিত অবস্থা হইলে উপরিস্থ কঠিন আবরণ ক ক পূর্ব্বস্থান হইতে নামিয়া পড়িবে ও পৃথিবীর আকার গোল হওয়াতে নিম্নস্থ অবকাশ অল্প বলিয়া উহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প স্থানের মধ্যে নিজের জন্য

স্থানসমাবেশ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ সমাবেশ করিতে হইলে উহার পূর্ব্ব আকার রক্ষিত হইতে পারে না উহা অবশ্যই বক্রীভূত ও চূর্ণীকৃত হইয়া নিম্নস্থ চিত্রের ন্যা



নানাবিধ বিসদৃশ আকার ধারণ করিবে। এবং উহার কে কোন অংশ জড়ীকৃত ও উচ্চ হইয়া উপরে উত্থিত হইবে, কোন কোন অংশ নিম্নে নামিয়া পড়িবে, সুতরাং উহার উপরি ভাগ সমতল না হইয়া নিতান্ত বন্ধুর আকার ধারণ করিবে এক্ষণে পূর্ব্বপ্রদত্ত পর্ব্বতাংশের চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করি আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে উহার অবয়বসমূহ ভঙ্গ স্থানান্তরকরণবশতঃ নানাবিধ বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে আমরা দেখিতে পাই বৃহৎ পদার্থকে অপেক্ষাকৃত অল্প স্থা সমাবিষ্ট করিতে হইলে ঐ পদার্থের যেরূপ আকার হয়, উ চিত্রের প্রস্তরসমূহেরও অবিকল সেইরূপ অবস্থাই হইয়াছে পৃথিবীস্থ যাবতীয় পর্ব্বতের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিলে প্রস্ত সমূহের উক্তরূপ আকার পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতী মান হইতেছে যে পর্ব্বতসমূহ আর কিছুই নহে, কেবল ভূপৃষ্ঠে কোন কোন অংশের উল্লিখিত অবস্থা হওয়াতে উহা চূর্ণীকৃ হইয়া ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ এই প্রকারে একটী বা একত্র অবস্থিত বহুসংখ্যক পর্ব্বতশ্রেণীর উৎপত্তি হই য়াছে সন্দেহ নাই। হিমালয়প্রভৃতি পর্ব্বত এত উচ্চ, কি

উহার ও সামান্য ক্ষুদ্র পর্ব্বতসমূহেরও অবিকল এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে সঙ্কোচ ও নিষ্পীড়নদ্বারা প্রস্তরসমূহের প্রকৃতিগত একটী গুরুতর পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। স্থল২ অনেক গুলি প্রস্তর নিষ্পীড়নের চাপে ও আভ্যন্তরিক উত্তাপবশতঃ এতদূর উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে উর্দ্ধে উত্থাপিত হইবার সময় তাহারা কিয়ৎপরিমাণে গলিত ও তরলসংযোগ হইয়া যায়, এবং ক্রমশঃ যতই শীতল হইতে থাকে, ততই কঠিন ঘনসংযোগ ও স্ফাটিক হইয়া উঠে। হিমালয় আল্প আণ্ডিস প্রভৃতি যাবতীয় বড়২ পর্ব্বতশ্রেণীর অবিকল এইরূপ উপকরণ।

হিমালয়, আণ্ডিস, আল্পস প্রভৃতি গিরিসমূহ ভূপৃষ্ঠের ভঙ্গবশতঃ সংঘটিত হইয়াছে, ইহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে যথার্থ বটে, কিন্তু পর্ব্বতসমূহের গঠনপ্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করিলে এবিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। ফলতঃ পৃথিবীস্থ সমুদয় পর্ব্বতই ভূপৃষ্ঠের ভঙ্গবশতঃ অধিকপরিমাণ স্থলকে অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানের ভিতর নিজের সমাবেশ করিতে হওয়াতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য অতিরিক্ত অংশগুলি চূর্ণীকৃত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। উল্লিখিত শক্তি ও ঐ শক্তি ভূপৃষ্ঠের যেরূপ আনতনের উপর কার্য্যকর হইয়াছে তদনুসারে পর্ব্বতসমূহের একটী বা ততোধিক শ্রেণী সংঘটিত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বত অনেকগুলি পরস্পর সমান্তর শ্রেণীর সমবায়ে উৎপন্ন, আবার এই পর্ব্বতশ্রেণীগুলি উহার পার্শ্ববর্ত্তী তিব্বৎদেশীয় উন্নত মালভূমির অঙ্গস্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত কারণে পর্ব্বত মালভূমি প্রভৃতি সমুদয় উন্নত ভূভাগেরই সংঘটন হইয়া থাকে, অর্থাৎ উন্নমনের তারতম্য অনুসারে পর্ব্বত বা অন্যবিধ উচ্চ ভূমির সংঘ-

টন হয়। পর্ব্বতসংঘটক উর্দ্ধগতি যে, কোন স্থানে একবারে অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যকর হয় এরূপ নহে। হিমালয়ের বি যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা নিশ্চয় বলিতে পা যায়, যে ঐরূপ উর্দ্ধগ শক্তি অনেক কাল ধরিয়া অল্পে অ কার্য্যকর হইয়াছে।

উপরে পর্ব্বতসংঘটনের যেরূপ কারণ কল্পনা করা হইয়াছে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে উহ কল্পনামাত্র নহে। উহাই পর্ব্বতসংঘটনের প্রকৃত কারণ; আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে সৃষ্টির আদিম কালে সম পৃথিবী অগ্নিময় গলিত পিণ্ডবৎ ছিল, এবং জল ও নানাবিধ ধাতুসমূহ উহার প্রবল উত্তাপবশতঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উহার উপরিভাগে উড্ডীয়মান ছিল। সৃষ্টির পর পৃথিবী উত্তাপ ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হওয়াতে উহা উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল, এবং ঐ শৈত্যসংস্পর্শে উপরিস্থ বাষ্পসমূহ ঘনীভূত হইয়া জল ও নানাবিধ ধাতু আকারে পরিণত হইতে লাগিল, এবং জল তরল পদার্থ বলিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বাবয়বে আচ্ছাদন করিল। এই জন্য আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা "অপএব সসর্জ্জাদৌ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম জল সৃষ্ট হইয়াছিল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৃষ্টির পর অবধি চিরকালই এইরূপ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড গোলকস্বরূপ। সুতরাং সৃষ্টির পর অবধি অদ্যাপি উহার সমগ্র তাপ বহির্গত হয় নাই। কিন্তু ঐ তাপবিকিরণ চিরকাল অল্পে অল্পে চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বপ্রথম উহার উপরিভাগ শীতল হইয়া ঘনীভাব ধারণ করিয়াছে, পরে উহার অভ্যন্তরভাগ ক্রমশঃ তাপবিকিরণবশতঃ

পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হইয়া আসিতেছে। কোন পদার্থের এক অংশ অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে ক্রমশঃ সমস্ত পদার্থটী উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই যে উত্তাপ সকল পদার্থেরই এক অংশ হইতে অংশান্তরে সঞ্চালিত হয়, নিয়ত তাপবিকিরণবশতঃ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ বিলুপ্ত হইলে উক্ত কারণবশতঃ উহার আভ্যন্তরিক উত্তাপ অনবরত উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, এবং অনন্ত আকাশে বিলুপ্ত হইতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে ইহা যখন স্থির হইল, তখন পর্ব্বতের সংঘটনপ্রণালী আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব। আমরা অবগত আছি যে তাপসংযোগে প্রায় যাবতীয় পার্থিব পদার্থেরই আয়তন বর্দ্ধিত হয়, এবং তাপ কমিয়া পদার্থ শীতল হইলে উহার সঙ্কোচ হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীও এই সর্ব্বাভিভাবী নিয়মের অধীন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ ক্রমশঃ শীতল হওয়াতে উহার আয়তনের সঙ্কোচ হইতেছে, কিন্তু উহার উপরিস্থ ঘনীভূত আবরণ পূর্ব্বেই শীতল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উহার আর সঙ্কোচ নাই, উপরিভাগের আয়তন সমান রহিয়াছে, অথচ উহার নিম্নস্থ ভিত্তি সংকুচিত হইতেছে। এরূপ হওয়াতে উপরিভাগ অবশ্যই নিরালম্ব হইয়া পড়িতেছে। নিরালম্ব হইলে কাজে কাজেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণবশতঃ উহা নিম্নে নামিয়া পড়িবে। কিন্তু একটী ক্ষুদ্রতর ভাঁটার উপর আর একটী বৃহত্তর ফাঁপা ভাঁটা বসাইতে হইলে উপরেরটী কখনই নীচেরটীর সহিত টাইট হইয়া বসিতে পারে না। উহার কিয়দংশ বসিবে, আর কিয়দংশ অবশ্যই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উপরে পুঞ্জীকৃত হইবে। পৃথিবীর অবস্থাও অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থ ভূগর্ভের যে ভাগ যখন তাপহীন হইয়াছে, তখনই উহার উপরিস্থ ভূপৃষ্ঠ নিরালম্ব হওয়াতে মাধ্যাকর্ষণবশতঃ নিমগ্ন হইয়া চূর্ণীকৃত হইয়াছে, এবং উচ্চাবচ হইয়া পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়াছে।

উপরে পর্ব্বতসৃষ্টির যেরূপ কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সৃষ্টির সময় পৃথিবীর যেরূপ আয়তন ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক সঙ্কোচ হইয়াছে এবং পৃথিবী প্রতি দিন নিঃশব্দে অল্পে অল্পে ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছে। আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। বহুকাল এরূপ হইতে থাকিলে পরিণামে যে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হইবে বলা যায় না। আবার কেবল পৃথিবীর নহে, যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহাদিরই উল্লিখিত অবস্থা ঘটিতেছে। সূর্য্যের ব্যাস পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় পরিণামে সমুদয়ের প্রলয় উপস্থিত হইবে ও আবার সমগ্র জগৎ কালক্রমে নবভাব ধারণ করিবে। বোধ হয় এই বিষয়ের অনুধ্যান করিয়াই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা খণ্ড প্রলয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন।

পর্ব্বত কিপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বুঝা গেল। এক্ষণে দেখিতে হইবে উহার বর্ত্তমান আকার কি প্রকারে সংঘটিত হইয়াছে। পর্ব্বতের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল, উহা ব্যতীত উহার আকারপরিবর্ত্তের প্রতি অন্য কোন কারণ না থাকিলে পর্ব্বতগুলি ভগ্ন স্তূপ মাত্র বোধ হইত। কিন্তু উহার বর্ত্তমান আকার ত সেরূপ নহে। অতএব স্পষ্টই অনুমান হইতেছে উহার উৎপত্তির পর কারণান্তরের শক্তিবশতঃ উহার বর্ত্তমান আকার সংঘটিত হইয়াছে। সেই কারণান্তর কি তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। পর্ব্বতসমূহের উৎপত্তির পর হইতে

প্রাকৃতিক কারণে উহার ক্ষয় ও হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বরফ জল ও অনেকপ্রকার অম্ল পর্ব্বতের উপরিভাগে দৃষ্ট হয়। এই সকল পদার্থের সংস্রবে ও ঘর্ষণে উহার পরমাণুসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া নদী প্রভৃতিদ্বারা নিয়তই সাগরে নীত হইতেছে। এবং এই জন্য পর্ব্বতসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উহাদের বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বোধ হয় যে উচ্চতর পর্ব্বতগুলি অনেক নিম্নতর পর্ব্বত অপেক্ষা আধুনিক, কারণ নিম্নতর পর্ব্বতগুলির বহুকাল হইতে ক্ষয় হওয়াতে উহারা নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং কালে হিমালয় প্রভৃতি উচ্চতম পর্ব্বত সকলও নিয়ত ক্ষয়বশতঃ নিম্ন হইয়া পড়িবে।

পর্ব্বতের উন্নতি। পর্ব্বতের অন্যান্য সমুদয় লক্ষণের মধ্যে উহার উন্নতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক। হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণীর গগনভেদী শৃঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিলে কাহার না হৃদয় বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হয়! পর্ব্বত সংঘটিত হইবার সময় উহার যে অংশটী যেরূপ ঊর্দ্ধগ বেগবশতঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই বেগের তারতম্যহেতুক শৃঙ্গসমূহ অধিক বা অল্প উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপাততঃ একপ বোধ হইতে পারে যে উহাদ্বারা পৃথিবীর গোলত্বের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাসের দৈর্ঘ্যের সহিত উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গের উন্নতির তুলনা করিলে উহাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৯,০০২ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৫½ মাইল উচ্চ, কিন্তু উহা পৃথিবীর ব্যাসের [illegible] ভাগমাত্র। সুতরাং পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গগুলিও ভূপৃষ্ঠে বালুকাকণার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে, উহাদের দ্বারা পৃথিবীর গোলত্বের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না।

হিমালয় পর্ব্বত পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় পর্ব্বত অপেক্ষা অধিক উচ্চ। ইহার ২২ টী শৃঙ্গ সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২০০০০ ফুট উচ্চ, এবং ইহাদের মধ্যে আবার ছয়টী ২৫০০০ ফুট অপেক্ষাও উচ্চ। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতার গড় প্রায় ১৫,৬৭০ ফুট হইবে। এবরষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি নামে হিমালয়ের তিনটী শৃঙ্গ যথাক্রমে ২৯,৩১৮, ২৮,৯৮৪, ও ২৮৪০০ হস্ত উচ্চ। পৃথিবীর মধ্যে কুত্রাপি এত উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ আর একটীও নাই। আমেরিকার অন্তর্গত আণ্ডিস পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য হিমালয় অপেক্ষা অধিক, কিন্তু উহার ১৪ টী মাত্র শৃঙ্গ ২০০০০ ফুটের অপেক্ষা অধিক উচ্চ, এবং উহার উচ্চতার গড় ১১,৮৩০ ফুটের অপেক্ষা অধিক হইবে না। ইউরোপ খণ্ডের আল্পস পর্ব্বতের অন্তর্গত মণ্টব্লাঙ্ক নামক অন্যতম শিখর ঊর্দ্ধে প্রায় ১০,৪৯৬ হস্ত হইবে।

পর্ব্বতদ্বারা মনুষ্যজাতির নানাপ্রকার উপকার হইয়া থাকে। পর্ব্বতশিখরে বরফ জমিয়া থাকে। ঐ বরফ গলিত হইয়া নদীরূপে নানা দেশ দিয়া সমুদ্রে নীত হয়, এবং ভূপৃষ্ঠের উৎপাদিকাশক্তির সম্যক্ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উষ্ণপ্রধান দেশে পর্ব্বত ও উচ্চভূমি হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া নিম্নস্থ সমভূমিসমূহের অসহ্য উষ্ণতার হ্রাস করে। পর্ব্বত হইতে আমরা স্বর্ণ রৌপ্যাদি নানাবিধ ধাতু প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ফলতঃ উল্লিখিত ও অন্যান্য অসংখ্য কারণে পর্ব্বতসমূহ মনুষ্যসমাজের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

মালভূমি বা অধিত্যকা।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে পর্ব্বতোৎপাদিকাশক্তির ফলস্বরূপ যেমন উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে, সুদূরবিস্তীর্ণ মালভূমিও অবিকল সেই শক্তির প্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠের

যে সকল স্থান পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও বন্ধুর নহে, কিন্তু সাগরপৃষ্ঠ হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ক্রমনিম্ন সমভূমি তাহাকেই মালভূমি কহে। মালভূমিসমূহের সর্ব্বাংশই যে সমতলভূমি এরূপ নহে, মালভূমির মধ্যে মধ্যে উন্নত গিরিশিখর, পাহাড়, গুহা, উপত্যকা ও নদী প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অনেক মালভূমির প্রায় চতুষ্পার্শ্বেই পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও মালভূমিগুলি ক্রমনিম্ন হইয়া অধস্থ নিম্নভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে, কোথাও মালভূমিসমূহ নিম্নস্থ সমভূমি হইতে বন্ধুর ও অতটভাবে উত্থিত হইয়াছে। আবার কোথাও কোথাও বা মালভূমিসকল উচ্চতর পর্ব্বতের পাদস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে, এবং উহাদের মধ্যদেশ হইতে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আকাশে উত্থিত হইয়াছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই বৃহৎ বৃহৎ মালভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইউরোপে অন্যান্য মহাদেশের ন্যায় উচ্চ ও সুবিস্তৃত মালভূমি অধিক নাই। ইহার সর্ব্বোচ্চ মালভূমি স্পেনদেশে অবস্থিত, উহার আয়তন ৯৩,০০০ বর্গ মাইল ও উচ্চতায় গড়ে প্রায় ২২০০ ফুট। এতদ্ভিন্ন সুইজর্লণ্ড, বাবেরিয়া, বোহিমিয়া প্রভৃতি অল্পোচ্চ মালভূমিগুলিও প্রসিদ্ধ।

আসিয়াখণ্ডের অধিকাংশই মালভূমিদ্বারা সংঘটিত, এমন কি বোধ হয় সমগ্র আসিয়ার $\frac{1}{3}$ অংশ মালভূমি। মধ্য আসিয়া একটী প্রকাণ্ড মালভূমিস্বরূপ, ইহাকে পূর্ব্ব মালভূমি কহে। ইহার পশ্চিমদিকে অবস্থিত হিন্দুকুস পর্ব্বত ইহাকে অপর একটী প্রকাণ্ড মালভূমির সহিত সংলগ্ন করিতেছে। এইটীর নাম পশ্চিম মালভূমি। মধ্য আসিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় মালভূমি অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ এবং ইহার উচ্চতায় ও সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক। হিমালয়, বেলুরতাগ, আল্টাই প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী ইহার পরিতোবর্ত্তী প্রাচীরস্বরূপ। আর ইহার মধ্যস্থলে কৈলাস ও টিয়ানসান পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। ইহারই মধ্যে গোবিনামক প্রসিদ্ধ বালুকাময় মরুভূমি। ইহার আয়তন প্রায় ৪০০,০০০ বর্গ মাইল এবং উচ্চতায় ৩০০০ ফুট। পৃথিবীর যাবতীয় উন্নত স্থানে মনুষ্যের বসতি আছে, ইহার দক্ষিণস্থ তিব্বৎ দেশ তৎসমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। তিব্বৎ মালভূমি গড়ে প্রায় ১৫০০০ ফুট উচ্চ। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই মালভূমির গড় উচ্চতা আল্প পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের উচ্চতার সহিত সমান। মধ্য আসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে পারস্য, আরব, ও সাহারা মরু এই কয়টী মালভূমির অবস্থান। এতদ্ভিন্ন আর্ম্মেণিয়া ও ভারতবর্ষের অন্তর্গত দাক্ষিণাত্যের মালভূমিও পৃথিবীর প্রধান মালভূমিসমূহের মধ্যে গণনীয়।

সমগ্র আফ্রিকা একটী প্রকাণ্ড মালভূমিস্বরূপ। আফ্রিকার যে অংশ বিষুবরেখার অধস্থ উহা এত উন্নত যে তথাকার আবহাওয়া সমমণ্ডলের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ। আর সমুদয় দক্ষিণ অংশটী দাক্ষিণাত্যের ন্যায় ক্রমনিম্ন মালভূমি। আফ্রিকার উত্তরাংশে সুপ্রসিদ্ধ সাহারা মরুভূমি। এই বিশাল মরুভূমির কিয়দংশ উন্নত মালভূমি ও কিয়দংশ নিম্নভূমি। ইহাতে জীবজন্তুর বসতি নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একখণ্ড ক্ষুদ্র নিম্নভূমি এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় এবং খর্জ্জুর নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এই গুলিকে ওয়েসিস কহে। মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ করিবার সময় পর্য্যটকেরা এই সকল ওয়েসিসে জলগ্রহণ ও বিশ্রাম করিয়া থাকে। পরমেশ্বর এই ভয়ানক মরুভূমির মধ্যেও মনুষ্যের গমনাগমনের সুবিধার

জন্য অপার সাগরের মধ্যে দ্বীপের ন্যায় এই ওয়েসিস গুলিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সাহারা মরুভূমিতে মধ্যে মধ্যে সাইমুন নামে অতি ভয়ানক উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, ও অনেকানেক পথিক ও উষ্ট্র উহার উত্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকোর মালভূমি পৃথিবীস্থ যাবতীয় মালভূমি অপেক্ষা অবিচ্ছিন্ন ও অভগ্ন। ইহার দৈর্ঘ উত্তর দক্ষিণে ১৮০০ মাইল, এবং প্রস্থ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩৬০ মাইল। সমগ্র মেক্সিকোদেশটী সমুদ্রসমতল হইতে একবারে বন্ধুরভাবে উন্নত। ইহার মধ্যভাগ প্রায় সর্ব্বত্রই সমভূমি, কেবল মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় মেচাগ্রের উচ্ছ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বলিবিয়া বা উচ্চ পেরুদেশের মালভূমি সাগরসমতল হইতে প্রায় ২২ মাইল ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহার পরিমাণফল প্রায় ১৫০,০০০ বর্গ মাইল। এই মালভূমির চতুর্দ্দিকেই আণ্ডিস পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরসমূহ আকাশমার্গ ভেদপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত টিটিকাকা হ্রদ সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ জেনিবা হ্রদের প্রায় ২০ গুণ। কুইটো মালভূমিটী ২০০ মাইল দীর্ঘ ও ৩০ মাইল প্রশস্ত। ইহা বিষুবরেখার ঠিক নিম্নে অবস্থিত। এই মালভূমির মধ্যস্থলে কুইটো নগর হইতে যেদিকে নয়ননিক্ষেপ কর, সর্ব্বত্রই তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

নিম্নভূমি বা প্রান্তর।

আসিয়াখণ্ডের প্রায় মধ্যস্থলে একটী বৃহদায়তন ভূখণ্ড প্রাচীন মহাদ্বীপের কটিবন্ধের ন্যায় আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত

মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই কটিবন্ধদ্বারা প্রাচীন মহাদ্বীপ দুইটী সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। কটিবন্ধের দক্ষিণস্থ বিভাগ প্রায় সর্ব্বত্র উন্নত মালভূমিদ্বারা পরিপূর্ণ, এবং উত্তরের অংশটী একটী সুদূরবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। ইহা জর্ম্মন্ উপসাগর হইতে অবিচ্ছেদে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বহুবায়ত সমতল ভূমির মধ্যে এক ইউরাল পর্ব্বত-ব্যতীত অন্য কুত্রাপি ভূপৃষ্ঠের কিছুমাত্র উচ্ছ্রায় নাই। এই সুদূরবিস্তীর্ণ সমতলভূমির পরিমাণফল প্রায় ১৬ কোটি বর্গ মাইল অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ ও আসিয়ার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ।

কার্পোথিয়ান পর্ব্বত হইতে ইউরালপর্ব্বত পর্য্যন্ত ১৫০০ মাইল পথ সম্পূর্ণরূপে সমভূমি। রুসিয়ার পশ্চিমাংশে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া বাল্টিক উপসাগর বা কৃষ্ণসাগরে পতিত হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রায় একই স্থান হইতে উৎপন্ন, এই জন্য এই সকল নদীর বন্যা হইলে উহাদের উৎপত্তিস্থানের চতুর্দ্দিক ভাসিয়া যায়, সুতরাং তৎকালে নৌকারোহণে বাল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পশ্চিমদিকে হল্যাণ্ডের অধিকাংশ নিম্নভূমি। এই জন্য লোকে বাঁধ বাঁধিয়া হল্যাণ্ডকে সাগরজলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। পূর্ব্ব-দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্ত্তী ভূভাগ সাগরসমতল অপেক্ষা প্রায় ৮৩ ফুট নিম্ন। এতদ্ভিন্ন ইউরোপ ও আসিয়ার অনেক স্থানে বহুসংখ্যক ষ্টেপ দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেপগুলি বৃক্ষশূন্য এক প্রকার মরুভূমিবিশেষ। এই গুলির পশ্চিমাংশ প্রায়ই মোটা ঘাস ও কাঁকরে পরিপূর্ণ এবং পূর্ব্বাংশে লবণাক্ত বালুকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্ম-

কালের প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্ত তৃণগুল্মাদি শুষ্ক হইয়া যায়, এবং শীতকালে সমুদয় বরফে আচ্ছন্ন হওয়াতে প্রচণ্ড শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

কিন্তু নূতন মহাদ্বীপে যত নিম্ন সমতল ভূমি আছে, ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি সেরূপ নাই। ইহার মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড সমতল ভূমি উত্তর মহাসাগর হইতে টেরাডেলফিউগো পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা বরফে আচ্ছাদিত, কিন্তু ইহার মধ্যভাগ উষ্ণপ্রধান। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত প্রেয়ারি নামক নিম্নভূমি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদ্বারা এই ভূখণ্ডের উত্তর অঞ্চলের জল উত্তর মহাসাগরের দিকে ও দক্ষিণ অঞ্চলের জল মিসিসিপির অববাহিকার দিকে প্রবাহিত হয়। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৩০০০,০০০ বর্গ মাইল। এই সমভূমির সর্ব্বত্র প্রায় তৃণ ও ঘাসে পরিপূর্ণ। মেক্সিকো উপসাগরের দিকে বহুদূরবিস্তৃত ভূভাগ কেবল সিকতাময়। এই সিকতাময় মরুভূমির উপর পাইন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মে না। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত নিম্নভূমি তিন ভাগে বিভক্ত। ওরিণকো নদীর উভয় পার্শ্ব, আমেজন নদীর উভয় পার্শ্ব ও লাপ্লাটা নদীর উভয় পার্শ্ব। ওরিণকো ও আমেজন উভয় নদীর অন্তর্বর্ত্তী প্রান্তরকে ল্যানস্ কহে। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১৬০,০০০ বর্গ মাইল। এই প্রশস্ত প্রান্তরের অধিকাংশই সমভূমি। বর্ষাকালে ইহার অধিকাংশ ভাসিয়া যাওয়াতে বর্ষার পর সমগ্র প্রান্তরটী নূতন শাদ্বলে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কিন্তু আবার গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইলেই সমুদয় ঘাস শুষ্ক হইয়া যায়। লেনসের যে অংশে আমেজন নদীর জল উঠে, তথায় নিবিড় অরণ্যানী। এই মহারণ্যে নানা জাতীয় বৃহৎ

বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এই জন্য উহা নানাজাতীয় আরণ্য জন্তুর আবাসভূমি। আমেজন নদীর উভয়পার্শ্বস্থ প্রান্তরের নাম সেলবাস। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১,৫০০০,০০০ বর্গ মাইল। এই প্রান্তরটীও মহারণ্যে পরিপূর্ণ। বন্যার সময় এই স্থানের অসভ্য অধিবাসীরা বৃক্ষের শাখায় বাস করিয়া থাকে। লাপ্লাটার সন্নিহিত প্রান্তরের নাম প্যাম্পাস। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৮৮০,০০০ বর্গ মাইল। ইহাতে বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে না, কেবল নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মলতাদি প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

উপত্যকা।

দুইটী স্বতন্ত্র পর্ব্বতশ্রেণীর অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্নভূমিকে উপত্যকা কহে। উপত্যকাগুলি প্রায়ই ক্রমনিম্ন, সুতরাং ইহাদ্বারা সকল পর্ব্বতেরই উৎস বৃষ্টি ও বরফ হইতে উৎপন্ন সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়। এই জন্য প্রায় প্রত্যেক উপত্যকার নিম্নভাগ দিয়া কোন না কোন নদী গড়াইতে গড়াইতে পরিশেষে পর্ব্বতের নিম্নস্থ সমভূমিতে পতিত হয়, এবং ক্রমে সাগরের অভিমুখে ধাবমান হইতে থাকে। উপত্যকা-সকল পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর অবস্থানভেদ অনুসারে নানা আকারের হইয়া থাকে। যে সকল উপত্যকার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত পার্শ্ব ক্রমনিম্ন, সে গুলির আকার প্রশস্ত ও সুগ পরিসরবিশিষ্ট হয়। আর যে গুলির উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতট ও অতি বন্ধুর, সে গুলি প্রায়ই সঙ্কীর্ণ ও দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি উপত্যকা গোলাকার। এই গুলির চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থলেও প্রস্তর ফাটিয়া ও ভাঙ্গিয়া গিয়া একপ্রকার উপত্যকা সংঘটিত হয়। এই প্রকার উপত্যকা-সমূহের মধ্যে কতকগুলি সন্নিহিত পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত সমান্তরভাবে অবস্থিত, আর কতকগুলি উহাদের লম্বের ন্যায়। এই উভয় প্রকার উপত্যকাতেই পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে পতিত জল নিয়ত জমা হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ উচ্চ হইতে নিম্নে লাফাইতে লাফাইতে অবশেষে ক্রমনিম্ন উপত্যকায় উপস্থিত হয়, এবং নদীর উৎপাদন করে। পর্ব্বতসমূহের সহিত সমান্তর উপত্যকাগুলি লম্বভাবে অবস্থিত উপত্যকা অপেক্ষা অধিক ক্রমনিম্ন হয়। এই জন্য এই প্রকার উপত্যকার উপর নদী-স্রোত কিঞ্চিৎ অল্পবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঋজুভাবে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত উপত্যকায় যাতায়াত করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। প্রায়ই পর্ব্বতের উপর বহুদূর ঊর্দ্ধে অবস্থিত অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া ঐ সকল উপত্যকায় যাতায়াত করিতে হয়। হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতে এইরূপ কয়েকটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট প্রায় ১৩,০০০ ও ১৪০০০ ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত। কখন কখন উপত্যকার মধ্য দিয়া গড়াইয়া আসিবার সময় বৃহৎ শিলাখণ্ড প্রভৃতির বাধায় জল একত্র জমিয়া যাওয়াতে হ্রদ উৎপন্ন হয়, এবং অনবরত জলের স্রোতে যখন ঐ হ্রদ উচ্ছলিত হয়, তখন ঐ আবদ্ধ জলস্রোত প্রবলবেগে নিম্নে পতিত হইতে থাকে। অনবরত জলস্রোতে এই সকল উপত্যকার নিম্নভাগ নিয়ত ক্ষয় হওয়াতে উপত্যকাগুলি দিন দিন অধিকতর গভীর হইয়া উঠে। নদীর উভয়পার্শ্ব উহার নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নিম্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিম্নস্থান দিয়াই নদীর স্রোত প্রবাহিত হয়, এই জন্য নদীর অববাহিকাকেও উহার উপত্যকা

বলিয়া থাকে। এই সকল উপত্যকা প্রায় অত্যন্ত উর্ব্বর ও শস্যশালিনী হয়।

আসিয়াখণ্ডে যাবতীয় উপত্যকা আছে তন্মধ্যে কাশ্মীরের সুন্দর ও মনোহর উপত্যকা সর্ব্বপ্রধান। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১৫ ক্রোশ। ইহার চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ হিমালয়-শিখর দুর্ভেদ্য ভিত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কাশ্মীরের উপত্যকা উহার মনোহর ফলপুষ্পাদির জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহার পরিতো-বর্ত্তী পর্ব্বতশিখরসমূহ চিরনীহারে আচ্ছন্ন। কাশ্মীরের আকার প্রায় গোল বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে উহা অতি প্রাচীন কালে জলে পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে ভূমিকম্পের প্রভাবে পর্ব্বত ফাটিয়া সমুদয় জল বাহির হইয়া যাওয়াতে উহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গঙ্গা ও যমুনার উপ-ত্যকাও উল্লেখের যোগ্য।

ইউরোপের অন্তর্গত বোহিমিয়ার উপত্যকা গোলাকার ও নিম্ন। সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত বালাই জেলার উপত্যকা আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই উপত্যকার মধ্যগতস্থানে উষ্ণমণ্ডল সমমণ্ডল ও হিমমণ্ডল তিন মণ্ডলেরই উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। ইহার আবহাওয়াও যেন সমুদয় মণ্ডলের আবহাওয়ার সমবায়ে উৎপন্ন। ফলতঃ এই রমণীয় উপত্যকাটী পৃথিবীর মধ্যে একটী চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্থান।

আফ্রিকার মধ্যে নীল নদীর উপত্যকাই সর্ব্বপ্রধান। আমে-রিকার মধ্যে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত কার্ডিলেরা উপত্যকাই প্রধান। ইহাদের পার্শ্বে উত্তুঙ্গ গিরিশিখর। কিন্তু মধ্যস্থলে তৃণ-শস্যশোভিত শস্যক্ষেত্র ও দর্শকের নয়নপ্রীতি সাধন করে।

গিরিসঙ্কট বা পার্ব্বত্য পথ। যে সকল উপত্যকা পর্ব্বতের

মধ্যে লম্বভাবে অবস্থিত ও প্রশস্ত তাহাদিগকে পার্ব্বত্য পথ বা গিরিসঙ্কট কহে। এই সকল গিরিসঙ্কটদ্বারা পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে লোকের যাতায়াত হয়। গিরিসঙ্কট স্থানে স্থানে পর্ব্বতের অত্যন্ত উর্দ্ধদেশে অবস্থিত হয়। হিমালয়ের একটী এইরূপ পথের নাম মাঙ্গরাং। উহা সাগরজলসীমা হইতে প্রায় ১৮-৫০০ ফুট উচ্চ। এতদ্ভিন্ন খাইবর পাস, বোলান পাস, এগুলিও প্রসিদ্ধ। আল্প পর্ব্বতের অর্টলর নামে একটী পথ ৯০০০ ফুট উচ্চ। অথচ উহার উপর দিয়া অনায়াসে শকটারোহণে যাতায়াত করা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আগ্নেয় পর্ব্বত।

পূর্ব্বে পর্ব্বতসংঘটনের কারণ ও প্রক্রিয়াবিষয়ে যাহা কথিত হইয়াছে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে আগ্নেয় পর্ব্বত ও ভূমিকম্প কিপ্রকারে সংঘটিত হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইবে না। অনেক স্থানে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক সঙ্কোচবশতঃ পর্ব্বতাদি উৎপন্ন না হইয়া ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ কেবল ফাটিয়া যায় ও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিবর উৎপন্ন হয়। এই সকল বিবর যে স্থানে এতদূর গভীর হয় যে উহা ভূপৃষ্ঠের কঠিন অংশ ভেদপূর্ব্বক উহার অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ ভূগর্ভ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে তত্তৎস্থানে আগ্নেয় গিরির উদ্ভব হইয়া থাকে। ফলতঃ ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানে গভীর গহ্বর আছে। এই সকল গহ্বরের মধ্য দিয়া উপরিস্থ জল মাধ্যাকর্ষণপ্রভাবে নিম্নে নামিয়া যায় ও তথায় ভূভাগের আভ্যন্তরিক উত্তাপের প্রভাবে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পরিশেষে বাষ্পাকারে পরিণত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক উত্তাপপ্রভাবে তত্রত্য পদার্থসমূহ সম্পূর্ণরূপে গলিত বা অর্দ্ধগলিত অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে আগ্নেয় গিরি উদ্ভব হয়। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে যে জল প্রবিষ্ট হয় উহা বাষ্পাকারে পরিণত হওয়াতে ক্রমশঃই উহার আয়তনের বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে উহার আয়তন এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে মাধ্যাকর্ষণশক্তি আর উহার ঊর্দ্ধমুখ বেগকে দমন করিয়া রাখিতে পারে না, উহা প্রবলবেগে ভূগর্ভভেদপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থসমূহও জল কর্দ্দম প্রস্তর প্রভৃতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। আবদ্ধ বাষ্পরাশির বেগবশতঃ ভূপৃষ্ঠে যে গহ্বর উৎপন্ন হয়, উল্লিখিত পদার্থ সমূহ ঐ গহ্বরের মুখ দিয়া উৎক্ষিপ্ত হইবার পর উহার কিয়দংশ গড়াইয়া দূরে চলিয়া যায়, এবং কিয়দংশ গহ্বরের চতুস্পার্শ্বে জমাট বাঁধিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে। এই প্রকারে আগ্নেয় পর্ব্বতের উদ্ভব হয়। ফলতঃ আগ্নেয়গিরিগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে পর্ব্বত নহে। উহার মধ্যস্থ গহ্বর দ্বারা যে সকল পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয় তৎসমুদয় উহার চতুস্পার্শ্বে স্তূপাকারে জমাট বাঁধিয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া থাকে এইমাত্র। অগ্ন্যুৎপাত হইবার সময় উক্ত গহ্বর হইতে বাষ্প, ধূম, জল, কর্দ্দম, ধূলি, গলিত প্রস্তর ও ধাতু প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ আগ্নেয়গিরির উপরিস্থ বৃহৎ গহ্বর বা পার্শ্বস্থ গহ্বরসমূহ দিয়া বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

আগ্নেয়গিরিসমূহ সর্ব্বশুদ্ধ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। (১)আহিতাগ্নি(২) বীতাগ্নি ও (৩)সাময়িকাগ্নি। (১)যে সকল আগ্নেয়গিরি হইতে নিয়তকাল অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে, কখনই বিশ্রাম

নাই, তাহাদিগকে আহিতাগ্নি আগ্নেয়গিরি কহে। এই প্রকার আগ্নেয়গিরির উদাহরণ অতি বিরল। সিসিলিদ্বীপের অন্তর্গত এটনা ও নেপ্‌লসের অন্তর্গত বিসুবিয়স এই দুই আগ্নেয়গিরির মধ্যস্থলে ভূমধ্যসাগরে ষ্ট্রম্বোলি নামে একটী আগ্নেয়গিরি আছে। উহা হইতে চিরকাল অবিশ্রান্তে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। এই জন্য সাধারণ লোকে এই পর্ব্বতটীকে ভূমধ্যসাগরের লাইটহাউস বা বাতিঘর কহিয়া থাকে। (২) যে সকল আগ্নেয় গিরির গহ্বরমাত্র অবশিষ্ট আছে, কখনই অগ্ন্যুদ্গম হইতে দেখা যায় না, অথবা কখন হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে শুনাও যায় না, ফলতঃ যে গুলি চিরকালের জন্য নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, যাহাদের আকারদৃষ্টে কেবলমাত্র এই বোধ হয় যে কোন না কোন সময়ে উহাদের গহ্বর হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল, তৎসমুদয়কে বীতাগ্নি বা নির্ব্বাণ আগ্নেয়গিরি কহে। ফ্রান্সদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত অবরন্ পর্ব্বত এই শ্রেণীর আগ্নেয় পর্ব্বতের অন্যতম উদাহরণ। এতদ্ভিন্ন তুরস্ক, জর্ম্মণি, স্পেন, স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশের কতকগুলি পর্ব্বতের আকার ও গঠনদৃষ্টে বোধ হয় যে কোন না কোন কালে এই গুলি হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল। আমাদের দেশে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরেও নির্ব্বাণ আগ্নেয়গিরির দুই একটী নিদর্শন পাওয়া যায়। (৩) যে সকল আগ্নেয় পর্ব্বত মধ্যে মধ্যে কিছুকাল নির্ব্বাণ ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে প্রবলবেগে অগ্নি ধূম ধাতুনিস্রব প্রভৃতি উদ্গার করে, তাহাদিগকে সাময়িক আগ্নেয়গিরি কহে। পৃথিবীতে এই প্রকার আগ্নেয়গিরির সংখ্যাই অধিক। এটনা বিসুবিয়স প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান আগ্নেয় পর্ব্বত এই শ্রেণীর উদাহরণ।

আগ্নেয় পর্ব্বতসমূহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা আকারের হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রতম পর্ব্বতগুলির আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধের অপেক্ষা বৃহৎ হইবে না, কাস্পিয়ান সাগরের চতুর্দ্দিকে এই প্রকার ক্ষুদ্র আগ্নেয় পর্ব্বত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গহ্বর হইতে কেবল কর্দ্দম নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বৃহত্তর আগ্নেয়পর্ব্বতসমূহের আকার অতি বৃহৎ। অনেক আগ্নেয় পর্ব্বতের অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ শিখর দেখিতে পাওয়া যায়। আণ্ডিস পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ কটোপ্যাক্সি নামক আগ্নেয় পর্ব্বত সাগরসীমা হইতে ১৮৮৮৭ ফুট উচ্চ। ইহার উপরের দিকের ৪০০০ ফুট পরিমিত অবয়ব নিরন্তর বরফে আচ্ছন্ন। শিখরটী মোচার অগ্রভাগের ন্যায়। এই শিখরের ঊর্দ্ধভাগে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। ঐ গহ্বরের মুখ দিয়া ধূম ভস্ম ধাতুনিস্রব প্রভৃতি বেগে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইয়া থাকে। এটনা, বিসুবিয়স, হেকলা প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান প্রধান আগ্নেয় গিরিসমূহের ও আকার এইরূপ। সমুদয় আগ্নেয় পর্ব্বতের শিখরদেশেই এক একটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গহ্বর থাকে। এই গহ্বরের আকার কটাহ বা বাসালীর ন্যায় হইয়া থাকে। এই ফুট স্থানগুলিকে আগ্নেয়গিরিগহ্বর কহে। এই গহ্বরের মুখ হইতে ভূগর্ভপর্য্যন্ত যেন একটী প্রকাণ্ড নল বসান থাকে। ভূগর্ভ হইতে ধাতুনিস্রব প্রভৃতি ঐ নলের মধ্য দিয়া উপরিস্থ গহ্বরে উপনীত হয়, এবং বেগে চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতে থাকে। অনেক সময় অনেক আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বর হইতে ধূলি ও প্রস্তরখণ্ড নির্গত হইয়া চারি পার্শ্বে পতিত হয়। এই সকল উদ্গীর্ণ পদার্থ মোচাকার পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন পার্শ্ব দ্বারা পতিত হইয়া উহার ব্যাস ও উচ্চতা বর্দ্ধিত করে। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরসমূহ গলিত অবস্থায় প্রধান গহ্বর ও উহার পরিতোবর্ত্তী গহ্বরসমূহ দ্বারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, এবং পর্ব্বতের আয়তনবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই প্রকারে যতই আগ্নেয় পর্ব্বতের আয়তনবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উহার চারি পার্শ্বে নূতন নূতন গহ্বর উৎপন্ন হয়। এবং ঐ সকল অভিনব গহ্বরসমূহের মুখ দিয়া ধাতুনিস্রব প্রভৃতি নির্গত হইয়া উহার চারি পার্শ্বে জমিতে থাকে। এবং নূতন নূতন ক্ষুদ্র আগ্নেয়পর্ব্বত উৎপন্ন হয়। এই জন্য প্রায় সমুদয় প্রধান আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক

গহ্বর ও মোচাগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এটনা টেনিরিফ প্রভৃতি প্রায় সমুদয় আগ্নেয় পর্ব্বতেই এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

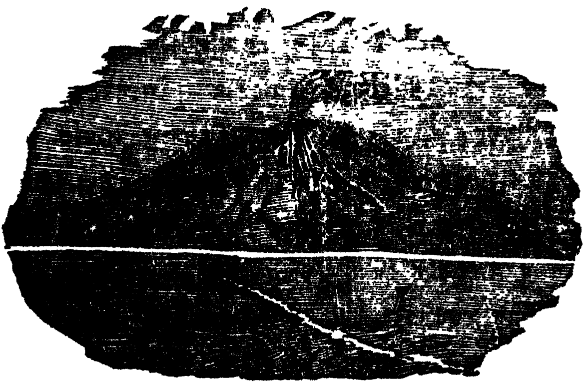
অগ্ন্যুৎপাত হইবার প্রারম্ভে ভূমির নিম্ন হইতে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হইতে থাকে। বোধ হয় যেন দূরে মেঘগর্জ্জন ও বজ্রধ্বনি হইতেছে। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরির পরিবেষ্টী ভূভাগে ঈষৎ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ক্রমশঃ ঐ শব্দ ও কম্পের পরিমাণবৃদ্ধি হইতে পারে। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের ভিতরে ঘন ঘন বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে থাকে, এবং ক্ষণকাল এইরূপ হইবার পর গহ্বরের মুখ হইতে রাশীকৃত ধূলি ও বাষ্প প্রবলবেগে নিক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধ আকাশে প্রসৃত হইতে থাকে। এবং যে সকল আগ্নেয়গিরিশিখর অতিশয় উচ্চ বলিয়া নিরন্তর বরফে আচ্ছন্ন থাকে, এই সময় সেই সকল বরফ উত্তাপবশতঃ গলিত হওয়াতে অনবরত জলস্রোত বহিতে আরম্ভ হয়। অনতিবিলম্বেই ঐ উৎক্ষিপ্ত বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টির আকারে পরিণত হয়, এবং আগ্নেয়গিরির চতুর্দ্দিকে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে। বাষ্প নির্গত হইবার পূর্ব্বে কখন কখন এত ধূলি উৎক্ষিপ্ত হয় যে বহুদূর পর্য্যন্ত আকাশ যেন প্রগাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হয়। খ্রীষ্টের ৭৯বৎসর পূর্ব্বে বিসুবিয়সপর্ব্বতের যে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে পম্পী, হর্কিউলেনিয়ম, ও ষ্ট্যাবীনামে তিনটী প্রসিদ্ধ নগরী একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ঐ সময় এত ধূলি ও ভস্ম গহ্বরপথ হইতে নির্গত হইয়াছিল যে পর্ব্বতের পরিতোবর্ত্তী প্রায় ১৫।১৬ মাইল স্থান যেন নিশীথের প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর অগ্নিশিখা, তপ্তাঙ্গারবৎ প্রস্তরখণ্ড, ও অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ বেগে দুই তিন হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, এবং পরিশেষে গলিত ধাতু ও প্রস্তরাদির নিস্রব অগ্নিস্রোতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে গড়াইয়া যায়।

অগ্ন্যুদ্গমের বেগ ও অতি ভয়ানক। কথন কথন বৃহৎ বৃ
ও অত্যন্ত ভারি শিলাখণ্ডসকল এত বেগে নিঃসৃত হয়
ঘটনাস্থান হইতে নয় মাইল দূরে গিয়া ভূমিস্পর্শ করে
১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতের সময় ধূলি
প্রস্তরখণ্ডসমূহ ১০০০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় দুই মাইল ঊর্দ্ধে উ
ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত কটোপাক্সী নাম
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় একবার উহার অগ্নিশি
৩০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল এবং ৬০০ মাইল দূর হইতে অগ্ন
দ্গমের ভয়ানক শব্দ শ্রুত হয়। ঈষ্ট ইণ্ডিসের অন্তর্গত সম্বোঃ
নামক স্থানে তম্বরুনামক একটী আগ্নেয় গিরি আছে। ১৮১
খৃষ্টাব্দে উহার যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহার ভস্ম ৩০০ মাইল অ
রস্থ জাবাদ্বীপের রাজপথে পতিত হইয়াছিল এবং প্রায় ১০০
মাইল ব্যবহিত সুমাত্রা দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সাগরে প্রায় দুই ফু
পুরু হইয়া ভাসিয়াছিল। ১৮৪৫ অব্দে আইসল্যাণ্ডের অন্তর্গ
হেকলা পর্ব্বতের যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহার উদ্গীর্ণ ভস্ম ৭০
মাইল দূরে অবস্থিত অর্কেণীদ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছিল
খৃষ্টের ৭৯ বৎসর পূর্ব্বে বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পি
ও হর্কিউলেনিয়ম নগরদ্বয় ৭০ হইতে ১১২ফুট পর্যান্ত পুরু ভস্ম
রাশির নীচে প্রোথিত হইয়া যায়। চিলির অন্তর্গত আণ্টিউকে
পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে বৃহদাকার শিলাখণ্ডসকল পরস্পরে
আঘাত প্রতিঘাত সত্বেও ৩৬ মাইল পথ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া
ছিল। অগ্ন্যুদ্গমের এইরূপ ভয়ানক বেগ বলিয়া অগ্ন্যুৎপাতে
সময় পর্ব্বতগহ্বরের পার্শ্বস্থ ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্ব পূ
অগ্ন্যুৎপাতের সময় উৎক্ষিপ্ত যে সকল প্রস্তর ধাতব ও ভস্ম
দি পদার্থ কঠিনভাবে রাশীকৃত হইয়া অবস্থিত থাকে, তৎসমু

দয় প্রবলবেগে চূর্ণীভূত হইয়া যায়, এবং এই প্রকারে গহ্বরের মুখ প্রশস্ত হইয়া উঠে। এই সময় নিম্নস্থ বন্দীকৃত উষ্ণজল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বেগে উপরিস্থ পদার্থসমূহের গুরুতর ভার অতিক্রমপূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত হয় বলিয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ সংঘটিত হয়। প্রত্যেক নিঃসরণে প্রভূত বাষ্প উদ্গত হইতে থাকে, এবং উহার কিয়দংশ লঘুতর হইয়া উচ্চ আকাশে উত্থিত হয়, আর কিয়দংশ গাঢ়তর হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে থাকে। অগ্ন্যুদ্গমের ঈদৃশ প্রভূত বেগ বলিয়া অনেক সময় আগ্নেয়গিরির উপরিস্থ মোচাগ্রবৎ অংশটী চূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং পর্ব্বতের উচ্চতার হ্রাস হইয়া থাকে। বিসুবিয়স পর্ব্বতের বর্ত্তমান মোচটী অপেক্ষাকৃত অভিনব। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দের পূর্ব্বে উক্ত পর্ব্বত বহুকাল অবধি নিশ্চেষ্ট ও নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। তৎকালে উহার উপরিভাগ নানাবিধ তরুগুল্মাদিতে আচ্ছাদিত ছিল। খৃষ্টের ৭৯ বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ বিসুবিয়সের এক প্রবল অগ্ন্যুৎপাতের সময় উহার পুরাতন মোচটী ভগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া উহার পরিবর্ত্তে একটী নূতন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মোচ আবির্ভূত হইল। পরপৃষ্ঠার চিত্রে বিসুবিয়সের যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইতেছে উহাতে প্রাচীন গোলার্দ্ধাকার মোচটী অভিনব মোচের পশ্চাতে অবস্থিত রহিয়াছে।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভস্ম, ধূম, অগ্নিশিখা প্রভৃতি নির্গত হইবার পর আগ্নেয়পর্ব্বতের গহ্বর হইতে ধাত্বাদিনিস্রব নদীস্রোতের ন্যায় নির্গত হইয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে গড়াইতে থাকে। আগ্নেয়গিরির নিস্রব জলের ন্যায় তরল নহে, উহা মধুপ্রভৃতির ন্যায় ঈষৎ গাঢ়। প্রথমতঃ ইহা হইতে শ্বেত আলোক নির্গত হইতে থাকে, পরে উহার উপরিভাগ ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া যতই কঠিন হইতে থাকে, ততই উহার বর্ণও শ্বেত হইতে লোহিতে

পরিণত হয় এবং অবশেষে কঠিন হয়। এই নিস্রব যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, উহার উপরিভাগ হইতে অনবরত বাষ্প ও ধূম নির্গত হইতে থাকে



ফলতঃ উহা একটী প্রকাণ্ড অগ্নিময় স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হয়।

গলিত স্রোতের গতিবেগ সর্ব্বত্র সকল সময় সমান হয় না। যে স্থান দিয়া উ প্রবাহিত হয়, তাহার ঢাল, নিঃসরণস্থান হইতে দূরত্ব, পথিস্থ বাধা প্রং কারণের তারতম্যবশতঃ উহার গতিবেগের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১। খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স পর্ব্বতের যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহা প্রথম নয় মাইল চারি মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু পরের ছয়মাইল যাইতে উ সম্পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল লাগিয়াছিল। ১৮৪০ অব্দে স্যাণ্ডউইচ দ্বী মনালোয়া পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে গলিত ধাতুনিস্রব দুই ঘণ্টার মধ্যে মাইল অতিক্রম করিয়াছিল। আবার আগ্নেয় পর্ব্বতের নিস্রব ঘটনাস্থান হ কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহারও কিছুমাত্র স্থিরনিশ্চয় নাই। বিসু পর্ব্বতের ধাতুনিস্রব কখন কখন সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পৌঁছে, কখন বা ২।৪ গজের অধিক যাইতে পারে না। ১৭৮৩ হইতে ৮৫ পর্য্যন্ত দুই বৎসর আ লণ্ডের অন্তর্গত স্কাপটার জোকল পর্ব্বতের যে ধাতুনিস্রব হয়, তাহা এ ৪৫ মাইল ও অন্য দিকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই প্রবাহের বিস্তার ও ৭ মাইল হইতে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত এবং গভী ১০০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অগ্নিময় নিস্রবের উত্তাপ উ

বিবরণ শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিস্রবের উপরিভাগ অল্পে অল্পে শীতল হইয়া যায় বটে, কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ উষ্ণতার হ্রাস হইতে বহুকাল অতিবাহিত হইয়া থাকে। মেক্সিকোর অন্তর্গত জোরুলো নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ৪৫ বৎসর পরেও উহার নিস্রবের আন্তরিক উষ্ণতা এত অধিক ছিল, যে উহার একটী অংশের ২।৩ ইঞ্চি নিম্ন হইতে ফাটলের মুখে উত্থিত অগ্নিতে অনায়াসে চুরট ধরান যাইত। অগ্ন্যুৎপাতের সময় সর্ব্বপ্রথম ধুম অগ্নিশিখা প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি নির্গত হইবার পর গলিত নিস্রব নিঃসৃত হইতে থাকে। এই নিস্রব অবাধে নির্গত হইতে থাকিলে প্রায়ই উহার বজ্রনির্ঘোষ প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রবের শান্তি হয়।

ভূপৃষ্ঠে যতগুলি সজীব অর্থাৎ কার্য্যকর আগ্নেয়গিরি আছে তন্মধ্যে ১৭৩ টী সর্ব্বপ্রধান। সমুদয় আগ্নেয়গিরিই একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ভূপৃষ্ঠের নানাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকাংশ আগ্নেয় পর্ব্বত দ্বীপ অথবা সাগরসন্নিহিত কোন না কোন পর্ব্বতশ্রেণীতে অবস্থিত। পৃথিবীস্থ আগ্নেয়পর্ব্বতসমূহের প্রায় ২ এর তিন অংশ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থ দ্বীপ অথবা উহার সন্নিহিত ভূভাগে অবস্থিত। পৃথিবীস্থ প্রায় সমুদয় আগ্নেয়গিরিই ঋজুরেখাক্রমে অবস্থিত। কেবল অল্পসংখ্যক পর্ব্বত এই নিয়মের বহির্ভূত, অর্থাৎ উহারা পৃথক্ পৃথক্ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল মহাদেশ ও দ্বীপশ্রেণী আছে, তৎসমুদয় যেন আগ্নেয়গিরি নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়কের ন্যায়। প্রশান্ত মহাসাগর এই অঙ্গুরীয়কের অন্তর্গত অবকাশ। এই মহাসাগরের পূর্ব্ব দিক হইতে আরম্ভ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আণ্ডিস পর্ব্বত শ্রেণীর প্রায় যাবতীয় শৃঙ্গই এক একটী আগ্নেয় পর্ব্বত, আণ্ডিস পর্ব্বতের প্রায় ৪৩ টী শৃঙ্গ হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়া থাকে। এই শ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম কিনারা দিয়া প্রায় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। এবং গোয়াটিমালা ও মেক্সিকো হইয়া উত্তর আমেরিকা পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়াছে। পরে তথা হইতে আলুসিয়ান ও কিউরাইল দ্বীপশ্রেণী হইয়া প্রশান্তমহাসাগরের উত্তর সীমায় অবস্থিত কামস্কাটকাদ্বীপে উপনীত হইয়াছে। কামস্কাটকা হইতে জাপান ফর্ম্মোজা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইয়া ইহা মালয়দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে এবং দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা দক্ষিণপূর্ব্বমুখে নবগিনি ও নব হেব্রিডিস হইয়া নব জিলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং

তথাহইতে প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার নিকটস্থ ফে
সোসাইটী প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা য
তেছে যে এই শ্রেণীটী ঠিক যেন একটী খঙ্গুবীয়কের ন্যায়। দ্বিতীয় শা
উত্তরমুখে জাবা ও সুমাত্রা হইয়া বর্ম্মার পশ্চিম উপকূলে উপ
হইয়াছে। এই স্থানে অনেক দূর ব্যবধানের পর আমরা আসিয়ার পা
সীমায় কাস্পিয়ান সাগরের নিকটে আবার এই শাখাটীকে দেখিতে প
কাস্পিয়ান সাগর হইতে ইহা বরাবর গ্রীক দ্বীপ শ্রেণী বিসুবিয়স এটনা প্রভৃ
হইয়া অবশেষে আজোরপুঞ্জ, ক্যানেরিপুঞ্জ ও কেপ বর্ড পুঞ্জ পর্য্যন্ত বি
হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন অনেক মহাদেশের উপকূলে বা অনেক দ্বীপে অসংশ্লিষ্ট আ
পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর মহাসাগ
আইসলণ্ড, প্রভৃতি দ্বীপে আগ্নেয়গিরি দৃষ্ট হয়, ভারতমহাসাগরের পশ্চি
উপকূলের নিকট লোহিতসাগর বোর্বো দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি ক্ষু
ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন টেরাডেল ফিউগে
দ্বীপে কয়েকটী আগ্নেয়গিরি আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আগ্নেয় পর্ব্বতগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ। এখানে প্র
৪৩টী আগ্নেয়গিরি আছে। আণ্ডিসশ্রেণীর অন্তর্গত কটোপ্যাক্সী, এণ্টিসা
টঙ্কাবেগোয়া প্রভৃতি কয়েকটী অতি ভয়ানক। মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো
দেশে প্রায় ২০ টী আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। এই সমুদয়ের মধ্যে টকসলা
(তক্ষশিলা) পপোকাটাপেটল সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ।

আসিয়াখণ্ডে প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি অধিক নাই। কাস্পিয়ান সাগরের উপ
কূলে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরি আছে, ইহা হইতে কেবল পঙ্ক ও কর্দ
নির্গত হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিমে বেলুচিস্তানে কয়েকটী ক্ষুদ্র আগ্নেয়গি
আছে। সুমাত্রা জাবা কামস্কাটকা প্রভৃতি দ্বীপে কয়েকটী আগ্নেয়গিরি আছে
বঙ্গসাগরে বন্ধ্যদ্বীপ নামে একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ আছে। উহা একটী আগ্নেয়
গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। প্রায় ৭০ বৎস
পূর্ব্বে ঐ গিরির এক ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপে গ্রীস সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীতে কয়েকটী আগ্নেয়গিরি আছে। কি
সিসিলি দ্বীপের অন্তর্গত এটনা, নেপলসের অন্তর্গত বিসুবিয়স ও আইসলণ্ডে

অন্তর্গত হেকলা এই কয়টী আগ্নেয়গিরিই ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বিসুবিয়স পর্ব্বতের শৃঙ্গ মোচাগ্র। ইহার গহ্বরের পরিধি প্রায় তিন মাইল এবং গভীরতা ২০০০ ফুট। খৃষ্টের ৭৯ বৎসর পূর্ব্বে এই আগ্নেয়গিরির প্রসিদ্ধ অগ্ন্যুৎপাতে পম্পী প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ নগরী বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে একটী কূপ খনন করিবার সময় হারকিউলেনিয়ম নগরের নাট্যশালা বাহির হইয়া পড়ে। পরে ক্রমাগত অনুসন্ধান ও খননদ্বারা পম্পী প্রভৃতি কয়েকটী নগরের সমগ্র নষ্টাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় নগরীর যে ভাগের যেরূপ অবস্থা ছিল, এত কালেও তাহার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। নাট্যশালা বাটী দোকান প্রভৃতি তদবস্থই রহিয়াছে। তবে মনুষ্যের চিহ্ন অধিক দেখা যায় না। ইহাতে বোধ হয় অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া তত্রত্য অনেকানেক অধিবাসী পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিল। বিগত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ অবধি এই পর্ব্বত হইতে পুনঃ পুনঃ অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। এট্না পর্ব্বত সিসিলিদ্বীপে অবস্থিত। ইহার শিখরের উচ্চতায় প্রায় ১১০০০ ফুট এবং পরিধি প্রায় ৮৭ মাইল। এই পর্ব্বতের পার্শ্ব প্রদেশে বহুবিধ ফল ও শস্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং তথায় অনেক লোকের বাস। ইহার উপরিভাগ নানাবিধ বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ১০০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ আছে। ১৬৬৯ অব্দে ইহার নিস্রবে ১৪টী সমৃদ্ধ গ্রাম অধিবাসির সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭৬৬ অব্দে ঐ রূপ প্রবল স্রোতের উত্তাপে ৫০ ফুট উচ্চ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড একবারে দ্রবীভূত হয়। আইসলণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী হেক্‌লা পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত এক এক বার ৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। ১৭৮৩ অব্দে এই পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে আইসলণ্ডের অনেক স্থান উন্নমিত ও অনেক স্থান অবনমিত হইয়া যায় এবং প্রবল নিস্রবস্রোতে বহুলোকের প্রাণবিনাশ হয়। আফ্রিকার অন্তর্গত কেনেরিপুঞ্জে টেনিরিফ নামে আগ্নেয় গিরি অবস্থিত আছে। ইহাই আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

নির্ব্বাণ আগ্নেয়পর্ব্বতের গন্ধকভূমি, সিসিলি জাবা কাস্পিয়ানসাগর প্রভৃতি সন্নিহিত প্রদেশ প্রভৃতির কর্দ্দমোৎক্ষেপক গিরি, কাস্পিয়ানসাগরের পশ্চিমস্থ অগ্নিক্ষেত্র চীন ও চট্টগ্রামের অগ্নিময় উৎস, আইসলণ্ড দ্বীপের উষ্ণপ্রস্রবণ

প্রভৃতি আগ্নেয় পর্ব্বতের রূপান্তর মাত্র। এতদ্ভিন্ন সাগরগর্ভে বিলীন অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। ইহাদের অগ্ন্যুৎপাতে কখন কখন নূতন নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হয়।

আগ্নেয় গিরির কার্য্যবশতঃ ভূপৃষ্ঠের কোন কোন ভাগ উন্নত ও কোন কোন ভাগ অবনত হইয়েছে, ইহা নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রভাবে অপার সাগর মধ্যে নূতন নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইয়া ভূভাগবৃদ্ধি করে; অতএব বিষম যমদূতস্বরূপ আগ্নেয় গিরি ও যে জগতের উপকারার্থ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভূমিকম্প ও উহার ফল।

ভূমিকম্প কাহাকে কহে তাহা আমাদের দেশের সকলেই প্রায় বিদিত আছেন। আমাদের দেশে আগ্নেয়গিরি নাই, সুতরাং ভূমিকম্পের প্রভাব ও অতি বিরল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে অল্প অল্প ভূমিকম্প হইয়া থাকে তাহা হইতেই ভূমিকম্পের প্রকৃতি কিপ্রকার তাহা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যখন আমাদের বাটীর নিকট দিয়া এক খানি বৃহৎ গাড়ি অথবা কলের গাড়ি সবেগে চলিয়া যায়, অথবা নিকটে কেহ কামান ছুড়ে, তাহা হইলে বোধ হয় যেন আমাদের ঘর দ্বার ঐ সময় কাঁপিয়া উঠিল। লৌহচূর্ণ গন্ধক ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া যদি মাটীতে একটা ছিদ্র করিয়া পুঁতিয়া মাটী চাপা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে একটী শব্দ হয় ও গর্ত্তটীর চতুষ্পার্শ্ব কম্পিত হইয়া উঠে। প্রকৃত প্রস্তাবেও উল্লিখিত ঘটনা হইলে ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী কিয়দংশ স্থান কম্পিত হয়। আমরা যে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ভূমিকম্পশব্দে নির্দ্দেশ করি উহা আর কিছুই নহে।

পূর্ব্বোক্ত কৌশলে যেরূপ আমাদের ঘর দ্বার কাঁপিয়া উঠে, কোন নৈসর্গিক কারণে সমগ্র পৃথিবী অথবা উহার কিয়দংশ সেইরূপে কম্পিত হইলেই আমরা ভূমিকম্প অনুভব করিয়া থাকি। পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরিসংঘটনের যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে ভূমিকম্পের কারণ কি তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভূগর্ভে অবরুদ্ধ বাষ্পরাশি উপরিস্থ ভূভার পরাভবপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উঠিলেই আগ্নেয়পর্ব্বতের সংঘটন হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা কার্য্যতঃ উপরে উঠিতে না পারে, ততক্ষণ ঊর্দ্ধেই হউক, না পার্শ্বেই হউক, বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য অনবরত পথ অন্বেষণ করে। বাষ্প লঘু পদার্থ বলিয়া কখনই অবাধে অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভূগর্ভের ভিতর অবরুদ্ধ বাষ্পরাশি বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য অথবা পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হইবার জন্য যে বল প্রকাশ করে তাহা অতি ভয়ানক। যখন বাষ্পরাশির বেগ উপরিস্থ ভূভাগের মাধ্যাকর্ষণবেগের অপেক্ষা অধিক হয়, তখনই উহা নানাবিধ গলিত পদার্থের সহিত ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হয়। কিন্তু যাবৎ উহা কোন প্রকারে নিষ্ক্রান্ত বা প্রসৃত হইবার পথ না পায়, ততক্ষণ উহার বেগ ও উপরিস্থ ভূভাগের মাধ্যাকর্ষণবেগ এই উভয়ের ভয়ানক আঘাত প্রতিঘাত হইতে থাকে। ভূগর্ভের যে অংশে এই ঘটনা উপস্থিত হয় উল্লিখিত উভয় বেগের ঘাত প্রতিঘাতে ঐ স্থান ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থান এরূপ আঘাত (ধাকা) প্রাপ্ত হয়, যে সমুদয় একবারে কম্পিত হইয়া উঠে। যাবৎ উভয়ের মধ্যে একটী বেগ অধিক প্রবল না হয়, তাবৎ ঐ আঘাত প্রতিঘাতের নিবৃত্তি হয় না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইবার পূর্ব্বে উহার

চতুষ্পার্শ্বে বহুদূর ব্যাপিয়া ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। যাবৎ আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বর দিয়া অধস্থ বাষ্পপ্রভৃতি বহির্গত না হয়, ততক্ষণ ভূমিকম্প ও তজ্জন্য ভয়ানক শব্দের নিবৃত্তি হয় না। বাষ্প ও গলিত পদার্থাদি অনর্গল নিক্রান্ত হইতে থাকিলে ভূমিকম্প ও অন্যান্য উৎপাতের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল সময় নিম্নে অবরুদ্ধ বাষ্পরাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পায় না। যে দেশে আগ্নেয় গিরি আছে, তথায় অনায়াসেই ঐ বাষ্প আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বর দিয়া নিক্রান্ত হইয়া যায়, কিন্তু যেখানে আগ্নেয় গিরি নাই তথায় ভূমিকম্পের বেগ অল্প হইলে অবরুদ্ধ বাষ্পাদি পার্শ্বে প্রসৃত হইয়া যায় ও উহার বেগ নষ্ট হয়, কিন্তু যদি উহার বেগ এত অধিক হয়, যে উহা উপরিস্থ ভূভাগের মাধ্যাকর্ষণবেগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অনেক সময় ভূমিকম্পের প্রবল বেগে ভূপৃষ্ঠ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উহাতে গহ্বর উৎপন্ন হয়। নিম্ন স্থান উৎক্ষিপ্ত হয়, উচ্চ স্থান অধঃ পতিত হয়, পর্ব্বত সমুদ্র সাৎ হয়। ফলতঃ বায়ুর বেগে যে প্রকারে জলকে তরঙ্গময় করে, ভূমিকম্পের বেগবশতঃ এই সসাগরা বিশ্বম্ভরার পৃষ্ঠদেশ সেই প্রকারে আন্দোলিত হইয়া থাকে।

বাষ্পাদির যেরূপ বেগবশতঃ ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, ও ভূগর্ভের যৎপরিমাণ স্থান অধিকারপূর্ব্বক উক্ত বেগ কার্য্যকর হয়, এই উভয়ের তারতম্য অনুসারে ভূমিকম্পের বেগ ও প্রচণ্ডতার তারতম্য হইয়া থাকে। যদি ভূমিকম্পের বেগ অল্প হয়, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে সামান্য কম্পমাত্র অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ বেগ অতিশয় প্রবল হয়, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে উহার ফলও অতি ভয়ানক হইয়া উঠে। ভয়ানক ভূমিকম্প হইলে অনেক সময় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বাত্যার সময় সমুদ্রপৃষ্ঠের ন্যায়

প্রবলবেগে তরঙ্গায়িত ও ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া থাকে, পৃথিবীর ভিত্তি ও বন্ধনস্বরূপ পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি শিথিল হইয়া যায়, বৃক্ষসমূহ শ্লথ ও সমূলে উৎপাটিত হয়, গ্রাম নগর প্রভৃতি ভূমিসাৎ হয়, এবং অসংখ্য জীব কালগ্রাসে পতিত হয়। অনেক সময় ভূমিকম্প হইবার পূর্ব্বে প্রায় কোন প্রকার পূর্ব্ব-লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে দূরে বজ্রধ্বনি অথবা কামান ছোড়া হইলে যেরূপ শব্দ শুনা যায়, ভূগর্ভ হইতে সেই প্রকার শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে, এবং এইরূপ শব্দের কারণ কি মনুষ্য-গণ ইহা স্থির করিতে না করিতে ভূমিকম্পরূপ ভয়ানক যমদূত প্রকৃতপ্রস্তাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। *

ইতিহাসে যাবতীয় ভূমিকম্পের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, তৎ-সমুদয়ের মধ্যে লিসবন নগরের ভূমিকম্প সর্ব্বপ্রধান। বিগত ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবন নগরে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, উহা ইউরোপের চতুর্গুণপরিমিত স্থান অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর প্রায় দ্বাদশ ভাগ লইয়া কার্য্যকর হইয়াছিল। ইহাদ্বারা সমগ্র ইউ-রোপ কম্পিত, উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত অন্টেরিয়ো হ্রদের জলরাশি আন্দোলিত ও তরঙ্গায়িত, এবং আটলাণ্টিক মহা-সাগর দোলাচল হইয়াছিল। এই ভয়ানক ব্যাপার উপলক্ষে লিসবনের নিকটস্থ সাগরের তরঙ্গ তাহার স্বাভাবিক সীমা অতি-ক্রমপূর্ব্বক প্রায় ৫০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। এবং ছয় মিনিট কালের মধ্যে ৬০,০০০ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। ১৭৮৩ অব্দে ক্যালেব্রিয়াতে যে ভূমিকম্প হয়, তাহার প্রভাবে ২২ বর্গ মাইল

* যে স্থানে অমেয়িক আগ্নেয় গিরি আছে, তথায় উহার গহ্বর হইতে অগ্ন্যুৎপাত ভিন্ন সময়েও অনবরত ধুম নির্গত হয় বলিয়া উহার সন্নিহিত প্রদেশে ভূমিকম্পের প্রদর অল্পই হইয়া থাকে।

পরিমিত স্থানের মধ্যে প্রায় ৪০০০০ লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে দক্ষিণ আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকম্প হয়। আণ্ডিস পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগ লইয়া এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত পর্ব্বতের ১৩০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল। ১৭৬২ সালে চট্টগ্রাম প্রদেশে ভূমিকম্প হওয়াতে নানা স্থানের ভূমি ফাটিয়া যায়, এবং সেই সকল স্থান হইতে গন্ধকমিশ্রিত জল নির্গত হইতে থাকে। চট্টগ্রামের উপকূল কিয়ৎপরিমাণে বসিয়া যায় ও উহার সন্নিহিত চেডুপ দ্বীপ উন্নত হইয়া উঠে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ ই জুন কচ্ছ প্রদেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ভুজ নগর এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতা কাটামুণ্ড ও পণ্ডিচেরী নগরেও ঐ প্রবল ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল, এবং অহম্মদাবাদ নগরের প্রসিদ্ধ মসজিদ ভূমিসাৎ হয়। এই সময় সিন্ধুনদের পূর্ব্ব শাখায় জলের গভীরতা ১ ফুট হইতে ১৮ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া যায়। কচ্ছের অন্তর্গত রণ নামক স্থান বসিয়া যাওয়াতে উহা সাগরজলে প্লাবিত হইয়া যায়, এবং সিন্ধুরী নামক দুর্গ ও গ্রাম ডুবিয়া যায়। এই দুর্গ হইতে ৫ মাইল দূরে ৫০ মাইল দীর্ঘ, ১৬ মাইল প্রশস্ত ও ১০ ফুট উচ্চ একটী পাহাড় উৎপন্ন হয়। এই বাঁধ ঈশ্বরকৃত ও উহাতে আরোহণপূর্ব্বক অনেকে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া উহাকে অদ্যাবধি আল্লাবাঁধ কহে।

সকল ভূমিকম্পের গতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। কোন জলাশয়ের মধ্যস্থলে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে যেমন জলের তরঙ্গ গোলাকার হইয়া ক্রমশঃ এক একটী করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ বীচিকদম্বন্যায়েই ভূমিকম্পেরও গতি হইয়া থাকে। জলাশয়ের মধ্যে যে স্থানে ঢিলটী পড়ে,

তথায় তরঙ্গের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, পরে একটীর পর আর একটী তরঙ্গ ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ উহার বেগ কমিয়া যায়। ভূমিকম্প ভূগর্ভের যে অংশে উৎপন্ন হয় তথায় উহার বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, এবং যতই একটীর পর আর একটী কম্পের তরঙ্গ অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উহার বেগেরও হ্রাস হইয়া আইসে। সাগর-তরঙ্গবশতঃ উহার উপরি ভাসমান জাহাজের মাস্তুল যেমন দোলাচল হয়, ভূমিকম্পের বেগে অবিকল সেই প্রকারেই ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ অট্টালিকা বৃক্ষাদি কম্পিত হইয়া থাকে, এবং কখন কখন সমূলে উৎপাটিত হয়।

যখন ভূমিকম্প স্থলভাগে উৎপন্ন না হইয়া সাগরগর্ভে উৎপন্ন হয়,এবং বেগে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে,তখন অতি ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই সময় সমুদ্রের জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ-মালা নিক্ষেপপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী উপকূল গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। ভূমিকম্পের বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প গভীর জলে উপনীত হইলে বাণের সময় নদীতে যেরূপ হয়, সেইরূপ বেগে ও সেইরূপ উচ্চ হইয়া তরঙ্গমালা ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উপ-কূলের নিকটস্থ সাগরজল ক্ষণকালের জন্য পশ্চাদ্গমন করে, এবং সাগরগর্ভ শুষ্ক হইয়া বহির্গত হয়, কিন্তু এইরূপ হইবার পরক্ষণেই উহা আবার ভয়ানক আকারে অগ্রসর হইয়া উপকূল ও স্থলের অনেকদূর পর্য্যন্ত একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। কখন কখন সাগরবারি ৫০।৬০ ফুট উচ্চ হইয়া দৌড়িতে থাকে। লিসব-নের ভয়ানক ভূমিকম্পে অবিকল এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। অধিবাসিগণ প্রাণরক্ষার্থ নদীর তীরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া-ছিল, এমত সময় নদীর জল পশ্চাদ্গমন করাতে নদীগর্ভ বাহির

হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল সাগরতরঙ্গ বেগে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদয় স্থান প্লাবিত করিল এবং অনেক ভয়বিক্লব অধিবাসী মুহূর্ত্তের মধ্যেই কালকবলে পতিত হইল। সাগরতরঙ্গ ভূমিকম্পের সহিত সমানবেগে অগ্রসর হইতে পারে না, এই জন্য অনেক সময় কম্প হইয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে সাগরতরঙ্গ প্রবলবেগে স্থলের দিকে দৌড়িয়া অসাবধান ও নিঃশঙ্কচিত্ত জীবজন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। লিসবনের ভূমিকম্পে ইহাই হইয়াছিল।

প্রকৃতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ভূগর্ভের অধিক গভীর স্থান হইতে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয় না। ভূমিকম্প যত গভীর স্থান হইতেই উত্থিত হউক না কেন, উহা প্রায়ই ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ মাইল গভীরতার মধ্যেই সংঘটিত হয়। যে স্থানে ভূমিকম্পের সংঘটন হয়, তথায় উহার বেগ লম্বভাবে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হয়, সুতরাং সেই স্থানেই উহার বেগ ও উপদ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতে থাকে। পরে কম্পতরঙ্গ যতই অগ্রসর হয়, ততই উহার বেগ কমিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভূমিকম্প-কেন্দ্র হইতে দূরতা অনুসারে উহার বেগেরও হ্রাস হইয়া থাকে।

ভূমিকম্পের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের নানা প্রকার আকার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ উন্নত ও কোন অংশ অবনত হইয়া থাকে। ভূমির উপর ফাটিয়া যাওয়াতে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হয়, এবং সাগরতরঙ্গও প্রবলবেগে স্থলভাগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ভূমিকম্পের প্রভাবে কি প্রকারে ভূপৃষ্ঠের একস্থান উন্নত ও অপর স্থান অবনত হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। পৃথিবী গোলাকার, সুতরাং

কোন কারণে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ উচ্চ হইলে অপর অংশ অবশ্যই নিম্ন হইয়া যাইবে। পর্ব্বতসংঘটনপ্রস্তাবে এই বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অনেক সময় ভূমিকম্প হইয়া সাগরের এক অংশ জলভেদপূর্ব্বক উপরে উত্থিত হয়, আর এক অংশ নিম্ন হইয়া পড়ে ও উন্নমিত অংশের জল ঐ অবনমিত অংশে জমা হয়। প্রবল ভূমিকম্পের পর ঘটনাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহার কোন কোন অংশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, আবার কোন কোন অংশ বা বসিয়া নিম্ন হইয়াছে। ১৮৩৫ অব্দে চিলিদেশের ভূমিকম্পে সন্নিহিত সান্তামারীদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সাগরজলভেদপূর্ব্বক উত্থিত হয়। কিন্তু অনেক সময় এইরূপ উন্নতি ও অবনতি নিঃশব্দে ও অল্পে অল্পে সংঘটিত হয়, আমরা হঠাৎ ইহা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু অনেক দিন অনবরত পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে কোন স্থান পূর্ব্বে উহার বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন ছিল। সমুদ্রের উপকূলের অনেক অংশে, অনেক উচ্চ অংশেও সামুদ্রিক জীবজন্তুর কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। চিকাহ্রদের দক্ষিণ তীর প্রায় ৩০ ফুট বসিয়া গিয়াছে, এই স্থানে প্রায় ২০।৩০ ফুট উচ্চ ভূমির উপরেও সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের অনেক স্থানে এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বোধ হয় ঐ সকল স্থান পূর্ব্বে জলদ্বারা আবৃত ছিল, পরে ধীরে ধীরে ভূপঞ্জরচালনাদ্বারা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। সুইডেন দেশের উপকূল ষ্টকহলম নগর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দূর উত্তর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইতেছে। গত ১০০ বৎসরে ইহার কোন স্থান ৬ হইতে ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত, আবার কোন অংশ বা ২½ ফুট পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলেও এইরূপ উন্নতির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহারা মরুভূমির অনেক স্থানে ৯০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কোন না কোন সময়ে ঐ ভূমরুমি সাগরজলে আচ্ছাদিত ছিল। ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উহার বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

আবার যেমন একদিকে নিঃশব্দপদসঞ্চারে ভূমির উন্নতি হইতেছে, তেমনি অপর দিকে উহার অধোগতি হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ ভূপৃষ্ঠের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, সুতরাং একদিকে উন্নতি হইলে অপরদিকে অবশ্যই অধোগতি হইবে। বলা বাহুল্য যে ভূগর্ভের তাপহ্রাসের পক্ষপাতহেতুক এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। সুইডেনের দক্ষিণাংশে ও স্কটলণ্ডের উপকূলের অনেক স্থানে ভূগর্ভে পুরাতন ইমারত বৃক্ষ প্রভৃতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থানে ঐ গুলি দেখা যায়, তৎসমুদয় স্থান অধুনা সাগরসমতলের নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের উপকূল বসিয়া যাইতেছে ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অভ্যন্তরে ৩৮০ ফুট নিম্ন একটী কূপ খনন করা হয়। ঐ সময় ৩৫০ ফুট নিম্নে কচ্ছপের কঙ্কাল ও ৩৮০ ফুট নিম্নে জলচর জীব ও উদ্ভিদের নিদর্শন পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে কলিকাতার ভূমি অন্ততঃ ৩৭০ ফুট বসিয়া গিয়াছে। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক স্থানে প্রবাল দ্বীপ আছে। প্রবাল এক প্রকার কীট মাত্র। এই সকল কীট ২০ হাত অপেক্ষা অধিক গভীর জলে যাইতে পারে না। সুতরাং ইহা নিশ্চত যে উহারা ২০ হাতের উপর হইতেই গঠন আরম্ভ করে। কিন্তু সকল প্রবালদ্বীপ ত

প্রকৃতপ্রস্তাবে সাগরতলস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? কতকগুলি দ্বীপ যেন কোন সাগরনিমগ্ন পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু যেগুলি এরূপ নহে, সেগুলি ত আর ভাসিয়া থাকিতে পারে না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে সমুদ্রের যে সকল স্থানে প্রবালদ্বীপ নির্ম্মিত হয়, তথায় সাগরগর্ভ বসিয়া যাইতেছে, এবং উহার সহিত প্রবালদ্বীপের নির্ম্মিত অংশগুলিও ক্রমশঃ বসিয়া গিয়া তলস্পর্শ করিতেছে, এবং অধ্যবসায়ী কীটসমূহ বরাবর গঠন করিতেছে বলিয়া দ্বীপগুলি ক্রমশঃ সাগরতলস্পর্শ করিয়াও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সাগরের অনেকানেক অংশ ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা বসিয়া যাইতেছে।

ভূমিকম্পের উপকারিতা। ভূমিকম্পের প্রবল শক্তিবশতঃ স্থলভাগ সাগরজল ভেদপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদয় পৃথিবী একমাত্র জলে আচ্ছন্ন ছিল। পরে ভূমিকম্পের প্রভাববশতঃ জল স্থল ভেদ হইয়াছে। ভূমিকম্প হইতে স্থলভাগের যেমন উৎপত্তি হইয়াছে তেমনি রক্ষাও হইতেছে। ভূমিকম্প না থাকিলে সাগরের উপদ্রবে আবার পৃথিবী প্লাবিত হইত। ভূমিকম্পের প্রভাবে ভূগর্ভস্থ ধাতু প্রস্তর প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ ভূপৃষ্ঠে আনীত হইয়া মনুষ্যের উপকারসাধন করিতেছে। অতএব স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে যে জগদীশ্বর এই ভয়ানক যমদূতকেও মনুষ্যের উপকার সাধনের উপায়স্বরূপ করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্থলভাগের অন্তর্গত জল।

উৎস বা প্রস্রবণ ও অন্তঃসলিলা নদী।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সমুদ্রই জলের একমাত্র আকর পৃথিবীর যেখানে যত জল আছে সমুদয়ই সমুদ্র হইতে সাক্ষা বা পরম্পরাসম্বন্ধে গৃহীত। সমুদ্রের জল সূর্য্যের উত্তাপ ও আ র্ষণে অদৃশ্য বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া নিরন্তর অন্তরীক্ষে উঠি তেছে। তথায় ঐ বাষ্প শীতলবায়ুসংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া মে শিশির হিমশিলা বরফ প্রভৃতি আকার ধারণ করিতেছে।

সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইবার পর তরং ও কঠিন দুই আকারে ভূপৃষ্ঠে পুনঃপতিত হয়। তরং আকার জল, ও কঠিন আকার হিমশিলা ও বরফ। জল আবা দুই প্রকার বৃষ্টির জল ও শিশির। কিন্তু বৃষ্টির জলই অধিকাং বলিয়া কেবল ইহার বিষয় বিবেচনা করিলেই কার্য্য চলিতে পারে। মেঘ হইতে যত জল ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহার কিয়দং ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার পর পুনর্ব্বার বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হয়। এবং অবশিষ্ট ভাগের কিয়দংশ ভূপৃষ্ঠের বিবরসমূহদ্বারা উহা অভ্যন্তরেপ্রবিষ্ট হয়। আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে যে ঐ ভূমিপ্রবিষ্ট জল পৃথিবীর অবয়বে শোষিত হইয়া একবারে বিন হইয়া যায়। কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে ে এরূপ মনে করা ভ্রম। ভূমিপ্রবিষ্ট জলের অতি অল্পমাত্র অং একবারে অপুনরাবৃত্তির জন্য বিনষ্ট হইতে পারে ইহা যথার্থ যতটুকু জল ভূগর্ভের অত্যন্ত গভীর স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত অগ্নিময় প্রস্তরদ্রবের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে মিশ্রি হয়, তাহা একবারে বিনষ্ট হইবারই সম্ভাবনা, যদি ইহা প্রকৃত

হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর জলভাগ হইতে কিছু কিছু যে কমিয়া যাইতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই, যদি যুগ যুগান্তর এইরূপ অনবরত কমিতে থাকে, তাহা হইলে অবশেষে আমাদের এই ধরিত্রী সম্পূর্ণরূপে জলশূন্য হইয়া চন্দ্রের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এই ক্রমিক হ্রাস এত অণুপরিমাণে হইয়া থাকে যে উহার দ্বারা কিছু বাস্তবিক ক্ষতি হইতে যুগ যুগান্তর লাগিবে, ফলতঃ উহা অতি অল্পমাত্র। যদি ঐ অন্তিঃপ্রবিষ্ট জলের অধিকাংশ একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে বৃষ্টিসত্বেও কালক্রমে নদী হ্রদ প্রভৃতি বিশীর্ণ বা শুষ্ক হইয়া যাইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভূমিপ্রবিষ্ট জলের অধিকাংশই পুনর্ব্বার ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইয়া থাকে এবং সমুদ্রে নীত হইয়া সাধারণ নিয়মের অধীন হয়। উৎস দ্বারাই এই জল পুনর্ব্বার ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে ভূমিপ্রবিষ্ট জল ভূপৃষ্ঠস্থ ছিদ্র বা গহ্বর দ্বারা পুনরুত্থিত হইলে তাহাকেই উৎস বা প্রস্রবণ কহে।

বর্ষার জলই নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া যে উৎসসমূহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে গ্রীষ্ম বা অনা[illegible]র সময় অনেকানেক প্রস্রবণের জল কমিয়া যায়, অথবা একবারে শুকাইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে আমাদের কূপসমূহের জল কমিয়া যায়. ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ষাকালে উৎস কূপ প্রভৃতি পুনর্ব্বার জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে বর্ষার জল ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদের পুষ্টিসাধন করে, নতুবা [illegible]কালে উহারা কেন বিশীর্ণ ও বর্ষাকালে পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ হইবে? যে [illegible]ল উৎস ভূগর্ভের অতি গভীর অংশে অবস্থিত অনাবৃষ্টি প্রভৃতির সময় তৎ-[illegible]য়ের জল কমিয়া যায় না, তাহার কারণ এই যে এইরূপ উৎসসকল কেবল [illegible]দের অব্যবহিত উপরিস্থ ভূপৃষ্ঠের জলের দ্বারাই পরিপুষ্ট হয় না, ভূপৃষ্ঠের

দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়া অন্তঃসলিলা নদীর এক স্থান হইতে দূর দূরান্তরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই সকল অন্তঃস নদীর জল হইতেই অতি গভীর উৎসসমূহের পুষ্টিসাধন হয়।

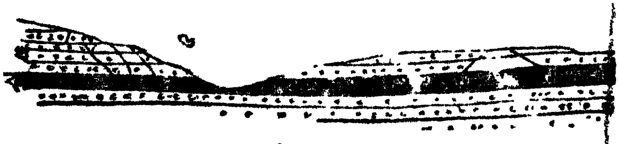
ভূপৃষ্ঠের অন্তর্গত প্রস্তরসকল যতই কঠিন হউক না ে উহাদের সর্ব্বাংশেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, এই স ছিদ্র দিয়া বৃষ্টির জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকে; এত নদী হ্রদ সাগর পুষ্করিণী প্রভৃতি যাবতীয় জলাশয়ের তলে অনেক ফাটল আছে, জলাশয়সমূহের জল ঐ সকল ফ দিয়া অথবা তত্রত্য অসংখ্য ছিদ্র দিয়া প্রস্রুত হইয়া ভূ প্রবেশ করে। অত্যুন্নত পর্ব্বতের সর্ব্বাবয়বেও বহুসংখ্যক ফ থাকাতে বৃষ্টি ও বরফের জল পর্ব্বতের নিম্নে প্রবিষ্ট হয়। উপ জল উল্লিখিতপ্রকারে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বালুক অন্যান্য নানাবিধ পার্থিব পদার্থ ও উহার সহিত ভূগর্ভের ব নিম্নে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। পৃথিবীর অনেক স্থানে কূপ করিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে কূপে প্রথম জল ব হইবামাত্র ঐ জলের সহিত বৃক্ষপত্র প্রভৃতি উদ্গত হইতে ফ্রান্স দেশে ৪০০ ফুট নিম্ন কূপ খনন করিলেও এইরূপ বা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ অপেক্ষ সতেজ রহিয়াছে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ঐ সকল পদার্থ ভূগর্ভস্থ জলস্রোতের সহিত প্রায় ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আইসে। কখন কখন কূপ করিবার সময় উহার অভ্যন্তরে বহুদূর নিম্ন হইতেও মৎস্য বহির্গত হইতে দেখা যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতী হইতেছে যে ভূপৃষ্ঠের নীচে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইয়া স্রোতে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বৃষ্টির জল এই প্রকারে নিরন্তর ভূগর্ভের অভ্যন্তরে

করিতেছে বলিয়া উপরিস্থ মৃত্তিকার নীচে অনেকদূর পর্য্যন্ত অবস্থিত স্তরসমূহ আর্দ্র হইয়া থাকে, এবং উহাদের অন্তর্গত ছিদ্র দিয়া জল চুয়াইয়া আরও নীচে পতিত হয়। পাথরিয়া কয়লা প্রভৃতির খনি খনন করিবার সময় কখন কখন এত জল চতুর্দ্দিক হইতে চুয়াইতে থাকে যে খনি ডুবিয়া যায়। এই জন্য খনি খনন করিবার সময় ঐ জল ষ্টীম এন্‌জিন দ্বারা উত্তোলিত করিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে হয়। রাণীগঞ্জের অনেক কয়লার খনির উপরে লোকের বাস পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে। খনির নীচে নামিলে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরিস্থ পুষ্করিণী প্রভৃতির জল প্রস্রুত হইয়া নিরন্তর খনির মধ্যে পতিত হইতেছে। তিনপাহাড় প্রভৃতি যে সকল স্থানে পাহাড় কাটিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে তথায়ও উপরিভাগ হইতে জল পতিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সচরাচর ব্যবহারার্থ যে সকল কূপ খনন করি সেগুলি এক প্রকার উৎস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কূপের চতুর্দ্দিকস্থ স্তর হইতে জল প্রস্রুত হইয়া কূপে পতিত হইয়া একত্র জমিতে থাকে। পাহাড়ের উপরিভাগে অথবা মরুভূমি বা নির্বর্ষ প্রদেশে, যেখানে ভূমির নিম্নে জল পাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ স্থানেও কূপ খনন করিলে ঐ সকল কূপে জল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অনেক পাহাড়ের উপর কূপ আছে। আফ্রিকার মরুভূমির নিকটেও কূপ খনন করিলে জল পাওয়া যায়। মরুভূমির উপরিস্থ ওয়েসিসসমূহে বৃষ্টির সম্পর্ক নাই। কিন্তু তত্রত্য কূপসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট জল নির্গত হইয়া থাকে। মহানদীর উপত্যকায় গ্রীষ্মকালে কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না, কিন্তু তথাপি তথায় ২০।৩০ ফুট মৃত্তিকা খনন করিলেই জল পাওয়া গিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই

প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃষ্টির জল কিয়ৎপরিমাণে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। কোথাও কোথাও উহা অন্তঃসলিলস্রোতোদ্বারা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এবং উহার ভূপৃষ্ঠস্থ গহ্বরাদি হইতে উৎসস্বরূপে ঊর্দ্ধে উদ্গত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে উৎস দুই প্রকার। অগভীর উৎস ও গভীর উৎস। (১) ভূপৃষ্ঠের অনতিবহুদূর নিম্নে যে জল পাওয়া যায়, তাহাকেই অগভীর উৎস কহে। বৃষ্টির জল সর্ব্বত্রই ভূপৃষ্ঠস্থ ছিদ্রসমূহদ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। নিম্নে প্রবেশ করিবার সময় বালুকা প্রভৃতির মধ্য দিয়া জল অনায়াসেই নিম্নতর প্রদেশে চলিয়া যায়। এই জন্য ফল্গু নদীর বালুকা উত্তোলন করিলেই জল বাহির হইয়া থাকে; কিন্তু বালুকা প্রভৃতি স্তর ভেদ করিয়া যাইবার সময় যদি জলের গতিপথে কোন একটী গহ্বর থাকে, তাহা হইলে ঐ জল চতুর্দ্দিক হইতে তথায় জমিয়া যায়। নিম্নগামী জলের গতিপথে কর্দ্দমাদি স্তর থাকিলেও উহা ভেদ পূর্ব্বক জল অধিক দূর নিম্নে নামিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তথায় জমিতে থাকে এবং কোন স্থানে পথ পাইলেই ঐ পথ দিয়া পুনর্ব্বার উথলিয়া উপরে উত্থিত হয়। ইহাকেই অগভীর উৎস কহে। সামান্য কূপ এই জাতীয় উৎসের প্রকারান্তর। এই জন্যই বর্ষাকালে কূপ নদী প্রভৃতির জল বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ও গ্রীষ্মকালে কমিয়া যায়। উৎস যে প্রকারের হউক না কেন, ভূপৃষ্ঠ হইতে জল নিম্নে নামিবার সময় মাধ্যাকর্ষণশক্তির বশীভূত হইয়াই নামিয়া



থাকে। উপরের চিত্র দেখিলে এই প্রকার উৎসের উদ্ভবপ্রণালী স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই প্রকার প্রস্রবণ হইতে জল উত্থিত হইবার সময় কোন সময় পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্ষান্ত হয়, কারণ তরলপদার্থের একটী সাধারণ ধর্ম্ম এই যে উহা সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকে। এই জন্য পরস্পর সন্নিহিত জলরাশি যতক্ষণ সমোচ্চ না হয়, ততক্ষণ উহার গতি হইয়া থাকে। সুতরাং ভূগর্ভের জল ও

নিয়মের অধীনে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে উত্থিত হইয়া উহার সমোচ্চতা রক্ষা করিবার জন্য বেগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। কিন্তু গভীর উৎস গুলি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। এইরূপ উৎস হইতে যে জল বেগে উত্থিত হইয়া থাকে, উহাও বৃষ্টির জল বটে. কিন্তু উহা, ঐ সকল উৎসের অব্যবহিত উপরিস্থ ভূপৃষ্ঠের জল নহে। কারণ অনেক সময় এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে গভীর উৎসসমূহের অব্যবহিত উপরিস্থ প্রস্তর এত কঠিন যে উহার মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না। ফলতঃ যেখানে এইরূপ উৎস সংঘটিত হয়, তথা হইতে অনেক দূরের জল ভূগর্ভস্থ অন্তঃসলিল প্রবাহ বহিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে জল নিম্নে নামিয়া উল্লিখিত প্রকার প্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া বহুদূরে নীত হয়। এবং ভূপৃষ্ঠের নিম্নে জমিতে থাকে। একচ্ছিন্ন পর্ব্বতশিখরে যত বৃষ্টি পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে। যে সকল পর্ব্বতের পরমাণু বিরলসন্নিবিষ্ট, তাহার মধ্য দিয়া জল শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়। সৈকত প্রস্তরের মধ্য দিয়াও উহা অবাধে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু চূর্ণ প্রস্তর অতি কঠিন বলিয়া তন্মধ্যে জল শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু পর্ব্বতের সকল স্থানেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছিদ্র আছে। ঐ সকল ছিদ্র ও রন্ধ্র দ্বারা উপরিস্থ জল শীঘ্রই পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে অনেক নীচে যাইবার পর যদি নিম্নতর স্থানে প্রবেশ করিবার পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমুদয় জল সেই স্থানে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। এবং নিম্নে প্রবেশ করিবার পথ না পাইয়া ঊর্দ্ধদিকে নির্গমের পথ অন্বেষণ করে এবং কোন স্থানে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ছিদ্র দিয়া বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। প্রথম পথ দিয়া অনবরত প্রবহমান জলের প্রবল চাপেই এই জল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই প্রকারে গভীর উৎসের উদ্ভব হইয়া থাকে।

কোন কোন উৎস হইতে নিরন্তর কেবল জল বাহির হয়। কোন কোনটী কোন কোন ঋতুতে প্রবল থাকে। ফ্রান্স দেশের লাসুইডক প্রভৃতি কতকগুলি প্রস্রবণ হইতে কেবল জোয়ারের সময়েই জল উঠিয়া থাকে। কোন কোন উৎসের জলের প্রতি ঘণ্টায় হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন প্রস্রবণ হইতে জলের

পরিবর্ত্তে আলকাতরা ও মেটে তৈল নির্গত হইয়া থাকে। কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিহিত বাকু প্রভৃতি কতকগুলি উৎস এই প্রকার। যে সকল উৎস এত গভীর যে উহার জল ভূগর্ভের অতি উষ্ণ প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপবশতঃ সেই সকল উৎস হইতে অত্যুষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ জল নির্গত হইয়া থাকে। ফ্রান্স দেশের মধ্যে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণের জলে তাপমানযন্ত্র ডুবাইলে উহার পারদ ১৭৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। আইসলণ্ড দ্বীপে এই প্রকার উৎস অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী ঘোরতর শব্দ করিয়া প্রায় ২০০ ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উষ্ণ জল উৎক্ষেপ করে। আমাদের দেশে মুঙ্গের ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডনামক উষ্ণপ্রস্রবণ ঐ প্রকার আভ্যন্তরিক অগ্নিসম্ভূত। চট্টগ্রামের কোথাও কোথাও জলের সহিত অগ্নিশিখাও নির্গত হইতে দেখা যায়।

উৎসসমূহ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ কত জল উৎক্ষিপ্ত হয় তাহার নির্ণয় করা যায় না। আয়লণ্ডের অন্তর্গত হোলিওয়েল নামক প্রস্রবণ হইতে প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০০ মণ জল নির্গত হইয়া থাকে। বোহিমিয়ার অন্তর্গত একটী প্রস্রবণ হইতে প্রত্যহ প্রায় ১২০০০ মণ জল বহির্গত হইয়া থাকে। অনেক প্রস্রবণ হইতে এত অধিক জল উৎক্ষিপ্ত হয় যে ইহাদের সমবায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাগরবাহিনী নদীর উদ্ভব হয়। গঙ্গার উৎপত্তি স্থা- গঙ্গোত্রী একটী প্রস্রবণ মাত্র।

উৎসসমূহের জল আপাততঃ অদূষিত ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশুদ্ধ জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুইটী পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন। কিন্তু প্রস্রবণের জল কিয়ৎপরিমাণে কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে ক্ষণকাল পরে দেখা যায় যে ঐ পাত্রের তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই বুদ্বুদ গুলি আর কিছুই নহে, কেবল বায়ু ও

অন্যান্য বাষ্প জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ রূপ আকার ধারণ করে। ক্ষণকাল এইরূপ থাকিলে ঐ বায়ু ও বাষ্প ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং স্বচ্ছ জলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু উহার স্বাদের অনেক ব্যত্যয় হয়। আবার ঐ স্বচ্ছ জল অগ্নিতে জ্বাল দিলে উহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবার পর দৃষ্ট হইবে যে পাত্রের তলায় নানাবিধ পদার্থের অতি সূক্ষ্ম অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে। এমন অনেক পদার্থ আছে যাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে জলের স্বচ্ছতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। জলে লবণ মিশাইলে আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই। সমুদ্রের জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কিন্তু উহাতে প্রভূত পরিমাণে লবণ মিশ্রিত রহিয়াছে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উৎসের জলে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বণিক অম্ল, গন্ধকমিশ্র হাইড্রোজেন, গন্ধকমিশ্র চূর্ণ, কারবণ-মিশ্র চূর্ণ, ক্ষার অর্থাৎ সোডা, ম্যাগ্‌নেসিয়া, লবণ, লৌহ প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত আছে। কোন কোন উৎসের জলে উল্লিখিত ধাতব পদার্থসকল এত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, যে ঐ জলের কিয়দংশ লইয়া কোন স্থানে রাখিবামাত্র উক্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উৎসের জলে চূণ অধিকপরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে জলপাত্রের তলায় চূণ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক লৌহমিশ্রিত উৎসজল কোন স্থানে রাখিলে তথায় হরিদ্রাবর্ণ দাগ লক্ষিত হয়। যাবতীয় উৎসের জলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে উল্লিখিত ধাতব পদার্থসমূহ মিশ্রিত আছে। কিন্তু যাহাদের জলে উক্ত দ্রব্যাদি স্পষ্ট লক্ষিত হয়, সেই সকল উৎসকে ধাতব উৎস কহে। ধাতব উৎসসমূহের মধ্যে অধিকাংশই চূণ, লৌহ ও লবণে পরিপূর্ণ। ইংলণ্ড জর্ম্মণি ফ্রান্স

প্রভৃতি দেশে কতকগুলি উৎস এরূপ আছে যে উহার
চূণ লৌহ ম্যাগ্‌নেসিয়া প্রভৃতি নানাবিধ ধাতব পদার্থ এ
সমবেত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণবশতঃ উক্ত
ব্যবহার করিলে অনেক প্রকার পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে উৎসসমূহের স্বচ্ছ জলে উ
থিত দ্রব্যাদি কি প্রকারে মিশ্রিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর প্রা
করা কঠিন নহে। সকলেই অবগত আছেন যে বৃষ্টির
অন্যান্য সকল প্রকার জল অপেক্ষা পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল।
এই বৃষ্টির জলও আকাশপথ ভেদপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হই
সময় আকাশস্থ বায়ু ও উহার সহিত মিশ্রিত ধূলি ও ক
প্রকার বাষ্প সংগ্রহ করিয়া থাকে। বৃষ্টি জলের সহিত যে স
পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত দূষিত করে, তন্
আঙ্গারিকাম্ল প্রধান। যখন বৃষ্টির জল আকাশমার্গে প
হইবার সময় কয়েক প্রকার পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত হ
যায়, তখন ভূপৃষ্ঠভেদপূর্ব্বক যে জল নানাবিধ স্তরের মধ্য
ভূগর্ভে প্রবেশ করে, তাহা যে নানাবিধ পার্থিব পদার্থের স
মিশ্রণে দূষিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ফলতঃ প্রথ
বৃষ্টির জলের সহিত কিয়ৎপরিমাণে আঙ্গারিকাম্ল মিশ্রিত
পরে উহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ নানাস্থানে যে আঙ্গ
কাম্ল থাকে তাহাও ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হয়। পরে ভূ
রন্ধ্রসমূহ দ্বারা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার সময় আরও অধিকপরি
আঙ্গারিকাম্ল উক্ত জলের সহিত মিশিতে থাকে। আঙ্গারিকা
একটী অসাধারণ ক্ষমতা এই যে উহার সহিত সংশ্রবে চূর্ণ
নানাবিধ ধাতব পদার্থ গলিত হইয়া যায়। এই জন্য আ
দেখিতে পাই যে পাকা ইমারতের কোন খিলান বা পথিম

সেতুর মধ্য দিয়া বৃষ্টির জল পতিত হইলে উহার সহিত ইমারতের চূণ কিয়ৎপরিমাণে গলিত হইয়া একত্র জমাট বাঁধিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে জল নানাবিধ স্তরের মধ্য দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার সময় উহার সহিত মিশ্রিত কার্ব্বণিক অ্যাসিডের প্রভাবে নানাবিধ ধাতব ও অন্যান্য পদার্থকে গলিত করিয়া নিজের সহিত মিশ্রিত করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন উষ্ণ প্রস্রবণের জলের উষ্ণতাবশতঃ অনেকানেক পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং ভূগর্ভের বহুদূর নিম্নে অবস্থিত গলিত ধাতব পদার্থসমূহও কিয়ৎপরিমাণে তত্রত্য জলের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে মিলিত হইয়া যায়।

উৎস জলের কার্য্য। উৎস হইতেই চূর্ণ লৌহ সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ উত্থিত হইয়া নদী ও সাগরের জলে মিশ্রিত হয়, এবং শঙ্খ শম্বুকাদি জীবের দেহনির্ম্মাণের উপযোগী হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নদী।

বৃষ্টিজলের কিয়দংশ সূর্য্যের উত্তাপ ও আকর্ষণবশতঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘরূপ ধারণ করে, কিয়দংশ ভূপৃষ্ঠকে উন্মুক্ত করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক উৎসের আকারে পুনরুত্থিত হয়, কিয়দংশ ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক গহ্বরে সঞ্চিত হইয়া হ্রদের আকার ধারণ করে, কিয়দংশ উদ্ভিজ্জ ও জীবদেহে প্রবেশ করিয়া উহাদের পুষ্টিসাধন করে। অবশিষ্ট অংশ ভূপৃষ্ঠের ক্রমনিম্ন স্থান দিয়া স্রোতের আকারে অবিরত নিম্নমুখে গড়াইতে গড়াইতে অবশেষে সাগরে

উপনীত হয়। এই স্বাভাবিক জলস্রোতের নাম নদী বা স্রোতস্বতী। ভূপৃষ্ঠস্থ স্থলভাগ সাগরসমতল অপেক্ষা উচ্চ। উহা একস্থানে অত্যুন্নত এবং উহার পার্শ্ব হইতে নানাদিকে ক্রমনিম্ন অর্থাৎ ঢালু হইয়া সাগরের দিকে ধাবমান হইতেছে। স্থলভাগের আকার ক্রমনিম্ন বলিয়া উহার উপর বৃষ্টির জল পড়িলে উহা মাধ্যাকর্ষণবশতঃ ক্রমশই নিম্নাভিমুখে ধাবমান হইবে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বৃষ্টির জল গড়াইতে গড়াইতে অবশেষে সাগরে উপনীত হইয়া থাকে। যদি ভূপৃষ্ঠ ঢালু ছাদের ন্যায় সমানরূপে ক্রমনিম্ন হইত, তাহা হইলে বৃষ্টির জল উহার উপর পতিত হইবামাত্র সর্ব্বত্র সমানরূপে বিস্তৃত হইয়া চাদরের আকারে গড়াইয়া যাইত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠ কুত্রাপি সমানরূপে ক্রমনিম্ন নহে, উহার সর্ব্বত্রই বন্ধুর অর্থাৎ উচ্চাবচ। যে স্থান আপাততঃ সম্পূর্ণরূপে সমভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাতেও অসংখ্য উন্নতি ও অবনতি বিদ্যমান আছে। বৃষ্টির সময় ভূমিপতিত জলের গতিপথ পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যে বৃষ্টির জল সর্ব্বপ্রথম ভূমির উপর পতিত হইয়া উহার উপরিভাগকে প্রোক্ষিত করে, পরে জলবিন্দুসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া জলধারারূপে পরিণত হয়, এবং ভূমির উপর দিয়া গড়াইতে থাকে। ক্রমনিম্ন স্থানের ঊর্দ্ধদেশে ঐ সকল জলধারা অতি ক্ষীণ আকারে বহিতে থাকে, কিন্তু ক্রমে যত নিম্নে আসিতে থাকে, ততই ঐ সকল ধারা অন্যান্য তাদৃশ ক্ষীণ ধারার সহিত মিলিত হইয়া পরিপুষ্ট হয়। এই প্রকারে জলধারাসমূহ একত্র হইয়া স্রোত উৎপাদন করে। এই স্রোতকে আমরা সোঁতা বলিয়া থাকি। ঐ ক্ষুদ্র স্রোত সকল ক্রমশঃ অধিকতর পরিপুষ্ট

হইয়া ও পথে ও অপরাপর স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া কোন নিম্ন স্থানে পতিত হয়। বৃষ্টির সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারাসকল যেরূপ আকারে প্রবাহিত হইতে থাকে, প্রবল নদীসমূহ ও অবিকল সেইরূপে প্রবাহিত হইয়া সাগরগামিনী হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত পরস্পর মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সমবায়ে একটী বেগবতী নদীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। উদাহরণ দিবার জন্য বৃষ্টিজলের উল্লেখ করা গেল, কিন্তু অধিকাংশ নদী পর্ব্বতের গলিত বরফ বা উৎসের জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বৃষ্টির জলে উহাদের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। নদীর জল যে প্রণালী বা গহ্বর দিয়া নিম্নমুখে প্রবাহিত হয়, তাহাকে নদীর গর্ভ কহে।

একখানি মানচিত্র লইয়া কোন নদীর উৎপত্তি অবধি সাগর-সঙ্গম বা মুখ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন নদীগুলি একটী সমগ্র বৃক্ষ বা লতার আকারে নির্ম্মিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমতঃ ইহার আদি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান হইতে কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত বহুসংখ্যক উপনদী নানাস্থানে উহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে, এই সকল উপনদীসমূহের সহিত আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর উপনদীসমূহ আসিয়া মিলিত হয়, উহাদের মধ্যে অনেকগুলির আবার উপনদী থাকিতে পারে। প্রধান নদীকে বৃক্ষ বা লতাস্বরূপ কল্পনা করিলে এই আদিভাগটীকে উহার মূলসন্ততি অর্থাৎ শিফাসমূহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নানাস্থান ও নানাদিক হইতে পরস্পর ও প্রধান নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া যত নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতে থাকে, ততই প্রধান নদীটী ক্রমশঃ একটী সুপ্রশস্ত নদীরূপ

ধারণ করে, এবং এইরূপে লোকালয়সমাকীর্ণ সমভূমির মধ্য দিয়া বহুদূর প্রবাহিত হইতে থাকে। এই অংশকে ইহার মধ্যভাগ বা শুঁড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ ইহা এইরূপে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবার পর সাগরের অদূরে বহুসংখ্যক শাখা বিস্তার করিতে থাকে, অর্থাৎ ইহার নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক মুখ নির্গত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রশস্ত নদীর আকারধারণপূর্ব্বক সাগরের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। এবং অবশেষে একে একে সকলগুলিই স্বতন্ত্রভাবে অথবা কোনটী অপরটীর সহিত মিলিত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়। এই ভাগটীকে প্রধান নদীর অন্ত অর্থাৎ শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনে মনে অথবা মানচিত্র লইয়া গঙ্গা মহানদী বা অন্য যে কোন নদীর আদ্যন্ত পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রায় সকল নদীই কোন না কোন পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শিখরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইতেছে, এবং উহার সহিত বরফ ভাসিয়া আসিতেছে, এইরূপ কয়েকটী স্রোত দূরে বা নিকটে পরস্পর মিলিত হইয়া অবশেষে একটী প্রবল স্রোতস্বতীর উদ্ভব হইতেছে। কোথাও বা পর্ব্বতের উপরিস্থ চলিষ্ণু হিমসংঘাত গলিত হইয়া একবারে প্রবল স্রোতের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ স্থলে নদীগুলি প্রায়ই প্রবলবেগে পর্ব্বতের লম্বভাবে অবস্থিত পার্শ্ব বহিয়া নিম্নে অবতীর্ণ হইতেছে, এবং উহার সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্রোত মিলিত হইয়া উহার পুষ্টিসাধন করিতেছে, কোথাও বা একটীমাত্র প্রবল উৎস হইতেই একটী নদীর উৎপত্তি হইতেছে। উৎপত্তিস্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সকল নদীরই স্রোত অতিশয় প্রবল হইয়া

থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অত্যুচ্চ স্থান হইতে নিম্নে জলসমূহ বেগে পতিত হওয়াতে জলপ্রপাত সংঘটিত হয়। উৎপত্তিস্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া নদীসমূহ যতই পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যস্থ ক্রমনিম্ন ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, ততই উহার বেগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমিতে থাকে এবং উহার পরিসর অর্থাৎ আয়তনবৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমেই উহা পার্ব্বত্য বন্ধুর প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে সম্মুখে পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি পড়িলে উহার অন্তর্বর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার নিঃসৃত হয়, এবং পথের বক্রভাববশতঃ বক্রগতি অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। এই অংশেও নানাদিক হইতে অন্যান্য বৃহৎ উপনদী অগ্রসর হইয়া প্রধান নদীর সহিত মিলিত হইতে থাকে, ক্রমশঃ প্রধান নদীটী যতই অগ্রসর হয়; ততই উহার উপনদীর সংখ্যা কমিতে থাকে, কিন্তু উহাদের আকারবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতের পরিবর্ত্তে বড় বড় নদী আসিয়া উহার সহিত মিলিত হইতে থাকে। অবশেষে এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে উহা আর উপনদী প্রাপ্ত হয় না। ফলতঃ এই মধ্য অংশটীতেই অন্যান্য নদী আসিয়া পতিত হইয়া উহার আকারবৃদ্ধি ও জলের পরিপুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। ক্রমে প্রধান নদীটী আরও অগ্রসর হইয়া উহার অববাহিকাপরিত্যাগপূর্ব্বক, ক্রমনিম্ন ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিম্নভূমিতে আসিয়া উপনীত হয়, এবং ক্রমশঃ এইরূপে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সাগরাদির সহিত সঙ্গত হয়। ইহার এই তৃতীয় ও শেষ অংশটাকে মাত্রাশূন্য "ব" এর ন্যায় আকার বলিয়া বদ্বীপ কহে।

এই অংশের বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহাতে একটীও উপনদী

আসিয়া প্রধান নদীর কলেবর বৃদ্ধি করে না, পক্ষান্তরে প্রধান নদী হইতেই বহুসংখ্যক শাখানদী নির্গত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অথবা পুনর্ব্বার পরস্পর মিলিত হইয়া সাগরের সহিত সঙ্গত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে জলের অনবরত আয় হইতে দেখা যায়, কিন্তু কিছুমাত্র ব্যয় হয় না, কিন্তু এই তৃতীয় অংশে উপস্থিত হইবার পর নানাদিকে শাখানদী নির্গত হওয়াতে অনবরত জলের ব্যয় হইতে থাকে। ফলতঃ এই অংশে প্রধান নদীটী শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, শাখানদীগুলি প্রায়ই প্রধান নদীর ন্যায় প্রবল ও বৃহদাকার হইয়া থাকে, এমন কি অনেক সময় কোন্‌টী প্রধান নদী কোন্‌টী শাখা এরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। আবার এই স্থানে ক্রমশঃ স্রোত কমিয়া যাওয়াতে উপরিভাগ হইতে চূর্ণ বালুকা কর্দ্দম প্রভৃতি যে সকল পার্থিব পদার্থ স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছিল, তৎসমুদয় প্রায়ই নদীর মুখে জমিয়া যায়, এবং প্রধান নদীর মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে উহা একটী নূতন মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। উপরে নদীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিষয় যাহা বর্ণিত হইল গঙ্গা মহানদী মিসিসিপি, আমেজন, নীল, ডানিয়ুব প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন অংশের যে কোন নদীর উৎপত্তির স্থান হইতে সাগরসঙ্গমপর্য্যন্ত অনুসরণ করিলে অবিকল উক্ত ব্যাপার লক্ষিত হইবে।

মানচিত্র দেখিলে নদীসমূহের আর একটী লক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে নদীসমূহ যে স্থলে স্থানেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ অববাহিকা দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে সেই উহা কথঞ্চিৎ ঋজুভাবে প্রবাহিত হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল স্থানেই উহা সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে অগ্রসর হইয়া থাকে, এরূপ

হইবার কারণ কি? বৃষ্টির সময় ভূমিপতিত জলধারাসমূহের গতিপথ পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। বৃষ্টির সময় আমরা দেখিতে পাই যে জলধারাসকল প্রায়ই বক্রগতি অবলম্বন করিতেছে, পথিমধ্যে গাড়ির চাকার পেষণে বা অন্য কোন কারণে যদি কোথাও খাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানেই বৃষ্টির জল কিয়দ্দূর ঋজুপথে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য সকল স্থানেই উহা বক্রগতি অবলম্বন করে। একটী ক্ষুদ্র ঢিল সম্মুখে পড়িলেও জলধারা উহার পার্শ্ব দিয়া বক্রভাবে চলিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে জল মাধ্যাকর্ষণবশতঃ সর্ব্বদাই নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, জলের উপর মাধ্যাকর্ষণের এরূপ প্রভাব যে উহার পথে কোনরূপ বাধা পড়িলে তাহা অতিক্রম না করিয়া জলধারাসকল সন্নিহিত বক্রপথ অবলম্বন করিয়াই অধোগামী হয়। যে কারণে বৃষ্টির জলের বক্রগতি হয়, অবিকল সেই কারণেই নদীস্রোতেরও বক্রগতি হইয়া থাকে। চরাচর আমরা যে ভূমিকে সমতল বলিয়া মনে করিয়া থাকি, তাহা সম্পূর্ণরূপে সমতল নহে। বৃষ্টির সময় আমরা ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বা অপর কোন দৃঢ় পদার্থ যাহাই হউক না কেন, নিকটস্থ ভূমি অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ হইলেই উহারা বৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারার গতিরোধ করিয়া থাকে। গতিরুদ্ধ হইলেই নিকটবর্ত্তী নিম্নস্থলের অভিমুখে জলপ্রবাহ ধাবমান হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে গতিপ্রতিরোধই জলপ্রবাহের বক্রতার কারণ। যে কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিজলের প্রবাহ বক্রগতিতে নিম্নাভিমুখে ধাবমান হয়, অবিকল সেই কারণেই নদীসমূহ ও বক্রগতিধারণ করিয়া থাকে। কোন দেশের মধ্য দিয়া নদী প্রবহণকালে যে

যে স্থলে ভূমির দৃঢ়তা পর্ব্বত বা অন্য কোন কারণে নদীপ্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয়, সেই স্থলেই নদীগণ ঋজুপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখভেদ্য সন্নিহিত স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠ নানা-কারণে বন্ধুর হইয়াছে। আমরা উহার কোন স্থানে উচ্চ শৈল-মালা, কোন স্থানে গভীর উপত্যকা, কোন স্থানে বিশালবক্র-ভূমি, আবার কোথাও বা হ্রদ প্রভৃতি দেখিতে পাই। এতদ্ভিন্ন যে স্থলকে আমরা আপাততঃ সমতল বলিয়া মনে করি, উহা ও বাস্তবিক সমতল নহে, পরন্তু ক্রমনিম্ন, কিন্তু এই ক্রমনিম্নতা এত অল্প যে দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীর গতি হইতেই দেশের ক্রম-নিম্নতার বিষয় আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশ নিম্নতর এবং হিমালয়প্রদেশ উচ্চতর এই জন্য গঙ্গাপ্রভৃতি কয়েকটী নদী হিমালয়প্রদেশ হইতে বঙ্গ দেশাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢিল বৃষ্টির জলের পক্ষে যেরূপ, দেশের বন্ধুরতা নদীর পক্ষে তদ্রূপ। জলের বেগ সকল প্রতিবন্ধককে অতিক্রম বা স্থানান্তর করিতে পারে না, উহা তৎসমুদয়ের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। এবং এই জন্যই নদীসমূহের বক্রগতি হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সকল নদীরই গতিপথ বক্র। মিসিসিপি ও সীন নদীর গতিপথ এত বক্র যে উহাদের উপর দিয়া নৌকারোহণে যাইতে হইলে নদীর বক্রতাবশতঃ বারম্বার একই স্থানের নিকট আসিতে হয়।

নদীর অববাহিকা। মানচিত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, যে স্থান দিয়া কোন নদী প্রবাহিত হয় তাহার পরিতো বর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত প্রদেশের অতিরিক্ত জল সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা বহুসংখ্যক উপনদীদ্বারা উক্ত প্রধান নদীতে আসিয়া পতিত হয়,

এবং উহাদ্বারা সাগরাভিমুখে নীত হইয়া থাকে। ফলতঃ নদীগুলি বৃহৎ বৃহৎ প্রদেশের জল নিকাশের প্রণালী স্বরূপ। যে প্রদেশের সমস্ত জলাতিরেক কোন একটী নদী দ্বারা প্রবাহিত হয়, সেই সমগ্র প্রদেশকে উক্ত নদীর অববাহিকা কহে। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশের সমুদয় অতিরিক্ত জল কেবল একমাত্র মিসিসিপি নদীদ্বারাই নিকাশ হইয়া থাকে। মিসিসিপির অববাহিকার পরিমাণফল প্রায় ১,২৪৪০০০ বর্গ মাইল হইবে। আমেজন নদীর অববাহিকার পরিমাণফল প্রায় ২০০০০০০ বর্গ মাইল। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৪০০০ মাইল। আমেজন নদীর মুখ প্রায় ১৮০ মাইল বিস্তৃত, এবং ইহার মুখ দিয়া ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত জোয়ারের জল প্রবিষ্ট হয়। মিসিসিপি নদী মিসোরী সমেত প্রায় ৪৩৮২ মাইল। এই নদীই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। গঙ্গা দীর্ঘে ১৫০০ মাইল। ইহার অনেক গুলি বৃহৎ উপনদী আছে। ইহার অববাহিকা প্রায় ৪৩২,৪৮০ বর্গ মাইল হইবে। রাইন নদীর অববাহিকা ৭৫০০০ বর্গ মাইল, টেম্‌সের অববাহিকা প্রায় ২০৯০ মাইল হইবে।

মানচিত্র লইয়া নদীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা আর একটী বিষয় দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই যে কতকগুলি গিরিনদী পর্ব্বত বা অধিত্যকাদি উচ্চ ভূমির এক পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আর কতক গুলি উহার অপর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যেরূপ প্রথম পার্শ্বের গিরিনদীগুলি মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ নদী উৎপন্ন করে, সেইরূপে দ্বিতীয় পার্শ্বের গিরি নদীগুলির সংযোগেও একটী প্রধান নদী উৎপন্ন হইয়া অপরদিক দিয়া প্রবাহিত হয়। নেপাল ও তৎসন্নিহিত উচ্চভূমি হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া গঙ্গা সরয়ু

কৌশী প্রভৃতি কয়েকটী নদী উৎপন্ন করিতেছে, আবার কতক-গুলি উত্তরবাহিনী হইয়া ব্রহ্মপুত্রের পুষ্টিসাধন করিতেছে, আবার আরও উত্তরে ওবি, ইনিসি প্রভৃতি উত্তরবাহিনী হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে। যে প্রদেশের যে স্থলে পতিত বৃষ্টি জলের এক ভাগ একদিক দিয়া প্রবাহিত হয়, ও উহার অপর ভাগ উহার ঠিক বিপরীত দিকে ধাবমান হয়, তত্রত্য সেই বিভাগ স্থানটীকে জলাঙ্কিত স্থান বলা যাইতে পারে। এই জলাঙ্কিত স্থান কোন দেশ বা মহাদেশের নদীসমূহের গতি-পথকে পরস্পর পৃথক করে। এই রেখাটী সর্ব্বদাই যে পর্ব্বত-শ্রেণীর উপর অবস্থিত হয় এরূপ নহে, কোন কোন দেশে এই রেখাটী পর্ব্বতশ্রেণী ও সমতল ভূমি উভয়েরই উপর অবস্থিত। ইউরোপের জলাঙ্কিত রেখাটী আল্প পিরিণিস প্রভৃতি পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া রুসিয়ার সমভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। জলাঙ্কিত রেখার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা কখনই দেশ বা মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত হয় না, প্রায়ই দেশের এক পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং জলাঙ্কিত রেখার এক পার্শ্বে নদীগুলি অতিশয় দীর্ঘ ও অপর পার্শ্বের গুলি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার জলাঙ্কিত রেখাটী উহার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব্বে আমেজন প্রভৃতি অতি দীর্ঘ নদী প্রবাহিত হইতেছে ও পশ্চিমের নদীগুলি ৭০।৮০ মাইলের অধিক হইবে না।

নদীর উৎপত্তি স্থান। কোন নদীর অববাহিকাতে যত বৃষ্টির জল পতিত হয়, অথবা উৎস হইতে উত্থিত হয়, তৎসমুদয়কে উক্ত নদীর উৎপত্তির প্রতি কারণ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মহানদী, কৃষ্ণা,

গোদাবরী;,কাবেরী প্রভৃতি যতগুলি প্রধান নদী প্রবাহিত আছে, তৎসমুদয়ই বর্ষার জলদ্বারা সংঘটিত। এই জন্য গ্রীষ্মকালে দাক্ষিণাত্যের নদীগুলি অতিশয় বিশীর্ণ হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে ঐ সকল নদীর যাহা কিছু জল ও অবশিষ্ট থাকে, উহা নদীসমূহের গর্ভস্থ অথবা অন্যান্য স্থানে অবস্থিত উৎসসমূহ হইতে উত্থিত হয়। কিন্তু বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রবলবেগে বহিতে থাকে এবং কখন কখন উহাদের বন্যা হইয়া সন্নিহিত প্রদেশ ভাসিয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বৃষ্টির জলই উল্লিখিত নদীসমূহের প্রধান উপকরণ। আফ্রিকার অন্তর্গত নীল নদীও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু অধিকাংশ প্রধান নদীই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের উপরিস্থ নির্ঝর অথবা গলিত বরফরাশি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গঙ্গা মিসিসিপি রাইন সিন্ধু প্রভৃতি সমুদয় প্রধান প্রধান নদীই পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে একবারে প্রবল নদীরূপে অথবা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি নদীর সমবায়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কোন কোন নদী হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত ফিলেলোনামক হ্রদ হইতে কাম্বেলী ও কঙ্গো নদী উৎপন্ন হইয়া আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগরকে পরস্পর সংযুক্ত করিতেছে। কিন্তু বৃষ্টির জলদ্বারা বর্ষাকালে সমুদয় নদীর২ পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ইহার অবয়ব এতদূর পরিপুষ্ট হয় যে উহাতে বন্যা উপস্থিত হইয়া সন্নিহিত প্রদেশ সকল ভাসিয়া একাকার হইয়া থাকে। কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন নদীর উৎপত্তি স্থান পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, কখন বা অতিশয় সন্নিহিত হয়। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থান পরস্পর সন্নিহিত। মিসি-

সিপি নদীর উৎপত্তিস্থান ভুইনিপেগ হ্রদে পতিত করেকটী নদীর উৎপত্তিস্থানের সহিত বর্ষার সময়ে এক হইয়া যায়।

বৃষ্টিরূপে যত জল ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহার তৃতীয়াংশমাত্র নদীরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বৃষ্টি জলের সহিত নদীমাত্রেরই এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে বৃষ্টির পর নদীসমূহের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়। সকল নদীতেই প্রায় কখন না কখন অথবা নিয়মিত সময়ে জলবৃদ্ধি হইয়া প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান বা সমশীতোষ্ণ মণ্ডলে বর্ষা অধিক হইলে হঠাৎ নদীর জলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ইংলণ্ডে প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইয়া থাকে, আবার মধ্যে মধ্যে বিন্দুপাত পর্য্যন্ত হয় না, সুতরাং তত্রত্য নদীসমূহ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রবল ও বিশীর্ণ হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের উত্তাপে পর্ব্বতস্থ বরফরাশি গলিতে আরম্ভ হইলে উহার জলে অনেক নদীর বন্যা উপস্থিত হইয়া থাকে। রাইন রোন্ ও সিন্ধু প্রভৃতি নদীর এইরূপে বন্যা উপস্থিত হয়। কখন কখন স্রোতের মধ্যস্থলে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিত হওয়াতে জলের গতিরোধ হয় এবং জলসমূহ সমবেত হইয়া হ্রদ উৎপন্ন করে। পরে কোন কারণে উক্ত প্রতিবন্ধক স্থানান্তরিত হইলে আবার জল উহার উপর ছাপাইয়া উঠে ও প্রবলবেগে ঘোরতর শব্দ করিয়া নিম্নে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং প্রবল বন্যা উপস্থিত হয়। সিন্ধু নদীতে অনেক সময়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নদীর বন্যা হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ঈজিপ্ট দেশের মধ্য দিয়া নীল নদী প্রবাহিত। ঈজিপ্ট দেশে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না, কিন্তু আবিসিনিয়া দেশে মার্চ ও এপ্রেল মাসে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ বৃষ্টির জলে নীল নদীর

প্রবল বন্যা উপস্থিত হয়। গঙ্গা, মহানদী প্রভৃতির জল ভাদ্র মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া বন্যা উপস্থিত করে, এই সকল বন্যায় ভাসিয়া অনেক জীবজন্তু সর্ব্বদাই মারা পড়িয়া থাকে। বন্যার জল কমিয়া যাইবার পর ভূপৃষ্ঠে যে পলি পড়ে তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা অতিশয় বাড়িয়া উঠে ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। কোথাও কোথাও বৎসরের মধ্যে দুইবার নদীর বন্যা উপস্থিত হয়। একবার বর্ষার সময় বর্ষার জলদ্বারা নদীর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর একবার গ্রীষ্মের সময় বরফ গলিয়া জল বাড়িয়া উঠে। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতে এইরূপ ঘটনা লক্ষিত হইয়া থাকে।

নদীর গতি। নদীসকল ক্রমনিম্নভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নদীর গর্ভ স্বাভাবিক নিয়মবশতঃ ক্রমনিম্ন হইয়া থাকে, নতুবা সমভূমি হইলে জলের স্রোত উৎপন্ন হইত না। কৃত্রিম সরিৎ অর্থাৎ খাল খনন করিবার সময় এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে খালের গর্ত্তকে ক্রমনিম্ন করিতে হয়। ক্রমনিম্নতার কোণ, গর্ভের পরিসর ও জলের পরিমাণ এই কয়েকটীর তারতম্য অনুসারে নদীর বেগেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যদি অল্প পরিসর নদীগর্ভ দিয়া অধিক জল প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে উহার বেগবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্য পার্ব্বত্য উপত্যকায় প্রবাহিত হইবার সময় নদীর যেরূপ বেগ থাকে, উহা সমভূমিতে প্রবেশ করিবার পর যখন উহার গর্ভ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিসর হয়, তখন উহার বেগও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কমিয়া যায়। এবং যদি ক্রমনিম্নতার কোণ অল্প হয় অর্থাৎ যদি নদীর জল প্রায় ঋজুভাবে অবস্থিত অল্পমাত্র গড়ানিয়া ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে উহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর যদি ক্রমনিম্নতার

কোণ বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ যদি নদী ক্রমশঃ অধিক ক্রমনিম্ন ভূভাগের উপর প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে উহার বেগ অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইয়া যায়। সচরাচর সমুদয় প্রধান নদীর গর্ভ প্রতি মাইলে দুই ফুট নিম্ন হইয়া থাকে। মিসোরী নদী প্রতি মাইলে ২৮ ইঞ্চি নিম্নে নামিয়া থাকে, কিন্তু বল্গা নদী প্রতি মাইলে ৩ ইঞ্চির অধিক নিম্নে নামে না। এই জন্য বগ্লার বেগ অতি অল্প। যদি নদীর ক্রমনিম্নতা প্রতিমাইলে ১০ ইঞ্চির অধিক হয়, তাহা হইলে উক্তপ্রকার নদী অনাবা হইয়া উঠে। প্রতি ২০০ ফুটে যদি কোন নদী ১ ফুট করিয়া নিম্নগ হয়, তাহা হইলে উহার উপর নৌকা যাইতে পারে না। সচরাচর নদী সকল প্রতি ঘণ্টায় ২।৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। অত্যন্ত প্রবল বেগ হইলেও নদীর স্রোত প্রতি ঘণ্টায় ১৮ হইতে ২০ মাইলের অধিক যাইতে পারে না। নদীর বেগ উহার মধ্যস্থলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। পার্শ্বে পার্শ্বস্থ ও নিম্নস্থ ভূভাগের ঘর্ষণবশতঃ উহার বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। নদীর মধ্যস্থলে ও পার্শ্বে কাষ্ঠ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য অধিক বেগে অগ্রসর হইতেছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে জলের পরিমাণ অধিক হইলে উহার বেগও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণেই দুইটী নদী পরস্পর মিলিত হইলেও উহাদের পরিসরবৃদ্ধি হয় না, কেবল বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া থাকে। গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর মিলিত হইলে উহাদের মিলনে উৎপন্ন সরিতের বিস্তার উভয়ের বিস্তারের সমান হইবে না, কিন্তু বেগ অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

জলপ্রপাত। যদি পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে নদীর জল একবারে লম্বভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে জলপ্রপাত উৎপন্ন হই

থাকে। পৃথিবীর নানাস্থানে বহুসংখ্যক জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত নায়াগারা নদীর জলপ্রপাত সমধিক প্রসিদ্ধ। নায়াগারা সেণ্ট লরেন্স নদীর অন্যতম শাখা। ইহা দ্বারা ইরাই ও অণ্টেরিও নদীদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদীর দুইটী স্বতন্ত্র জলপ্রপাত আছে, এই উভয়ের মধ্যে একটী ১৮০০ ফুট বিস্তৃত ও উহা ১৫৪ ফুট নিম্নে পতিত হইতেছে; অপরটী ৬০০ফুট বিস্তৃত ও ১৬৩ ফুট নিম্নে পড়িতেছে। ঐ জলপ্রপাত হইতে প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০০,০০০ টন জল পতিত হয়। আফ্রিকার অন্তর্গত জাম্বেসী নদীর জলপ্রপাতের নাম বিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, ইহা ১০০০ ফুট বিস্তৃত। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে কানাড়ার অন্তর্গত সারাবতী নদীর জলপ্রপাত, মহাবালেশ্বর পাহাড়ের অন্তর্গত বেনা নদীর প্রপাত, মহীশূরের অন্তর্গত কয়েকটী নদীর প্রপাত ও নীলগিরির পার্শ্বস্থ পাইকারা নদীর প্রপাত এই কয়েকটীই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্তটীতে নদীর জল একবারে ৮৮৮ ফুট নিম্নে পতিত হইতেছে। উহা হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রায় ৪৬০০০ কিউবিক ইঞ্চি জল পতিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নর্ম্মদা নদীর স্থানে স্থানেও জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়। নর্ম্মদা পার্ব্বত্য নদী। ইহা একস্থানে পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক অদৃশ্য হইতেছে, আবার একস্থানে উচ্চ হইতে নিম্নে মহাবেগে নিপতিত হইতেছে দেখা যায়। এই জন্য নর্ম্মদা নদী সম্পূর্ণরূপে অনাব্য।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নদী যতই সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, ততই উহার বেগের ক্রমিক হ্রাস হইতে থাকে। পর্ব্বতের বিচ্ছিন্ন অংশসকল নদীর বেগে চূর্ণীকৃত

হইয়া বালুকারূপে পরিণত হয়,এবং উহার স্রোতের সহিত ভাসি যাইতে থাকে, বালুকার সহিত কর্দ্দম পঙ্ক ধাতব পদার্থ প্রভৃ নানাবিধ পদার্থ ও নদীর বেগে ভাসিয়া যায়। ভাসিয়া যাইব সময় নদীর বেগের হ্রাস হইলে উহা আর সমুদয় পদার্থকে ভাস ইয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং উহার কিয়দংশ নদী গর্ভের গভীর নিম্ন প্রদেশে পতিত হয়, আর কিয়দংশ উহার পার্শ্ব দেশে জমিতে থাকে। এইজন্য সমুদয় নদীর স্রোতই উহার এক পার্শ্বে প্রবল থাকে, ও অপর পার্শ্বে উক্ত বালুকাদি জমিয়া স্তূপা কৃত হওয়াতে চর পড়িয়া যায়। নদীর মোহানার নিকট সমুদ্রের বিপরীত বেগবশতঃ নদীর বেগ আরও কমিয়া যায়, সুতরাং যে সকল নদী ক্রমনিম্ন ভূভাগ দিয়া সমুদ্রে পতিত হয় তৎসমুদয়ের মোহানার নিকট অনবরত মৃত্তিকাদি জমিয়া চর উৎপন্ন হইতে থাকে, এবং সময়ে সময়ে নদীর মোহানা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে উৎপন্ন চর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয় থাকে এবং বহুকাল পরে পার্শ্ববর্ত্তী দেশাদির সহিত মিলিত হইয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠে। গঙ্গা নীল ও মিসি সিপির মোহানায় প্রকাণ্ড চর উৎপন্ন হইয়া দেশরূপে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদেশের যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে সামুদ্রিক জীব ও উদ্ভিজ্জাদির অবশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে সমগ্র বঙ্গদেশ গঙ্গানদীর প্রথমে চরস্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই মোহা নার চরকে বদ্বীপ অর্থাৎ ত্রিকোণদ্বীপ করিয়া থাকে। গঙ্গার বদ্বীপ প্রায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ ও উহার পরিমাণফল প্রায় ২২০০০ বর্গ মাইল। পক্ষান্তরে যে সকল নদী একবারে পার্ব্বত্য উপত্যকার ন্যায় স্থান দিয়া অতিবেগে সাগরে পতিত হয় তাহার স্রোতে

পার্থিব পদার্থ ভাসিয়া আসিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে বদ্বীপ উৎপন্ন হইতে পারে না, সমুদয়ই সমুদ্রে ভাসিয়া যায়। আমেজন নদীর স্রোতে অপরিমিত পার্থিবদ্রব্য ভাসিয়া আসিলেও উল্লিখিত কারণে উহাতে বদ্বীপ নাই। উহার জল বহুদূর পর্য্যন্ত সাগরের জল হইতে পৃথক্‌রূপে বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

নদীর কার্য্য।—বৃষ্টির জল, নদীর জল, উৎসের জল প্রভৃতি সকল প্রকার জলের সহিত অল্প বা অধিকপরিমাণে আঙ্গারিকাম্ল প্রভৃতি নানাবিধ অম্ল মিশ্রিত থাকে। বৃষ্টির জল আকাশমার্গে পতিত হইবার সময় বায়ু হইতে ঐ অম্ল সংগ্রহ করে, পরে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার পর উহা হইতেও প্রভূতপরিমাণে নানাবিধ অম্ল প্রাপ্ত হয়। এই অম্লসংযোগের ফলে বৃষ্টি ও নদীর জল প্রস্তরাদির উপর নিপতিত হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে উহার বন্ধন শ্লথ করিয়া ফেলে ও উহার উপরিভাগে অসংখ্য রন্ধ্র উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রন্ধ্রের মধ্য দিয়া জল প্রবেশ পূর্ব্বক উহাকে একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও উহার কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া জলের বেগে স্থানান্তরিত হয়, এবং কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট হইবার পর যে নূতন অংশটী বহির্গত হয় উহার উপরেও জলের উক্তরূপ কার্য্যবশতঃ উহাও ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্রোতের জলের প্রথম কার্য্য, পাহাড় পর্ব্বতাদির বন্ধন শিথিল করিয়া উহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করা। এই প্রকারে প্রস্তরাদির বিশ্লেষণ ও চূর্ণীকরণদ্বারা বালুকা পঙ্ক প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অনেক ধাতব পদার্থ ও জলের রাসায়নিক শক্তিবশতঃ উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, এবং অদৃশ্যভাবে উহাতে অবস্থিতি করে। নদীর স্রোত যেখান দিয়া প্রবাহিত হয়, সর্ব্বত্রই ভূভাগের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য উপত্যকা হইতে সমতল

ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই স্রোতের জল দ্বারা ক্ষয় হইতে দেখা যায় পদ্মার পাহাড়ে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রে শালিক পাখীর বাস দেখা যায়, উহা স্রোতোজলেরই কার্য্য। ইহাকেই স্রোতোজলের ক্ষয়োৎপাদিকা শক্তি কহে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রকারে প্রস্তররাশি চূর্ণীকৃত হইয়া জলের বেগে উহার সহিত ভাসিয়া যাইতে থাকে। নদীর বেগ অধিক হইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড উহার জলে ভাসিয়া যায়। নদীর বেগ ঘণ্টায় আধ মাইল মাত্র হইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড সকল উহার জলের সহিত ভাসিয়া যায়, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব প্রবল থাকিলেও ঐ সকল প্রস্তর নদীর বেগবশতঃ উহার তলে নামিয়া যাইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা বেগবৃদ্ধি হইলে অতি প্রকাণ্ড প্রস্তর ও তৃণাদি ন্যায় স্রোতের নিম্ন দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে, এবং পরস্পর সংঘর্ষে চূর্ণীকৃত হইয়া কর্দ্দম ও বালুকা প্রভৃতি আকারে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন উহার তলভাগ দিয়াও প্রস্তরাদি বেগে গড়াইয়া যাইতে যাইতে চূর্ণ হইয়া যায়। আবার অতি ক্ষুদ্র পার্থিব ধাতব পদার্থসকল অনেক সময় উহার জল ঘোলা করিয়া জলের সহিত সঞ্চালিত হইতে থাকে। অজয় নদীর ঢল নামিলে সমুদয় হুগলীর জল গৈরিক বর্ণ হইয়া যায়, ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে নদীর স্রোতের সহিত প্রভূতপরিমাণে নানাবিধ পদার্থ ভাসিয়া স্থানান্তরিত হয় এবং ভূভাগের ক্ষয়সাধন হইতে থাকে। এই শক্তিকে নদ্যাদির বাহিকাশক্তি কহে। তৃতীয়তঃ নদীর স্রোত কোন কারণে প্রতিহত হইলেই উহার বেগ কমিয়া যায়, উহার সহিত যে সকল পদার্থ ভাসিয়া যাইতেছে তাহার কিয়দংশ স্রোতের বাহিকাশক্তির হ্রাসবশতঃ নদীর তলে পতিত হইয়া

থাকে। পার্ব্বত্যপথে প্রস্তরাদির ঘর্ষণে উহার বেগ কথন কমিয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ক্ষুদ্র প্রস্তরাদি ভাসিয়া যাইবার পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। নদী পর্ব্বত পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমশঃ সমভূমিতে পতিত হইলেও উহার বেগ কমিয়া যায়, এবং উল্লিখিত দ্রব্যাদির কিয়দংশ নদীর পার্শ্বে বা মধ্যস্থলে সমবেত হইয়া চর উৎপন্ন করে। নদী হইতে শাখানদী নির্গত হইবার স্থানেও বেগের হ্রাসবশতঃ চর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে ছাপঘাটী নামক স্থানে, যেখানে গঙ্গা হইতে হুগলীনদী নির্গত হইতেছে, তথায় অত্যন্ত চর পড়িয়া থাকে। হ্রদাদির স্থির জলের মধ্যে প্রবেশ করিলেও উহার বেগ কমিয়া যায়, এবং যেস্থান দিয়া নদী কোন হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করে, তথায় বালুকা প্রভৃতি জমা হইতে হইতে হ্রদটী বুজিয়া উঠিতে থাকে। রোন্ নদী জেনিবাহ্রদের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়াছে। এই জন্য জেনিবা হ্রদের কিয়দংশ বুজিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে জেনিবার তীরে রোমকদিগের একটী বন্দর ছিল, উক্ত কারণে উহা এক্ষণে জেনিবা হইতে প্রায় ২।৩ মাইল পথ অন্তরে পতিত হইয়াছে। নিম্ন ভূমিতে নদী প্রবিষ্ট হইবার পরও উহার বেগ কমিয়া যায়। এবং এই প্রকারে ক্রমাগত বালুকাদি জমা হইয়া উহার এক পার্শ্বে চড়া পড়িতে থাকে, ও অপর পার্শ্বে পাহাড় উচ্চ হইয়া উঠে। এই জন্য গঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অতিরিক্ত জল কখনই গঙ্গার দ্বারা নিকাশ হয় না। কলিকাতার জল গঙ্গাদ্বারা নিকাশ না হইয়া উহার পূর্ব্ববর্ত্তী লোনাখালে পতিত হয়। নদীর বন্যা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে উহার পার্শ্ববর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান জলে প্লাবিত হইল, পরে ক্রমশঃ জল সরিয়া গেলে জলের সহিত যে সকল কর্দ্দমাদি

ভাসিয়া আসিয়াছিল উহা ঐ সকল স্থানের উপর পলিস্বরূপে পড়িয়া থাকে। ভূগর্ভের নীচে খনন করিলে যদ্যপি কোথাও বালুকা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে উল্লিখিত কারণে আমরা অনুমান করিতে পারি যে ঐ স্থান দিয়া পূর্ব্বে কোন না কোন কালে নদী প্রবাহিত হইয়াছিল। হুগলীর নিকট মগরা নামক স্থানে মাটীর নীচে বালী পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ঐ স্থান দিয়া সরস্বতী নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলে উহার স্রোতের বেগ একবারে কমিয়া যায়, এবং সমুদায় বালুকাদি উহার মোহানায় জমা হওয়াতে সমুদ্রের উপর ত্রিকোণ দ্বীপ উৎপন্ন হইতে থাকে। ঐ দ্বীপ কালক্রমে জল ছাড়াইয়া উঠে ও বহুকালের পর তথায় মনুষ্যের বসতি হইয়া থাকে। ইহাকেই নদীর বদ্বীপ কহে। গঙ্গা নীল মিসিসিপি প্রভৃতি নদীর বদ্বীপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মিসিসিপির বদ্বীপ প্রায় ৪০০০০ বর্গ মাইল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ আয়তনে সমগ্র ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ন্যায়।

পৃথিবীর সমুদয় নদীই যে সাগরে পতিত হইতেছে এরূপ নহে। অনেকগুলি নদী সাগরের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংযুক্ত কোন না কোন হ্রদে পতিত হইতেছে। আসিয়ার অন্তর্গত জর্ডান নামক নদী মরুসাগরে পতিত হইতেছে। প্রাচীন মহাদ্বীপে যাবতীয় সাগরবাহিনী নদী আছে তন্মধ্যে ৪৪০ টী প্রধান। নূতন মহাদ্বীপে এইরূপ প্রধান নদীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০ টী। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় প্রধান নদীই পূর্ব্ববাহিনী হইয়া সাগরাদির সহিত মিলিত হইয়াছে।

নদী দ্বারা যে আমাদের অসংখ্য উপকার সাধিত হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। নদী

রা কৃষির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, এবং বাণিজ্যকার্য্যের সবিশেষ বিধা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহাদ্বারা আমাদের আরও কত উপকার সাধিত হয় তাহার সংখ্যা নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

হ্রদ।

ভূপৃষ্ঠের নানাস্থানে স্বাভাবিক গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। টির জল উক্ত গহ্বরসমূহে সমবেত হইলে হ্রদ সংঘটিত হইয়া কে। অধিকাংশ হ্রদের জল নদ্যাদিদ্বারা বহির্গত হইয়া সাগর মহাসাগরে পতিত হয়। যে সকল হ্রদে এইরূপ জল বাহির বার পথ আছে, এবং যাহাতে নদী পতিত হয় তৎসমুদয়ের ল অপেক্ষাকৃত অল্প লবণাক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল হ্রদে া পরিস্রুত হইবার উল্লিখিত উপায় নাই, তৎসমুদয়ের জল ায়ই অত্যন্ত লোণা হইয়া থাকে। হ্রদের পরিমাণ ফল অত্যন্ত ধিক হইলে উহাকে সাগরশব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়।

ভূপৃষ্ঠের নানাস্থানে হ্রদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু একটী হ্রদও চ্ছাসম্ভূত নহে। অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের ন্যায় কোন না ান নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে হ্রদেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমূহের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ঐ সকল প্রাকৃ াক নিয়মের বিষয় অনুমান করিতে পারি।

(১) প্রথমতঃ পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে ইউরোপ ও উত্তর আমেরি ার উত্তরাংশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। ই সকল হ্রদ প্রায়ই কোন পার্ব্বত্য উপত্যকার অন্তর্বর্ত্তী নহে, ন্তু কি পার্ব্বত্য উপত্যকা, কি সমভূমি, কি নিম্নভূমি সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল হ্রদের মধ্যে

অনেক গুলি সাগরসমতল অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই সকল হ্রদের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করিয়া থাকেন যে উহারা পূর্ব্বে বরফদ্বারা আচ্ছাদিত ভূমি ছিল। ক্রমে বরফের ক্ষয়কারিকা শক্তির প্রভাবে উহাদের উপরিস্থ প্রস্তরাদি ক্ষয় হওয়াতে গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে এবং কালক্রমে ঐ সকল গহ্বরে জল সমবেত হওয়াতে হ্রদসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকের মতে স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য হ্রদ, উত্তর আমেরিকার অণ্টেরিও প্রভৃতি হ্রদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) দ্বিতীয়তঃ। সমতলভূমি অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিকসংখ্যক হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে অনেক গুলি হ্রদ দৃষ্টিগোচর হয়। আইলণ্ডের পার্ব্বত্য হ্রদগুলি তাহাদের মনোহর সৌন্দর্য্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। আল্প পর্ব্বতের উপরিভাগে অতি উচ্চ প্রদেশেও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুসংখ্যক হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় পর্ব্বতসমূহ সংঘটিত হইবার সময় পর্ব্বতোৎপাদিকা শক্তির প্রভাবেই উক্ত গহ্বর গুলি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কারণে আগ্নেয় পর্ব্বতের সান্নিধ্যে অনেক হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) অধিত্যকা অর্থাৎ মালভূমির উপর আর এক প্রকার হ্রদ দৃষ্টিগোচর হয়। আফ্রিকার যে অংশ বিষুবরেখার নিকটস্থ, তথায় এইরূপ হ্রদ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে অবস্থিত বিক্টোরিয়া নিয়ানজা হ্রদ সাগরসমতল অপেক্ষা প্রায় ৩৩০০ ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহার পরিমাণফল প্রায় ৩০,০০০ বর্গ মাইল হইবে। আসিয়ার অন্তর্গত তিব্বৎ তুর্কিস্তান ও মোঙ্গোলিয়া দেশে এইরূপ হ্রদ বিস্তর। এই গুলির মধ্যে মানস সরোবর সর্ব্বপ্রধান। এই সকল হ্রদের জলাতিরেকনির্গমার্থ

দ্যাদি দ্বার নাই। সুতরাং উহার জলের সহিত অতিশয় লবণ ,বাধে মিশ্রিত হওয়াতে উহাদের জল অত্যন্ত লবণাক্ত হইয়াছে। ইরূপ অধিত্যকা প্রদেশে যে সকল স্বচ্ছ জলের হ্রদ দেখিতে াওয়া যায়, তৎসমুদয়ের জল নির্গমদ্বার আছে। মধ্য আফ্রিকার ন্তর্গত চাদ হ্রদ ও আমাদের দেশের মানস সরোবর এই শ্রেণীর মন্তর্গত।

(৪) সমুদ্রের সন্নিহিত প্রদেশে প্রায়ই দূরবিস্তৃত জলাভূমি দখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের জল আসাতে এই গুলি লবণাক্ত য়। কলিকাতার পূর্ব্বে অবস্থিত লোণা খাল, উড়িষ্যার অন্তর্গত চল্কা হ্রদ ও পলিকট্ট হ্রদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইউরোপের ন্তর্গত ডেন্‌মার্ক, হলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে বাল্টিক াগরের উপকূলে এইরূপ জলাভূমি বিস্তর দেখিতে পাওয়া ায়। এই সকল হ্রদের মধ্যে যে গুলির সহিত সমুদ্রের যোগ াই, সে গুলি হইতে স্বচ্ছ জল ও পাওয়া যায়।

প্রায় অধিকাংশ হ্রদেই কোন না কোন নদী পতিত হই-তছে দেখা যায়। এই সকল নদীর জলদ্বারাই হ্রদসমূহের পুষ্টি-াধন হইয়া থাকে। কিন্তু গর্ভস্থ উৎসসমূহ হইতে উত্থিত লদ্বারা অনেক হ্রদের দেহপুষ্টি হইয়া থাকে। কোন কোন হ্রদে কটীও নদী পতিত হয় না, সুতরাং বৃষ্টি ও উৎসের জলদ্বারাই হাদের রক্ষা হয়। এই জন্য ঐ সকল হ্রদ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক ও র্ষাকালে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইটালীর অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ট্রিষ্ট গরের নিকট জার্কনিজ নামে একটী হ্রদ আছে। ঋতুপরিবর্ত্তের হিত ঐ হ্রদটীর জলের ও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার প্রসিদ্ধ সুপীরিয়র অণ্টেরিও ইরাই ভৃতি হ্রদ গুলির জল স্বাদু। ইহা হইতে সেণ্টলরেন্‌স প্রভৃতি

অনেক গুলি নদী নির্গত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে সুপীরিয়র হ্রদটীর আয়তন প্রায় ২৩০০০ বর্গ মাইল হইবে। বিক্টোরিয়া নিয়ান্জা হ্রদ হইতে সুপ্রসিদ্ধ নীল নদীর উৎপত্তি। মধ্য আসিয়ার অন্তর্গত বৈকাল হ্রদ প্রায় ৩৭০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ হইতে ৭০ মাইল পর্য্যন্ত প্রশস্ত। এই সকল হ্রদে প্রবল বাত্যার সময় ভয়ানক তুফান হইয়া থাকে। ইহাদের স্বচ্ছ জল লবণাক্ত জল অপেক্ষা পাতলা বলিয়া বায়ুদ্বারা অধিক আন্দোলিত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে স্বচ্ছ জলের হ্রদ প্রায় নাই। কেবল নৈনিতালের অন্তর্গত বনাবিক্ষত পার্ব্বত্য হ্রদটী স্বচ্ছজলের একমাত্র উদাহরণ।

হ্রদসমূহের গভীরতা অল্প নহে। যে সকল হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ নিম্নতল তৎসমুদয় প্রায়ই অল্প গভীর হইয়া থাকে। আর যে গুলির পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ ঋজুভাবে উন্নত তৎসমুদয় প্রায়ই অতিশয় গভীর হয়।

কাস্পিয়ান, কৃষ্ণসাগর, আরল হ্রদ প্রভৃতি যে সকল হ্রদ আয়তনে অতিশয় বৃহৎ তাহাদিগকে সাগর কহিয়া থাকে। এই সকল বৃহৎ হ্রদের অভ্যন্তরে ও নিকটে সামুদ্রিক জীব ও উদ্ভিজ্জের নানাবিধ অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে এই গুলি অতি প্রাচীন কালে উত্তর মহাসাগরের অংশ ছিল। কালক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ উন্নত হইয়া উঠাতে উহারা উক্ত সাগর হইতে পৃথক হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কথিত আছে পূর্ব্বকালে উত্তর মহাসাগর উহার বর্ত্তমান দক্ষিণ সীমা হইতে ৩০০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত পারস্যের পর্ব্বতশ্রেণীপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমুদয়ের মধ্যে কাস্পিয়ান সাগর সর্ব্বপ্রধান। ইহা কৃষ্ণ-সাগরসমতল অপেক্ষা ৮৪ ফুট নিম্নে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ

াল প্রায় ১৮০,০০০ বর্গ মাইল। ইহাতে ইউরোপের প্রায় সমুদয় ।ধান নদীই পতিত হইতেছে। কিন্তু ইহা হইতে একটীও নদী র্গত হয় নাই। যদিও ইহাতে অপরিমিত স্বচ্ছজল পতিত ইতেছে, তথাপি একটীও জলনির্গমের দ্বার নাই বলিয়া বং সূর্য্যের কিরণে জল অনবরত বাষ্পাকারে উঠিতেছে বলিয়া হার জল অতিশয় লবণাক্ত। ইহার পার্শ্বে লোণা জলাভূমি তুর্দ্দিকে বিস্তৃত আছে। এই সকল হ্রদের জল শুষ্ক করিলে ক প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়। প্রাচীনকালের তত্রত্য অধিবাসীরা ই লবণ ব্যবহার করিত। ইউরোপীয় ও আসিয়াটিক অধি- যকার মধ্যস্থ নিম্ন ভূভাগে আরল হ্রদ অবস্থিত। ইহা দীর্ঘে ৬৫ মাইল ও প্রস্থে ১৪৫ মাইল। ইহাতে অক্সস প্রভৃতি কয়ে- টী নদী পতিত হইতেছে। মরুসাগর ভূমধ্যসাগরের সমতল পেক্ষা প্রায় ১২৯৮ ফুট নিম্নে অবস্থিত। ইহার ন্যায় লবণাক্ত ল কুত্রাপি নাই। ইহার জলে মৎস্যাদি কোন প্রকার জীবজন্তু চিতে পারে না। ইহার জল এত ভারি যে ইহাতে সন্তরণ বার জন্য কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে হয় না। মানুষে অনায়াসে হার উপর ভাসিয়া থাকে।

হ্রদগুলি সর্ব্বশুদ্ধ চারি প্রকার। (১) যে গুলিতে কতকগুলি দী পতিত হইতেছে, ও যেগুলি হইতে কতকগুলি বাহির হই- তেছে। (২)যে গুলিতে নদী পতিত হইতেছে, কিন্তু যে গুলি হইতে কটীও নদী বাহির হইতেছে না। [৩] যেগুলি হইতে নদী বাহির তেছে, কিন্তু যে গুলিতে একটীও নদী পতিত হয় নাই। [৪] যগুলিতে নদী বাহির ও হয় নাই, পতিত ও হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হ্রদ গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কানাডার হ্রদ গুলি ও নীল নদীর

উৎপত্তি স্থান বিক্টোরিয়া নিয়ান্জা ও আল্বর্ট নিয়ানজা হ্রদদ্বয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কাস্পিয়ান সাগর মরুসাগর প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল হ্রদের অতিরিক্ত জল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। এই জন্য উহাদের বন্যা হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর হ্রদ গুলির জল উহাদের গর্ভস্থ উৎসসমূহ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। চতুর্থ প্রকার হ্রদগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র ও অতিশয় লবণাক্ত।

হ্রদ হইতে বিশ্বসংসারের অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। হ্রদ থাকাতে অনেক নদী উহাতে পতিত হয় এবং এই জন্য উহাদের বন্যা হইতে পারে না। ইহাদের দ্বারা নদীর জলও পরিষ্কৃত হয়। রোণ নদী যেস্থানে জেনিবা হ্রদে প্রবেশ করিতেছে, তথায় উহার জল অতিশয় ঘোলা, কিন্তু উহার সমুদয় কর্দ্দমাদি জেনিবার তলে পতিত হওয়াতে নির্গত হইবার সময় রোণের জল উৎসজলের ন্যায় পরিষ্কৃত হইয়া নির্গত হইতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

স্থলীয় হিমসংঘাত।

পর্ব্বতসমূহের বর্ত্তমান আকারের প্রতি মনোনিবেশ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে পৃথিবীর আন্তরিক শক্তির প্রভাবে পর্ব্বত-শ্রেণী প্রথম সংঘটিত হইবার সময় উহাদের যেরূপ আকার ছিল, এক্ষণে উহাদের আকার অবিকল সেরূপ নাই। উহারা পূর্ব্বে যেরূপ বন্ধুর ও উচ্চাবচ ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে। উহারা ক্রমশঃ মসৃণ হইয়া আসিতেছে। অতএব

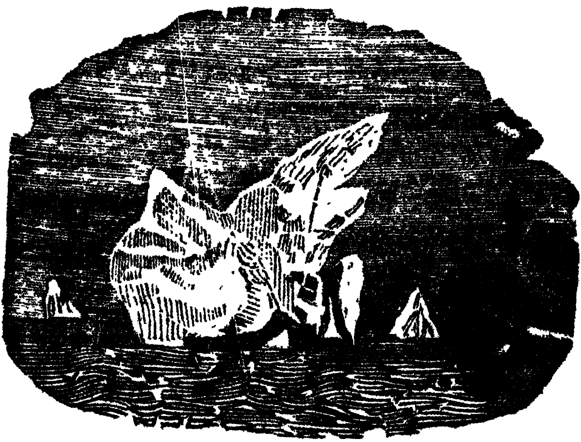
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতসমূহ কালক্রমে অল্পে অল্পে ক্ষয়িত ও নিম্ন হইয়া আসিতেছে। কি কারণে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহার নির্ণয় করিতে হইলে জল ও আঙ্গারিকাম্ল এই উভয় পদার্থকেই উক্ত নিয়ত ক্ষয়ের প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয়। আঙ্গারিকাম্ল নানা প্রকারে জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আঙ্গারিকাম্লমিশ্রিত জলের অসাধারণ ক্ষমতা এই যে উহার সহিত সংস্পর্শে অতি কঠিন প্রস্তরাদিও ক্ষয়িত হইতে থাকে। পর্ব্বতাদির উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে আঙ্গারিকাম্লের গুণে প্রস্তরসমূহের বন্ধন শিথিল হইয়া উহার মধ্যে অসংখ্য রন্ধ্র উৎপন্ন হইতে থাকে। ঐ সকল রন্ধ্রের ভিতর দিয়া প্রস্তরাদির অভ্যন্তরে অনবরত জল প্রবেশপূর্ব্বক উহাদের অভ্যন্তরভাগকেও শিথিলবন্ধন করিয়া ফেলে। আবার জলের একটী বিশেষ গুণ এই যে শৈত্যসংযোগে জমিয়া বরফ হইবার সময় উহার আয়তনবৃদ্ধি হয়। একটী জলপূর্ণ বোতল বরফের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে উহার অন্তর্গত জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় এবং উহার পূর্ব্বাপেক্ষা আয়তনবৃদ্ধি হওয়াতে বোতলটী ফাটিয়া যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শীতকালে অবিকল এই কারণে মধ্যে মধ্যে জলের পাইপ ফাটিয়া যায়।

পর্ব্বতাদি উন্নতস্থানের প্রস্তরসমূহের উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে উল্লিখিত কারণে ঐ জল প্রস্তরাদির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এবং অভ্যন্তরভাগকেও ক্ষয়িত করিতে থাকে। পরে শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে ঐ অভ্যন্তরস্থ জল জমিয়া বরফ হইতে থাকে এবং উহাদের আয়তনবৃদ্ধি হয় বলিয়া উহার শক্তিবশতঃ প্রস্তর ফাটিয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া এইরূপ প্রক্রিয়া হইলে অবশেষে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রবলবেগে নিম্নে পতিত হয়,

এবং নদী বা বরফের স্রোতে আরও ক্ষয়িত হইয়া অবশেষে কাঁকর বা বালুকার আকারে পরিণত হইয়া নদীর বেগে নিম্নভূমি হইয়া সাগরপর্য্যন্ত উপনীত হইয়া থাকে। এই প্রকার জলদ্বারা প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ও ক্ষয়সাধন হয়। কিন্তু পর্ব্বতের উপরিভাগে জল জমিয়া আরও নানাপ্রকারে উহার ক্ষয়সাধন করিয়া থাকে। শীতের প্রাদুর্ভাবে তাপাংশ ৩২ ডিগ্রী হইলেই জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। ইউরোপের উত্তরাংশে শীতকালে নদী হ্রদ প্রভৃতি সমুদয়ের উপরিভাগের কিয়দংশ জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। উত্তরমহাসাগর ও তৎসন্নিহিত দেশস্থ পর্ব্বতাদির বরফস্তূপ গ্রীষ্মকালে তত্রত্য সাগরের উপর ভাসিতে থাকে। কিন্তু যে সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প শীত তথায়ও মধ্যে মধ্যে নদী হ্রদ প্রভৃতি জমিয়া যায়। কথিত আছে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে টেম্‌স নদীর অধিকাংশ জমিয়া গিয়াছিল। এই প্রকারে নদী প্রভৃতি জমিয়া যাইলে অনায়াসেই উহার উপর দিয়া যাতায়াত করা যায়।

পর্ব্বতাদি অত্যুচ্চ স্থানের যে সকল অংশ চিরহিমানী-রেখার নিম্নে অবস্থিত, তথায় জল বা ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান জলীয় বাষ্প জমিয়া বরফ হইলে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখরকিরণে গলিয়া যায় এবং প্রবলবেগে নিম্নে পতিত হইয়া নদ্যাদির কলেবরবৃদ্ধি করে। কিন্তু যে সকল স্থান চিরহিমানীরেখার ঊর্দ্ধে অবস্থিত তথায় গ্রীষ্মকালেও সমুদয় বরফ নিঃশেষরূপে গলিয়া যায় না। কিয়দংশ গলিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রতিনিয়ত নূতন নূতন বরফ সংঘটিত হয় বলিয়া তথায় বরফরাশি জমিয়া স্তূপাকার হইতে থাকে এবং কখন কখন বায়ুর বেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া তত্রত্য ভূমিকে আচ্ছাদন করে। এই সকল চিরস্থায়ী বরফ-রাশিকে হিমক্ষেত্র কহে।

যদি এই সকল বরফরাশির হ্রাস হইবার কোন প্রকার উপায় না থাকিত, তাহা হইলে সমুদয় আকাশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। উহাদের কিয়দংশ গলিয়া যায়, ও কিয়দংশ সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া আকাশে



উত্থিত হইতে থাকে, এবং পুনর্ব্বার ঘনীভূত হইয়া পতিত হয়। কিন্তু আরও দুই প্রকারে ইহাদের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যে সকল হিমক্ষেত্র ঋজুভাবে উন্নত ভূমির উপর সংঘটিত, তথায় মধ্যে মধ্যে উহাদের অঙ্গ হইতে অতি বৃহৎ স্তূপ বিশ্লিষ্ট হইয়া বেগে নিম্নে পতিত হয়: পতিত হইবার সময় উহাদের সহিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহও পতিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রকাণ্ড বরফস্তূপ পতিত হইবার সময় বজ্রাঘাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইয়া থাকে, এবং বৃক্ষাদি ভগ্ন হইয়া চূর্ণীভূত হয়। পতিত হইবার পর উহাদের গলিয়া যাইবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা থাকে না। কারণ উহারা চিরহিমানীরেখার নিম্নে নামিয়া পড়ে এবং গলিয়া নদ্যাদির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। ঘনীভূত তুষারসমূহ উপর্য্যুপরি পতিত ক্রমশঃ অত্যন্ত পুরু হওয়াতে উহাদের ভারবৃদ্ধি হইতে এবং অবশেষে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাববশতঃ উহারা নিম্ন যাইবার জন্য অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে আরম্ভ হয়। যে অধিক বরফ একত্র হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, পর্ব্বতের স্থান হইতে বরফরাশি অগ্রসর হইয়া উহার সহিত একীভূত এই বরফস্তূপ পর্ব্বতের উপত্যকার উপর উপস্থিত হইলে কল নদীর আকার ধারণ করে। বহুসংখ্যক উপনদী আ যেমন নদীর পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব স্রোত আসিয়া ঐ প্রকাণ্ড নদীর ও কলেবরবৃদ্ধি করিয়া থা এই তুষারনদীর গতি অবশ্যই অল্পবেগে হইয়া থাকে। ক উহার উপরিস্থ প্রস্তরাদির গতি দৃষ্টেই উহাদের গতির অনুম করিয়া লইতে হয়। আল্প পর্ব্বতের সর্ব্বপ্রধান তুষার নদীর গ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে আল্প ও হিমালয় পর্ব্বতে বহুসংখ্যক এইরূপ বরফস্রোত দৃষ্ট হয় এই বরফনদীর প্রকৃতনদীর সহিত অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহাদের মধ্যস্থলের যেরূপ বেগ পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের ঘর্ষণবশতঃ পার্শ্বের বেগ তদপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। উল্লিখিত নদীটার পার্শ্বের বেগ ২৪ ঘণ্টায় ১০ হইতে ১ ইঞ্চিমাত্র। নদীসকল ঋজুভাবে উন্নত স্থান হইতে নিম্নে পতিত হইলে জলপ্রপাতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বরফনদী যখন এইরূপে পতিত হয়, বরফ কঠিন বলিয়া নদীর জলপ্রপাতের ন্যায় ব্যাপার ঘটেনা, তবে মাধ্যাকর্ষণবশতঃ বরফরাশি পড়িবার সময় ভাঙ্গিয়া উচ্চ নীচ হয়, এবং আবার নীচে আসিবার পর জমিয়া একীভূত হইয়া থাকে। সমুদয় চলিষ্ণু হিমসংঘাত এইরূপে গড়াইতে গড়া-

হইতে অবশেষে চিরহিমানীরেখার নিম্নে পতিত হইলেই গলিতে আরম্ভ করে এবং উহাদের জলস্রোতে নদী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকাণ্ড বরফস্তূপ গড়িয়া যাইবার সময় তাহাদের সহিত পর্ব্বতের ভগ্ন অংশ সকল গড়াইতে গড়াইতে চূর্ণীকৃত করিয়া বালুকা বা কর্দ্দমরূপে পরিণত হইয়া নিম্নস্থ নদীর জলে পতিত হয় এবং ভাসিয়া দেশবিদেশে উপনীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহাদের ঘর্ষণে পর্ব্বতের পার্শ্ব ও নিম্নভাগ অবিরত ক্ষয় পাইয়া নষ্টগ্রস্ত হইতে থাকে। এই প্রকারে বরফের দ্বারা পর্ব্বতসমূহের ক্ষয়-সাধন হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

আবহাওয়া, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী।

কলিকাতার অধিবাসীরা পীড়াগ্রস্ত হইলে বায়ুপরিবর্ত্তের জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকেন সাহেবেরা বায়ুপরিবর্ত্তের জন্য জাহাজে করিয়া সমুদ্রযাত্রা করেন এবং অনেকেই পুনর্ব্বার সুস্থ ও সবলশরীর হইয়া প্রত্যাবৃ হয়েন। এরূপ হইবার কারণ কি? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থা কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদা করা নিতান্ত সহজ নহে। নানা কারণে পৃথিবীর ভিন্ন ভি অংশের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যে কারণে পৃথি বীর এক স্থান স্থানান্তর অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা পীড় জনক হয়, তাহাকে তত্তদ্দেশের প্রাকৃত ধর্ম্ম কহে। ইংরাজ ভাষায় ইহার নাম ক্লাইমেট। উপযুক্ত শব্দের অভাবে ক্লাইমে শব্দের পরিবর্ত্তে "আবহাওয়া" এই শব্দটী গ্রহণ করিলাম নিম্ননির্দ্দিষ্ট কারণসমূহের তারতম্যবশতঃ আবহাওয়ার ইতরবিশে হইয়া থাকে। (১) বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব, (২) সমুদ্র হইতে দূরত্ব, [৩] সমুদ্রসমতল হইতে উন্নতি, (৪) প্রবল বায়ুপ্রবা (৫) কতকগুলি স্থানীয় কারণ, যথা:—মৃত্তিকার অবস্থা, উদ্ভি জ্জের অবস্থা, পর্ব্বত ও হ্রদাদি হইতে নৈকট্যপ্রভৃতি। এই সব কারণের প্রত্যেকটীদ্বারাই স্থানভেদে আবহাওয়ার ভিন্নতা হই থাকে।

কি জন্য উল্লিখিত কারণগুলিদ্বারা আবহাওয়ার বিভি হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আবহাও ভিন্নতা অনুসারে কি প্রকারে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে

ভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ ও জীবে... ...খ্যা করা যাই-তেছে।

পৃথিবীর সকল অংশেই কোন ... উদ্ভিজ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার মরু... সন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানেই ... প্রকার উদ্ভিজ্জ বর্ত্তমান আছে। ইউরোপের তুষারধ... শৃঙ্গের উপর লোহিত তুষার নামক যে পদার্থ দেখা যায়, উহা একপ্রকার উদ্ভিজ্জ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ আলোক উত্তাপ ও জল এই তিনটী পদার্থই উদ্ভিজ্জজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইহাদের মধ্যে আবার জলই সর্ব্বপ্রধান। আলোক ও উত্তাপের অভাবেও কোন কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু জলের অত্যন্তাভাব হইলে কোন প্রকার উদ্ভিজ্জই বাঁচে না। এই গুলি উদ্ভিজ্জজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। আজি পর্য্যন্ত প্রায় ১২০,০০০ প্রকার উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উদ্ভিজ্জসমূহ প্রধানতঃ দুই প্রকার। পুষ্পহীন ও সপুষ্প। শৈবাল প্রভৃতি পুষ্পহীন। সপুষ্প উদ্ভিজ্জ আবার দুই প্রকার, (১) যাহাদের গুঁড়ি ভিতর হইতে উপচিত হয়, যথা বাঁশ, পদ্ম, তাল প্রভৃতি। (২) যাহাদের গুঁড়ি উপরদিকে বাড়ে, যথা, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ প্রভৃতি।

উদ্ভিজ্জের বিভাগ। গ্রীষ্মমণ্ডলে উদ্ভিজ্জজীবন পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক ও তথায় উদ্ভিজ্জের তেজও অধিক হইয়া থাকে। যে স্থান বিষুববৃত্তের যত নিকটবর্ত্তী তথার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উদ্ভিজ্জসমূহের ফলপুষ্পাদি অগ্রে হইয়া থাকে।

আর অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থানে উহারা নাবী হয়। এই কার মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে আম্র চৈত্রমাসেই পাকিয়া উঠ কিন্তু আমাদের দেশে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আম্র পাকিয়া থাবে আবার আরও উত্তরে যাইলে আম্র আরও নাবী হয়। গ্রী মণ্ডলে তাল খর্জ্জুরাদি জন্মিয়া থাকে।

সমমণ্ডলের উদ্ভিজ্জসমূহ গ্রীষ্মমণ্ডল অপেক্ষা ভিন্নপ্রক এবং একজাতীয় উদ্ভিজ্জসমূহের মধ্যে যেগুলি সমমণ্ডলে অ স্থিত তাহাদের তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। এই মণ্ডলে ওক্ ও ওলি প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। হিমমণ্ডলে এক প্রকার ক্ষুদ্রাবয়ব উদ্ভিজ মাত্র জন্মিয়া থাকে।

কিন্তু আবহাওয়ার বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও স্থানভে অনেকপ্রকার উদ্ভিজ্জের প্রভেদ দেখা যায়। এই জন্য উদ্ভিজ বিৎ পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের অবস্থিতি অনুসারে পৃ বীকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল ভাগে ভি ভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এক দেশের উদ্ভি অন্য দেশেও জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশে যে উদ্ভিজ্জ জ যত্ন করিলে উহা ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতল দেশেও জন্মিতে পারে ফলতঃ উদ্ভিজ্জসকল এই প্রকারে দেশ বিদেশে বিকীর্ণ হয়।

জীব। উদ্ভিজ্জের ন্যায় আবহাওয়ায় ভিন্নতা অনুসা জীবেরও ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সিং ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জীবের বাস, কিন্তু শীতপ্রধান দে ইহারা জীবন ধারণ করিতে পারে না। তথায় উহাদের পরিবা অন্যান্য প্রকার জীব বাস করিয়া থাকে। উত্তর মেরুর সন্নিহি প্রদেশে ভল্লূক হোয়েল প্রভৃতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

সমশীতোষ্ণমণ্ডলে ছাগ, হরিণ, উষ্ট্র, শূকর নেকড়ে ব

প্রভৃতি বাস করিয়া থাকে। আবার গ্রীষ্মপ্রধানদেশে যে সকল প্রকার মৎস্য, শঙ্খ, শম্বূকাদি দৃষ্ট হয়, শীতপ্রধান দেশে তৎসমুদয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু কোন কোন দেশে বিশেষ বিশেষ প্রকার জীবের বসতি দেখা যায়। ইউরোপ ও আসিয়াতে রোমন্থকারী জীব প্রধান, আফ্রিকায় কচ্ছপের জাতি অধিক। দক্ষিণ আমেরিকায় অদন্ত জন্তু বিস্তর ও অষ্ট্রেলিয়ায় কঙ্গারু প্রভৃতি দ্বিগর্ভ জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জের ন্যায় অনেক জাতীয় জীব এক দেশ হইতে দেশান্তরে নীত হইলেও বাঁচিয়া থাকে। ইন্দুর প্রভৃতি সমমণ্ডলের জন্তু পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই বিস্তৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গো, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবও মনুষ্যের সহিত দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছে দেখা যায়।

মনুষ্য।

ভূগর্ভস্থ নানাবিধ কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে অধুনা ভূপৃষ্ঠে যে সকল প্রকার জীব ও উদ্ভিজ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে উহাদের চিহ্নমাত্র ছিল না। এক প্রকার জীব হইতে জীবান্তর, আবার তাহা হইতে অপর প্রকার জীব, এই প্রকারে যুগে যুগে পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইয়া অবশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ডারুইন সাহেবের মতে বানর জাতি হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া অবশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার পরিবর্ত্ত হইতে যে কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয় নাই। ফলতঃ উদ্ভিজ্জ ও জীবের ক্রমিক পরিবর্ত্ত ও নূতন অবয়ব গ্রহণ প্রভৃতির বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে পৃথিবী যে অতিশয় প্রাচীন পদার্থ তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকে না।

প্রাকৃতিক ভূগোল।

মনুষ্য যাবতীয় জীবের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বুদ্ধিবৃত্তি থাকাতে ম সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিতেছে এবং সমুদয় ইতর জন্তুই মনু বশতাপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য সকল দেশে সকল প্রকার আবহাওয়াতে প্রকার ঋতুতে বাস করিতে সমর্থ। বুদ্ধিপ্রভাবে মনুষ্য যে সকল উপকর সাহায্যে যে দেশে বাস করিয়া থাকে তৎসমুদয় প্রস্তুত করিয়া লয়। এই আফ্রিকার অগ্নিবৎ উত্তপ্ত স্থানেও উত্তরমেরুর চিরনীহারাবৃত প্রদেশেও মনু বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ পৃথিবীর প্রায় সকল অংশ মনুষ্যের বসতি হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করিয়া থা যে মধ্য আসিয়ার অন্তর্গত ককেসস পর্ব্বতের সান্নিধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্যজা উদ্ভব হয়। পরে কালক্রমে উহারা পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই উপনিবেশ সংস্থা পূর্ব্বক নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাববশতঃ নানা আকার ও জাতি বিভক্ত হইয়াছে। উত্তাপের আধিক্যবশতঃ মনুষ্য কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে এই জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ। এতদ্ভিন্ন অন্যা প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে মনুষ্যের অবয়ব মুখচ্ছবি প্রভৃতি বিষয়েও না প্রকার প্রভেদ সংঘটিত হইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা প্র উদ্ভিজ্জ আহার পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে, সমমণ্ডলের অধিবাসীরা মা ও উদ্ভিজ্জ উভয় প্রকার দ্রব্যই আহার করে, আর মাংসই হিমমণ্ডলে লোকদিগের প্রধান খাদ্য।